

জেমস্ টেলর
কোম্পানি
আমলে ঢাকা



মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত



জেমস্ টেলর
কোম্পানি
আমলে
ঢাকা

L

E



জেমস্ টেলর
— . . . —
কোম্পানি
আমলে
ঢাকা

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
অনূদিত

English Copyright : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-সরকারের আদেশক্রমে মুদ্রিত

প্রথম অবসর প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১

অবসর প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবলিশ মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : এইচ এম জাকির

মূল্য : সাধারণ সংস্করণ ২০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN 984 - 415 - 123 - 6

KOMPANI AMALE DHAKA : Bengali translation of 'Topography of Dhaka' by James Taylor (Civil Surgeon, Dhaka in 1840), Translated by Mohammad Asaduzzaman.
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Abosar Edition : February 2001. Price : Popular Edition : 250.00 Tk. Only.

উৎসর্গ

বাবা আলহাজ্জ আবদুর রহমান

ও

জান্নাতবাসিনী আমার মা

জোবায়দা খাতুনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৮২৫ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে মাত্র আট বছরকাল ব্রিটিশ নাগরিক জেমস্ টেলর ঢাকায় অবস্থান করেন। তিনি তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের অধীনে ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন। তাঁর ঢাকায় অবস্থানকালীন স.য়ে কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে মেডিক্যাল বোর্ডের সচিব জেমস্ হাসিনসন সিভিল সার্জনদেরকে তাঁদের নিজ নিজ জেলা ও কর্মস্থলের মেডিক্যাল টপোগ্রাফি সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশদান করেন। এর সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ ছিল।

“1— The Situation and boundaries of the place. 2— Rivers, Lakes, Wells and Morasses. 3—Climate. 4—Soil. 5—Animal, Vegetable and Mineral Productions. 6— States of Agriculture. 7— Roads and Communications. 8—Diseases, endemic and epidemic. 9—States of Hospitals, with the dimensions of their apartments. 10—Population with a description of the dwellings, clothing, bedding fuci, diet, customs, rearing of children and amusements. 11—Tables of Marriages, Births, Diseases and Deaths. 12— Diseases of Cattle and others of the lower animals. 13—Diseases of plants. 14—Census of Population. 15— Cause and effect of scarcity and plenty. 16—Condition of the poor and their subsistence. 17— Wages of labour. 18— Physical cause of crime. 19— Ratio of mortality. 20—Ordinary Proportion of births to marriages. 21—Area of the district. Comparative Productiveness of land, habits of the people and proportion of Hindus to Mussulmans.”

In addition to my remarks on most of these subjects I have given a sketch of the history of the district, and a brief account of its Manufactures, Commerce, Revenue and State of Education.” (Preface by James Taylor, Calcutta, March 30, 1839.)

বলা বাহুল্য, জেমস্ টেলর উল্লিখিত বিষয়ে রিপোর্ট লিখতে গিয়ে কোম্পানি আমলে ঢাকা তথা সেকালের পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ভৌগোলিক অবস্থান, এর নদনদী, এর লোকায়ত জীবনধারা, এর পশুপাখি, জীবজন্তু, প্রকৃতি, উৎপন্ন ফসল ইত্যাদি—এক কথায়

এদেশের সামগ্রিক পরিবেশ পরিচয় সুনিপুণভাবে তুলে ধরেন। সেকালে কেন, একালেও লিখিত কোনো একক গ্রন্থে ‘টপোগ্রাফি অব ঢাকা’র ন্যায় এত বিচিত্র ও বাস্তব চিত্র আর কেউ দিতে পেরেছেন কি না আমাদের জ্ঞানা নেই। গ্রন্থটি প্রকাশনার পর প্রায় এক শ একষষ্টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, যত দিন যাবে, ততই এদেশের একটি অতিমূল্যবান দলিল হিসেবে জেমস্ টেলরের ‘A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca’ গ্রন্থটি জনসাধারণ্যে আরো বেশি বেশি করে সমাদৃত হতেই থাকবে।

বইটি ইংরেজিতে রচিত এবং বর্তমানে নিতান্ত দুস্প্রাপ্য। জগন্নাথ কলেজে এর একটি কপির সন্ধান পেয়ে আমি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এর অনুবাদকার্য সম্পন্ন করি। আমার অনূদিত গ্রন্থের নামকরণ করি ‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’। ১৯৭৮ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর গ্রন্থটি আরো দুবার পুনর্মুদ্রিত হয় এবং ব্যাপকভাবে পাঠকসমাদৃত হয়। কিন্তু বাংলা একাডেমীর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে প্রায়ই পাঠক চাহিদার নিরিখে যথাসময়ে বই পুনর্মুদ্রিত হতে পারে না। তদুপরি, মূল্যবান পুস্তকের বিজ্ঞাপনভিত্তিক প্রচারণারও কোনো নিয়ম বোধকরি বাংলা একাডেমীর নেই। এসব কারণে কেউ কেউ বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বাইরে থেকে পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। অগত্যা আমিও বাংলা একাডেমী থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যাতিমান প্রকাশক অবসর প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী জনাব আলমগীর রহমানের দ্বারস্থ হই। তিনি একজন স্বনামধন্য, কৃতিশীল এবং প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক। এ যাবৎকাল প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থসমূহের মান সর্বত্র প্রশংসিত এবং সমাদৃত। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রন্থটির ছাপার কাছ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে বইয়ের নির্ধারিত নির্মাণ সময়মতো ত্বরান্বিত হতে পারে নি বিধায় বইটি আরো আগে পাঠকদের হাতে পৌঁছানো গেল না; এ জন্য আমি দুঃখিত।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পাঠকনন্দিত ‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’ বইটি অবশেষে আলোর মুখ দেখল তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

ঢাকা

ফেব্রুয়ারি ২০০১

খিনীত

অনুবাদক

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

যে কেউ এ গ্রন্থ পাঠ করে নিজেই এর মূল্যমান স্থির করতে পারবেন... এ গ্রন্থের প্রসঙ্গ নাও হতে পারে। তথাপি ভূমিকা জেবাব প্রবেশন করে এবং অনেক দান হয়েছে। জেমস টেলর সাহেব রচিত 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' গ্রন্থের বাংলায় চতুর্থবারের মত অনুবাদ করা হয়েছে 'কোম্পানি আমলে ঢাকা'। মূল গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা ইন্সটিটিউট অব কমান প্রেস থেকে। প্রকাশকাল ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ।

সিপাহী বিপ্লবেরও বোল বহর আগে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলদারদের শেষ পর্যায় টেলর সাহেব ঢাকায় আসেন ডাক্তার হয়ে। তিনি ছিলেন ঢাকার চাকচিক্যের সঠিক সাক্ষ্য। এখানে তিনি দীর্ঘ আট বছর অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি কখনো চাকচিক্যতরবে এবং কখনো বিভিন্ন সরকারি অফিসের মজলিসদ্বাবেও যোগে, কখনো সর্বস্তরের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নানাতাবে, এদেশের নানা তথ্য সমগ্রের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ করেন। এ কাজে তিনি কোম্পানি সরকারের আদেশক্রমেই সম্পন্ন করেন এবং কোর্ট ইন্ডিয়ান ম্যুর অবস্থানরত মেডিক্যাল বোর্ডের সচিব জেমস হাচিন্সনের নিকট ঢাকার ভূ-প্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের একটি সফিক্ত বিবরণ ('এ কেচ অব দ্য টপোগ্রাফি অ্যান্ড ইন্ডিস্ট্রিয়াল অব ঢাকা') পেশ করেন।

এ সময়ে আশ্রয় রহস্যময়ী ঢাকা তার বিশিষ্ট দিনের চাকচিক্যের সন্ধান সৌন্দর্য হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থার উপনীত। তার রাজধানীর সৌন্দর্য লুপ্ত হয়েছে। বিশ্বব্যাপ্ত মসজিদ বিলুপ্তি সূতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ও প্রতিকূলতায় বিপর্যস্ত হয়েছে। স্থানীয়দের কাছে যেরে গিয়ে বহু কারিগর, শিল্পী শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে কৃষক সেজেছে; অবনত ও অবহেলায় রাস্তাঘাট বিবর্ণ ও পরিবেশ পৃথিবীহীন হয়ে উঠেছে। শহরের লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়ে এক-চতুর্থাংশে পর্যবসিত হয়েছে; ক্যানি আর চরমভাবে করে গেছে। অধিবাসীরা দুর্বল ও আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে পরাধীনতার গ্লানিতে ঝুঁকছে—এমনি এক বেজনাশময়ক পরিস্থিতিতে ঢাকার বিবরণ পাই একজন বিদেশীর কাছে থেকে।

উল্লিখিত গ্রন্থ কালের পরিমাণে প্রায় দেড় শ বছর অতিক্রম করার সন্ধান উপনীত হয়েছে। তথাপি এতে এদেশের কৃষি, শিল্প, বাস্তু ও বাংলা ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব তথ্য রয়েছে যা থেকে জ্ঞান লাভ করার অর্থেই অবকাশ একদো কিল্যাম। ঢাকা বলতে শুধু শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি লেখক; যেটুকুভাবে বর্তমান দায়িত্ব সমুদায় বাংলাদেশের কথাই এতে বিবৃত হয়েছে কোনো বা কোনোভাবে। এদেশের ভূমিগত, নদী, অধিবাসীদের বিভিন্ন জীবনধারা ও উপজীবিকা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, লোকসংখ্যা, দ্রব্যাবল্য, লোকচরিত্র, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, বাতাস ও জলবায়ন, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি সর্ব বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ ও সত্যকম দৃষ্টিতে চিত্রিত করার প্রয়াস আছে এ গ্রন্থের সর্বত্র। কোনো কখনো বা কিংবদন্তি নিয়ে লেখক কখনো সন্দেহ করেন

নি। এ গ্রন্থের বহু পরবর্তী সময়ে ১৯০৬ সালে রচিত এস. বি. ব্রাডলি বার্টের ‘Romance of an Eastern Capital’-এর ন্যায় কিংবদন্তি নিয়ে কোনো রহস্যঘন পরিবেশও সৃষ্টি করেন নি লেখক। তৎপরিবর্তে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সর্বত্র লক্ষ করা যায়। এদেশ সম্বন্ধে সেকালে কেন, একালেও এমন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত দ্বিতীয় আর কোনো গ্রন্থের সন্ধান মিলবে কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস এমন বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা কোনো একক গ্রন্থে আজো বিরল।

‘ঢাকা তথা ঢাকা প্রভিঙ্গ’ বলতে যে ভূখণ্ডের কথা বলা হয়েছে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মধ্যযুগে স্বাধীন তুর্কি-পাঠান সুলতানদের আমল থেকেই লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশ তখনো বিদ্যমান ছিল।

মধ্যযুগে চৈতন্যের জীবনীকার বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশের বাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ঢাকা তথা স্বাধীন বাংলাদেশকেই প্রকৃত বঙ্গদেশ নামে অভিহিত করেছেন চৈতন্যের জীবনী লেখক। দ্বিতীয় পর্যায়ে, নবাবি আমল থেকে কোম্পানি আমল পর্যন্ত “ঢাকা প্রদেশ” নামে একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করে ‘আসাম ও পূর্ব বাংলা প্রদেশ’ গঠন করেন। সেখানেও সিলেটসহ পূর্ববঙ্গের সমন্বয়ে বর্তমান ভূখণ্ডেরই অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে এ ভূখণ্ডই পাকিস্তানের পূর্বাংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে তো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বহু শতাব্দীপ্রাচীন ঢাকা নগরী এই ভূখণ্ডেরই কেন্দ্রবিন্দু; আপন ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যে তা অনন্য।

টেলর সাহেব কমবেশি এই ভূখণ্ডেরই ভৌগোলিক বিবরণ দান প্রসঙ্গে এর বিশাল জলধারা অর্থাৎ নদীনালায় গতিধারার পরিচয় তুলে ধরেছেন। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, বংশাই, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও ইছামতী—আরো কত বিচিত্র নদীর নাম ও তার আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং গতিপথ অতি সংক্ষিপ্ত অথচ চমকপ্রদভাবে চিত্রিত হয়েছে। এখানে তিনি একজন সার্থক ভূগোলবেত্তাও বটে।

লেখক বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও এর বৈশিষ্ট্য, মাটিতে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের ভাগ ও গুণাগুণসহ নদীর তলদেশের (River bed) বর্ণনা দিয়েছেন নিপুণভাবে। তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় একটি মাত্র উদাহরণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ফরিদপুরের সন্নিহিতে ৩০ ফুট গভীর মাটির অভ্যন্তরভাগে পিট কয়লার ন্যায় এক ধরনের পদার্থের বিবরণ দিয়েছেন লেখক। তাঁর নিজের ভাষায়, ‘The black vegetable, mould is of various degrees of depth; in several situations it occurs in beds of a considerable extent and depth, and approaches to lignite in appearance.’

In the beds of the deep morasses in the southern division there are found small nodular masses of earth which appear to be composed of decayed vegetable matter; they are hard compact bodies of a jet black colour, and of so fine a substances, that when pulverized they are occasionally used by the natives to make ink.

In the vicinity of the large lake near Fureedpore, this earth has been found in digging wells at a depth of 30 feet below the surface.’

[Topography of Dhaka, Page 7-8]

তাঁর এই আবিষ্কার সত্য প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানি আমলে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে পিট কয়লার সন্ধানলাভের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশের জীবজন্তু ও গাছপালায় বর্ণনা আরো বৈচিত্র্যময়। টেনর সাহেব বহু জীবজন্তু ও পাখ-পাখালির চমকপ্রদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এখানকার উদ্ভিদালা ও ভোঁদড়ের চামড়া চীনের রাজপুত্রদের পোশাক তৈরির জন্য, মাহবাতা পাখির পালক ও অন্য বহু দ্রব্য ভুটান, চীন, বার্মা ও তিব্বতসহ পৃথিবীর বহু দেশে রপ্তানি করা হত। এদেশের বনে-জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, হাতি, খরগোশ, সজারু, সাপ, ভালুক ইত্যাদি নানা প্রকারের জীবজন্তু ও সরীসৃপ দেখতে পাওয়া যেত। দেখা যেত নানা রঙের পাখি।

এই ঐতিহ্যবাহুল ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত জনপদ থেকে একদা আরো বহু দ্রব্যসামগ্রীই রপ্তানি হত পার্শ্ববর্তী দেশসহ অন্য অনেক দেশে। এসব দ্রব্যের মধ্যে, মসলিন ও বুঁটিতোলা কাসিদাবস্ত্র—জেদ্দা, বসরা, মিসর, তুরস্ক এবং ইউরোপীয় দেশসমূহে; নীল, জাফরান, সুপারি, সাবান, চামড়া, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, শঙ্খবালা, অলংকারাদি, তাম্রনির্মিত বাসনকোসন, পনির এবং সংরক্ষিত ফলমূল সাধারণত কলকাতা, আসাম, আরাকান ও পেগু প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেরণ করা হত।

রপ্তানি যেমন ছিল, তেমনি আমদানিও করতে হত বহু জিনিস। তখন আসাম থেকে সরিষা ও তৈলবীজ, আসাম ও মোরঙ্গ থেকে চূনাপাথর ও কাঠ, পূর্ণিয়া থেকে তামাক, আরাকান ও ত্রিপুরা থেকে তুলা, আরাকান ও পেগু থেকে খয়ের, গজন্ড, গোলমরিচ, সৈকোবিষ, মোম, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি আমদানি করতে হত। এ ছাড়া, আসাম থেকে মুগা বা তসরসিক, পাটনা থেকে গম, খাদ্যশস্য, জুতা; কলকাতা থেকে চাক্ষুশ, বিলেতি পাকানো সুতা (Mule Twist), লঙ্কুধ, নানা রঙের সুতি ছিট কাপড়, মিহি সাদা সুতিবস্ত্র, শাল, পশমি বস্ত্র, মাটি ও কাচনির্মিত বাসনকোসন, সুই, দেশীয় ওষুধপত্র, মসলাদ্রব্য, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি আসত। প্রচুর লবণ দেশেই পাওয়া যেত। চট্টগ্রাম ও ভুলুয়া থেকে প্রচুর লবণ নারায়ণগঞ্জ বন্দরের মাধ্যমে সারা দেশে চালান হত।

অধিবাসীরা তাদের দৈনন্দিন কাজে ও কুঁড়েঘরের ছাউনিতে বহু রকম উদ্ভিদের ব্যবহার করত। কুঁড়েঘরের ছাউনিতে বন, উলুখড়, কাশ বা ঝাগড়ার ব্যবহার ছিল। গোখাদ্য ছিল দুবলা ও বক্ষা; এ ছাড়া, মুলোয়া, কুশা, হোগল পাতা, ঝাউ, বাঁশ, বেত, গড়ালী তো ছিলই। গৃহস্থের লাঙ্গল তৈরিতে আম, হিজল, বড়ই ও পাবের ব্যবহার ছিল। তাঁতের মাকু, ডিঙি নৌকা, জলাধার ইত্যাদি তৈরির কাজে তালগাছ; বাস্ত পেন্টেরা, বারকোশ, পেয়ালা, বিভিন্ন রকম বাসনকোসন তৈরিতে কদম্ব ব্যবহৃত হত। টেকি ও স্ট্যাম্পার বানাতে গাব; নৌকা, ঘরের খুঁটি ও কুড়িবরগা তৈরিতে হরীতকী ও বয়রা; সিন্দুক, আলমিরা ও চেয়ার নির্মাণে কাঁঠাল কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার ছিল, আজো আছে।

ঔষধি গাছপালায় (Medicinal herb) কমতি ছিল না সেকালে। ঔষধি গাছ-গাছড়া এবং অধিবাসীদের মধ্যে এসবের ব্যবহারবিধি পর্যন্ত লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। জয়ন্তী পাতা, সোনা বা পাহাড়িয়া বেগুনি আবলুস, অপরাজিতা, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, মুখা, পলতা, কালো কালকা সুন্দা, চিত্রা, ভুঁইকুমড়া, নিম, হেলেঞ্চা, বেল, ধনে, নাগকেশর, হাড়জোড়া লতা, তুলসী, মিষ্টি তুলসী, চম্পা, নাগফনী, শেফালিকা, জবা, মান্দার, ইশবন্তল, আমলকী, কদম্ব, থানকুনিপাতা, যষ্টিমধু, বকুল, রক্তকমল, সজনে, শতমূলী, কুন্দরী, পাথরচুর, সুন্দী শাপলা (নীলাভ ফুলের শাপলা), ধূতরা ও ভেরেণ্ডা ইত্যাদি বহু শাকপাতা, গাছ-গাছড়া নানান রোগে নিত্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এসবের ব্যাপক সন্ধান

দিতেও কার্পণ্য করেন নি লেখক। কোন্ রোগের কোন্ দাওয়াই তাও সঠিকভাবে বলে দিয়েছেন তিনি। লেখক জানেন, গরিব গ্রামবাসীরা চামচের পরিবর্তে ঝিনুক ব্যবহার করে; দুর্ভিক্ষের সময় শালুক আর ঘেঁচু সিদ্ধ হয় তাদের প্রধান আহাৰ্য বস্তু। তিনি জানেন, আবহমান বাংলায় বন্যাই বারবার আনে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। তিনি জানেন, বাগ্জিকুট ইঁদুর ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। গর্তে লুকিয়ে রাখে এরা প্রচুর ধান, আর গরিব গ্রামবাসী এদের গর্ত খুঁড়ে এক থেকে দুই মন পর্যন্ত ধান পেয়ে যায়। বনে-জঙ্গলে আছে অসংখ্য সরীসৃপ; নদীনালায় আছে প্রচুর মাছ ও জলচর প্রাণী। লেখক এসবের পরিচয়ও দিয়েছেন। জেলার উত্তরাংশে পিণ্ড এবং দানার আকারে খনিজ লৌহের অস্তিত্বের কথাও তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। ফলমূলেরও সরস বিবরণ পাই এই গ্রন্থে।

তিনি কৃষিপ্রধান ও গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের পরিচয় আরো নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন। ধান, পাট, ইক্ষুই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এখানে। বর্তমানের ন্যায়, তখনো পাট, মেস্তাপাট ও শণের চাষ হত। টেলর সাহেব লিখেছেন, এক বিঘা ভালো জমিতে তিন মন পরিষ্কার শণ উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং প্রতিমন শণের সর্বোচ্চ মূল্য দু টাকা। পাট ও মেস্তাপাট শণের তুলনায় ব্যাপক হারে চাষ করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে এর বীজ বপন করতে হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে গাছ তুলতে হয়। এগুলোর প্রস্তুতপ্রণালী শণের মতোই। পাট ও মেস্তাপাটের আঁশ দড়ি, কাগজ ও বিক্রমপুরের চট তৈয়ার করতে ব্যবহৃত হয়। কলকাতায় বেশ কিছু পরিমাণে এসব দ্রব্য রপ্তানিও করা হয়ে থাকে।

গবাদিপশু সম্পর্কেও লেখকের পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, কৃষিকাজে ব্যবহৃত গবাদিপশু নিম্নজাতোদ্ভব, দুর্বল ও ক্ষুদ্রকায় এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহের গবাদিপশু অপেক্ষা খর্বাকৃতির। এ ছাড়া, অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

বাংলাদেশের লোকজীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সাধারণ অধিবাসী ছাড়াও, উপজাতি—কোচ, রাজবংশী প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি সম্বন্ধেও মনোজ্ঞ আলোচনা আছে এতে; অন্তঃশ্রেণীর স্তরগুলোকেও সমান গুরুত্ব ও অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করার অনুরাগ লক্ষ্যযোগ্য। হিন্দুদের কামার, কুমার, ডোম, চণ্ডাল, পাটনি, পাটিয়াল, মালাকার, কৈবর্ত, গন্ধবণিক, নাপিত ও ধোপা প্রভৃতিদের এবং মুসলমানদের মধ্যে গারুড়ী, হাজাম, মাহিফরাস, বেদে, ধোপা, বাজিকর, বেহারা, বাদ্যকর, সাপুড়ে প্রভৃতিদের সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

লেখকের ঢাকায় অবস্থানকালে ১৮২৮ সালে ফরায়েজী আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলন এবং এর নেতা হাজী শরিয়তউল্লাহ সম্বন্ধেও টেলর সাহেব উদাসীন ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক, বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় জীবনের চিত্র সমান দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা বিরল বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

অধিবাসীদের চরিত্র, জীবনযাত্রা প্রণালী, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, স্বভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখকের পর্যবেক্ষণ অনেকাংশে সত্যসঙ্গ। একালের ন্যায় সেকালেও অধিবাসীদের কেউ কেউ মিথ্যা সাক্ষ্যদান, জালিয়াতি এবং মিথ্যা মামলা-মকদ্দমা রুজু করায় অভ্যস্ত ছিল। হ্যামিল্টন ও জেমস টেলর বাঙালিদের সাধারণভাবে অলস ও কাপুরুষরূপে অভিহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। মি. বি. হ্যামিল্টন সপ্তদশ শতকের অন্তিম-পর্বে ঢাকা অঞ্চল পরিভ্রমণে আসেন এবং এই জনবহুল জনপদের বিপুল ঐশ্বর্য ও জিনিসপত্রের অত্যধিক সস্তা মূল্যের বিবরণ রেখে যান। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তিনি অধিবাসীদের

ভীকৃতার কথাও উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বলশূন্য চেহারা দেখে টেলর সাহেব হয়তো এমন দুঃখজনক উদ্ভির উদ্ধৃতি দিতে উৎসাহবোধ করে থাকবেন। কারণ পলাশীর যুদ্ধে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা শুধু বিশ্বাসঘাতকদের কূটকৌশলেই পরাজয় বরণ করেন নি, আমার বিশ্বাস—তাঁর পরাজয়ের মূলে ছিল—যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ কর্তৃক নব্য ইউরোপের নতুন কূটকৌশল, ভিন্ন ধরনের যুদ্ধরীতি ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কোম্পানির সেপাইরা পরবর্তী সময়ে এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চারে সফলকাম হয়েছিল। অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তি, স্বাধীনতা ও ঐশ্বর্য হারিয়ে নিঃস্ব দরিদ্র অধিবাসীগণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। একপ পরিস্থিতিতে পাঁচ জন কোম্পানির সিপাইর পক্ষে শ পাঁচেক ‘নেটিভ’কে তাড়িয়ে নেওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বাঙালি কাপুরুষ নয়—এ সত্য আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত। হ্যামিল্টন ও টেলরের মন্তব্য চিরকালের জন্য নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। নব জাতি মহাচীন একদা আফিমের ঘোরে ঝিমিয়ে ছিল। তাই বলে আজো সে অলস, নিষ্ক্রিয়—একথা আর কে বলবে? বাংলাদেশীরাও একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীনতা এনেছে। অকুতোভয় তরুণেরা দুঃসাহসিক অভিযানে নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা আর শক্তির পরিচয় দিয়ে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছে। আজ আর কে বলবে বাঙালি ভীক, কাপুরুষ?

একদা এই স্বাধীন বাংলাদেশ অঞ্চল ছিল—নিখিল বঙ্গের শস্যভান্ডার। চাল, ডাল, কাঁচা ফলমূল এখানে অকল্পনীয়রূপে সস্তা ছিল। ১৮১০ সাল থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে এক মন আমন চাল বিক্রি হত ১ টাকায়। এক সের পরিমাণ পুঁটি মাছ মিলত এক পয়সার অর্ধেক দামে। এক মন আউশ চাল পাওয়া যেত এক টাকারও কম মূল্যে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ঢাকা পরিভ্রমণে এসে হ্যামিল্টন সাহেব এবং এর পূর্বে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সিজার ফ্রেডারিক সন্দীপ অঞ্চলে পদার্পণ করে একই রকম সস্তাদামে জিনিসপত্র বিক্রি হতে দেখেছেন। এতৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে অকালবন্যা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি অধিবাসীদের জন্য বয়ে আনত অপরিমিত দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্যাভাব এবং পরিণামে দুর্ভিক্ষ। আজো তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। লেখকও সুদূর অতীতে অকালবন্যাকে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেছেন। এবং ১৭৮৪, ১৭৮৭, ১৭৮৮ সালের মহাদুর্ভিক্ষও শুধু উল্লিখিত বন্যার কারণেই দেখা দিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বর্ণনা যে পরিমাণে পাই, ঠিক সে পরিমাণে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জীবনের পরিচয় মেলে না। যিনি এদেশের প্রতিটি বিষয় গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁর পক্ষে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক ছিল না। লেখকের সমসাময়িককালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্য নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। তৎকালে ঢাকায় মুসলমানদের মধ্যে আরবি-ফারসির চর্চা ছিল; কিন্তু কোনো সাহিত্যচর্চা হত কি না—তার আদৌ কোনো উল্লেখ নেই। শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। এ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়—সামান্য বাংলা, ফারসি ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীরামপুর মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে ও অর্ধে রেভারেন্ড মি. লিউনার্ড কর্তৃক ২৯টি বিদ্যালয় পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য অর্থের অভাবে অল্পকালের মধ্যেই এর সংখ্যা মাত্র ৭-এ এসে পর্যবসিত হয়।

মুঘল আমলে নিঃস্ব গরিবদের আহাৰ্য যোগানোর জন্য ‘লঙ্গরখানার’ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোম্পানি আমলে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেই বলে লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, ১৮২৮ থেকে বিলেতি পাকানো সূতার ব্যাপক আমদানির ফলে মসলিনসহ

এদেশীয় বস্ত্রশিল্প কী নিদারুণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তারও ফিরিস্তি দান করেছেন তিনি।

জেমস টেলরের বর্ণনায় বাংলাদেশের নিভৃত আঙিনার রহস্যপূরীতে প্রবেশের স্বাক্ষর আছে। মেঘনার তীরবর্তী গ্রাম সিদ্দিকপুর, গঙ্গাতীরের গ্রাম মাছুয়াখালি, চাগঞ্জ ও দুবাই; রসুলপুর পরগনায় আছে খোসালবাগ। কত নাম! কত ইতিহাস।

নিভৃত পল্লীপথে কোথায় হেলেঞ্চা, গন্ধভেদালী আর কলমি শাক, কোথায় মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে হিঙ্গল ফুল ছড়ায়, কোথায় গভীর জঙ্গলে ফলে অজস্র চালতা, কোথায় থাকে মাছরাঙ্গা, কোথায় বাস করে ভৌদড় আর উদ্‌বিড়াল, কোথায় ইঁদুর লুকিয়ে রাখে মুঠি মুঠি ধান, কেমন করে বর্ষায় বন্যায় মাঠের ধান শ্যাওলা পানায় ঢাকে, কোথায় বাসা বাঁধে ভুঁইপাখি, কোথায় থাকে নিশাচর 'অক', শাপলা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কেমন করে বেঁচে থাকে চীনা জোক—এসবই একদা অন্তরঙ্গ চোখে সঙ্গোপনে দেখেছেন টেলর। আর গবেষকদের জন্যে রেখে গেছেন গবেষণার অফুরন্ত উৎস। আমি মনে করি, যারা এদেশের মাটি ও মানুষকে ভালবাসেন, যাদের ঔৎসুক্য আছে দেশকে নিবিড়ভাবে জানার—তাদেরকে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি দিতে পারলেই আমার এ অনুবাদকর্ম সার্থক হবে। এই মূল্যবান গ্রন্থটির অনুবাদ খুব সহজ কর্ম ছিল না। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবজন্তু ও গাছপালা সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞান এর অনুবাদের জন্য অপরিহার্য বলা যায়। একাদশ অধ্যায়ে আছে চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা। এর সঠিক ভাষান্তরের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। এসব ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন বন্ধুবর মকবুল হোসেন, আমার প্রিয় ছাত্র, জর্জ স্টিফেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক মকসুদ আলী ও ঢাকা কৃষি কলেজের প্রভাষক আজহারুল ইসলাম।

মূল ইংরেজি গ্রন্থটি অধুনা দুস্প্রাপ্য। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার সহকর্মী বন্ধু মির্জা হারুনুর রশীদ সাহেব বইটির সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন এবং জগন্নাথ কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ আ. ন. ম. বজলুর রহমান সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আলমিরা থেকে বইখানা আমাকে প্রদান না করলে এর অনুবাদ আমার দ্বারা হয়তো কখনোই সম্ভব হত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. নজমুল করিম সাহেবের সুপারিশক্রমে বইটির অনুবাদকর্ম হাতে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

ছাপার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে বর্ণযোজনের স্বত্বাধিকারী বাবু বিভূতিরঞ্জন সাহা, নির্ঘণ্ট প্রস্তুতে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র মাহমুদ হাসান নিরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল গবেষক আহমদ নূরুল ইসলাম ও সহকর্মী অধ্যাপক সফিউল আলম সাহায্য করেছেন। এ গ্রন্থ অনুবাদে আমার একটাই সান্ত্বনা : এতে কমবেশি বাংলাদেশেরই ভূপ্রকৃতি ও বিস্তৃত জনপদের সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত।

মূল গ্রন্থকার কর্তৃক পুস্তকের প্রস্তাবনারূপে লিখিত পত্র

ফোর্ট-উইলিয়ামের মেডিক্যাল বোর্ডের সচিব মাননীয়

জেমস্ হাচিন্সন সমীপেষু,

মহাশয়,

মেডিক্যাল অফিসারদের উদ্দেশে প্রদত্ত নির্দেশে স্ব-স্ব জেলা এবং কার্যস্থলের ভূপ্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আপনি যে আদেশ দিয়েছিলেন সেই মোতাবেক আমি মেডিক্যাল বোর্ডের সমীপে এতৎসংলগ্ন “ঢাকার ভূপ্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” উপস্থাপন করছি।

মহামান্য গভর্নর-জেনারেল-ইন্-কাউন্সিল এর প্রদত্ত স্বাক্ষরিত অনুসন্ধানের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সার্জনদের প্রতি প্রদত্ত সরকারি নির্দেশনামায় এবং গভর্নর-জেনারেলের নির্দেশাবলিতে প্রকাশিত সরকারি আদেশে যে সমস্ত বিষয় নির্ধারিত হয়েছে—তা নিম্নরূপ : (১) স্থানের অবস্থান ও সীমানা, (২) নদনদী, জলাশয়, কূপ এবং জলাভূমি, (৩) জলবায়ু, (৪) মৃত্তিকা, (৫) জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও বনিজদ্রব্য, (৬) কৃষি অবস্থা, (৭) সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, (৮) স্থানীয় এবং মহামারী আকারের রোগব্যাধি, (৯) হাসপাতালের অবস্থা এবং এর অন্তর্ভুক্ত ঘরসমূহের আয়তন, (১০) লোকসংখ্যা, (১১) হাঙ্গামার অবস্থা এবং এর অন্তর্ভুক্ত ঘরসমূহের আয়তন, (১২) লোকসংখ্যা, (১৩) হাঙ্গামার অবস্থা এবং এর অন্তর্ভুক্ত ঘরসমূহের আয়তন, (১৪) আদমশুমারি, (১৫) অতিথি ও প্রাচুর্যের কারণ ও ফলাফল। (১৬) দরিদ্রের অবস্থা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়, (১৭) শ্রমের মজুরি, (১৮) অপরাধের বাস্তব কারণ, (১৯) মৃত্যুর অনুপাত, (২০) জনের সঙ্গে বিবাহের সাধারণ অনুপাত, (২১) জেলার আয়তন, ভূমির তুলনামূলক উর্বরতাশক্তি, অধিবাসীদের অভ্যাস এবং হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত।

এগুলোর অধিকাংশ বিষয়ে আমার মন্তব্য ছাড়াও, আমি জেলার ইতিহাস, স্থানীয় শিল্পদ্রব্যাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজস্ব ও শিক্ষার অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। অধিকন্তু বলতে পারি যে, আমি যেসব তথ্য পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছি, তা এ স্থানে আমার আট বছর অবস্থানকালের ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে অর্জিত। বিভিন্ন সরকারি অফিস-আদালতের নথিপত্র পাঠ করে এবং শহর ও গ্রামে বসবাসকারী লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও আমি তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। শহরের লোক গণনার কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে, আমি ম্যাজিস্ট্রেট মি. জে. গ্রান্টের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া, বিগত দশ বছর যাবৎ জলবায়ুর যে বিবরণ আবহাওয়া সংক্রান্ত রেজিস্টারে মি. ল্যান্স সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে তথ্য লাভের জন্য আমি তাঁর নিকট স্বীকৃত। এ শহরের অধিবাসী গঙ্গাচরণ ও গঙ্গা দাস নামক দুজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মসলিন বস্ত্র বয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি লাভ করার জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলকাতা
৩০শে মার্চ, ১৮৩৯ ইং

আপনার একান্ত বিশ্বাস
জেমস্ টেলর
সার্জন

লেখক ও অনুবাদকের পরিচিতি

১. (Topography of Dhaka) নামক গ্রন্থের লেখক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের আমলে ঢাকায় কর্মরত সিভিল সার্জন জেমস্ টেলর। ইনি বিদেশী ও একজন ইংরেজ ছিলেন। ইংরেজি ১৮৩৯ সালে তিনি কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মেডিক্যাল বোর্ডের সচিব জেমস্ হাচিন্সনের অনুরোধে তাঁর নিকট রোগ-ব্যাধির বিবরণসহ ঢাকার ভূপ্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে পেশ করেন। অনুবাদক এরই বাংলা রূপান্তরের নামকরণ করেছেন ‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’।
২. ‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’ নামক গ্রন্থের অনুবাদক প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অনুবাদক ও চিন্তাশীল প্রবন্ধকার। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত তাঁর অন্য আর একটি অনূদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ (দু খণ্ডে) ‘বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস’।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১—৮

ঢাকা জেলার অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি—উত্তরাঞ্চল—পূর্বাঞ্চলীয় উপবিভাগ—দক্ষিণাঞ্চল
ভূমিরূপ—নদনদীসমূহ—জলবায়ু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৯—২৭

জীবজন্তু—বিভিন্ন পাখি—সরীসৃপ—নানাপ্রকার মাছ—পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে আগত
জীবজন্তু—উদ্ভিদ—ভোজ্য উদ্ভিদ, জলাভূমি ও আশপাশের উদ্ভিদ—আর্দ্র ও শুষ্কভূমির
উদ্ভিদ : যেগুলোর পাতা ও শাখা—প্রশাখা সবজিরূপে ব্যবহৃত হয়—ফলের গাছ : শুষ্ক ও
আর্দ্রভূমি অঞ্চলের গাছপালা—ঔষধি গুল্মসম্পন্ন গাছপালা—পত্রর বাদ্য ও বিবিধ কাজে
ব্যবহৃত উদ্ভিদ—খনিজ দ্রব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

২৮—৩৯

রাজা বিক্রমাদিত্য—বানিয়া ও পাল রাজবংশ—আদিশূর রাজবংশ—বল্লাল সেন—
মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়—স্বাধীন নরপতিগণ কর্তৃক রাজ্যশাসন—ষোড়শ শতাব্দীর
শেষভাগে ঢাকা—আরাকান রাজ্যের চাঁটিগা ও সন্দ্বীপ এলাকা—আফগানদের বিতাড়ন—
মীরজুমলার শাসনকাল—শায়েস্তা খান—মুর্শিদকুলী খানের দেওয়ানি লাভ।

চতুর্থ অধ্যায়

৪০—৫৮

ঢাকার অবস্থান—চকবাজার—স্থাপত্যরীতি—জনহিতকর পূর্ত কাজকর্ম ও প্রতিষ্ঠানাদি—
মুসলমানদের উপাসনার স্থান—হিন্দুদের প্রধান উপাসনার স্থান—ঢাকা শব্দের উৎপত্তি—
ভার্থেমা কর্তৃক বাংলার বর্ণনা—লালবাগ—ইংলিশ ক্যাটরি—ফরাসি ক্যাটরি—মুঘল
সরকারের আমলে পুলিশ ব্যবস্থা—সরকারি সংস্থাপন বিভাগসমূহ—নারায়ণগঞ্জ—
বিক্রমপুর—ফিরিজি বাজারে পর্তুগিজদের বসতি—রাজনগর—কার্তিকপুর—সোনারগঞ্জ—
লাঙ্গলবন্দের মেলা—ভাওয়াল—টলেমিল প্রাচীন ক্রীডাবোল—কাপাসিয়া—রানীবাড়ি—তকি
এবং এর অবস্থান—সাতার ও ডেমরা—রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের উপায়—বিভিন্ন রকমের
নৌকা—কলকাতার পথ—ময়মনসিংহে যাবার রাস্তা।

পঞ্চম অধ্যায়

৫৯—৮২

কৃষি—মৃত্তিকা—কৃষিজাত দ্রব্য—পাঁচ প্রকারের ধান—চাষ প্রণালী—জোয়ার—তৈলবীজ—
ভিল—ডাল—অন্যান্য শস্য—তুলা চাষ প্রণালী—যে মানদণ্ড দিয়ে তাঁতিরা তুলার গুণ বিচার
করে—জাফরান—জাফরান বপন ও সংরক্ষণ করার সময়—পিটক তৈরি করার পদ্ধতি—
বাজারদর—নীল—শণ—চাষ করার খরচ—পাট ও মেস্তাপাট—ইক্ষু—চাষের পরিমাণ—
মরিচ—হলুদ ও আদা—তামাক—যে সকল গাছ গ্রামবাসীরা তাদের বাড়িঘরের আশপাশে
চাষ করে থাকে—পান—কুমড়া—কদু—কলা ও আনারস—লেবু—সুপারি—সুপারি
রঙানি—নারকেল গাছ—কশাদা গাছের চাষ—কফি ও আনাড়ু—ইউরোপীয় শাকসবজি—

কৃষিক্ষেত্র—জমিতে সার প্রয়োগ—পানিসেচ—কৃষি যন্ত্রপাতি—গবাদিপশু—ধানকাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ—দুগ্ধবতী গাভী—পনির—মেষ, ছাগল ইত্যাদি—কম্বল—ভূমির মাপ—মাপের পদ্ধতি—বিঘার মাপ—খাজনা ও রায়তগণ—বর্গা পাট্টা প্রদান—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে কর-নির্ধারণ পদ্ধতি—রাজস্বের অন্যান্য উৎস—জলকর—খেয়াঘাট ও হাট—তালুকদারগণ—জমিদার শব্দের উৎপত্তি—জঙ্গলবার বাড়ি তালুকদার—জোর-খরিদ তালুকদার—পাট্টা তালুকদার—ওয়াসাত তালুকদার—হাওলাদার বা করদাতা—তালুকদারগণ কর্তৃক প্রদত্ত রাজস্বের বিভিন্ন হার—জমিদার—এঁরা মূলত তহসিলদার ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করতেন—মগদের প্রতিরোধকল্পে নৌকা ও লোক সরবরাহের শর্তে অনেক ভূমিকর নেওয়া হত না—যারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন তাঁদেরকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারদের উন্নতি—এর মূল কারণ—টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি—জমিদারদের বর্তমান অবস্থা—বর্তমান আর্থিক সংকটের কারণ—তালুকের অংশীদারদের মধ্যে কলহ—নদীর গতি পরিবর্তন—জমিদারদের কখনো উপকার করে, কখনো ক্ষতিসাধন করে—১০০০ টাকার উর্ধ্বে রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারদের সংখ্যা—জমিদারি খাজনা আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী—মণ্ডল ও তার কর্তব্য—পাটোয়ারী ও তার কর্তব্য—আরো উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ—প্রধান প্রধান জমিদারের দেওয়ান ও উকিল—ছোট ছোট তালুকদার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৮৩—১০০

বয়ন শিল্প—ঢাকাই মসলিন—সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা—মির্জাপুরের তুলা—সূচীশিল্প—গুদ্রকরণ ও ধৌতকরণ—স্বর্ণ ও রৌপ্যকর্ম—শঙ্খ শিল্প—অন্যান্য শিল্প—রপ্তানি দ্রব্য—চামড়া—আমদানি দ্রব্য—ওজন—পরিমাপ—বণিক সম্প্রদায়—দালাল বা শরফ—ঢাকা ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

সপ্তম অধ্যায়

১০১—১১৮

মুঘল শাসনামলে রাজস্ব—জায়গীর প্রদান—ভূমিরাজস্বের সঙ্গে সংযুক্ত করকে ‘আবওয়াব’ বলা হত—খাসনবীসি—রাজস্ব আদায়ের খরচ—সায়ার কর নির্ধারণ—অন্যান্য কর—হাট-বাজারের উপর আরোপিত শুল্ক—১৭৬৫ সাল থেকে রাজস্ব—সরকার কর্তৃক উদ্ধারকৃত সম্পত্তি—রাজস্ব হ্রাস—১৭৭২ সালে পাঁচ বছরের জন্য মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল কর্তৃক বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি—১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কালেক্টরের এলাকা—অধিকতর সহজ পদ্ধতিতে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা—মুঘল শাসনামলে রাজস্ব বিভাগের বিভক্তিকরণ—১৭৬৫ সাল থেকে জেলার সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা—১৭৭১ সালে মি. হ্যারিস তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন—নদীপথে ও সুন্দরবনে অসংখ্য ডাকাতদল—১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে লান্সার্ট নিযুক্তি লাভ করেন এবং কালেক্টর উপাধি নিয়ে মি. গ্রন্থারের স্থলাভিষিক্ত হন—১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সন্ন্যাসীদের বিরাট সমাবেশ—১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়—জশরৎ খান স্বপদে বহাল থাকেন—ইংরেজ ও ফরাসিদের ঝগড়া—ডাক দপ্তর—ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যদলের পরিমাণ—সরকারি ব্যাংক স্থাপন—আর্কট মুদ্রা—তাঁতি সম্পর্কিত মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য নায়েবদের নিয়োগ—১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ও কোম্পানির আদালতের মধ্যে সংঘর্ষ—ইংরেজদের নিকট ফরাসি ফ্যাক্টরি সমর্পণ—১৭৮১ সালে কাউন্সিল বাতিল—ম্যাজিস্ট্রেটের বৈধ কর্তৃত্বের সীমা—কালেক্টরের অফিস।

জনসংখ্যা—ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা—ভাওয়াল—হাসানাবাদ—হিন্দু সম্প্রদায়—অসমীয়া
কর্তৃক আমন্ত্রিত কনৌজের ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী—ব্রাহ্মণ—বৈদ্য—কায়স্থ
সম্প্রদায়—শূদ্র—শাঁখারী—কামার—কুমার—সদাশিব গোস্বাল—মল্লিকার—নামিত
সম্প্রদায়—গণক বা আচার্য ব্রাহ্মণ—অধনালী ব্রাহ্মণ—সূর্য বর্গ—সৌন্দর্য বা
সাউলোক—কাপালিক সম্প্রদায়—পাটিয়াল—পাটলী—কৈদার্ত—তাহলী সম্প্রদায়—গহ
বণিক—ডোম ও অন্যান্য সম্প্রদায়—চণ্ডাল—ফেগী সম্প্রদায়—গরুড়ী—দাঁদিয়া বা বেদন
সম্প্রদায়—বেদেদের ভেলকিবাজি—কোচ ও দাভবংশী—তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি—
কালী ও কৃষ্ণ উপাসকগণ—প্রধান বৈষ্ণব উৎসব—মুসলমান সম্প্রদায়—কতিপয় নিম্নশ্রেণীর
মুসলমান সম্প্রদায়—হাজাম/ধোপা/মাহিফরান/বেহার/সপুড়িয়া/বাজির—পীর ও
কতিপয় ফকির—মুহররম অনুষ্ঠান—বেড়া উৎসব—মুসলমানদের এক নতুন সম্প্রদায়—
ফরায়েজীগণের নীতি—বিয়েশাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি—সংস্কার কার্যাবলি—খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী
সম্প্রদায়—চট্টগ্রামে বসতিস্থাপন ও পরবর্তীকালে শ্রীপুরে—১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে নির্মিত
তেজগাঁও গির্জা—উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নবাবের অফিসেই সৈন্যদলে নিযুক্তি—
ইংরেজদের প্রথম বসতি স্থাপন—বিনা শুদ্ধে ইংরেজদের বাণিজ্য করার অধিকার লাভ—
১৭৭৮ ও ১৮৩৮ সনের ইংরেজ অধিবাসীগণের পেশা ও চাকরির অবস্থা—আর্মেনীয় ও গ্রিক
অধিবাসী—১৮৩৮ সালে শহরে খ্রিষ্টিয়ানদের মোট সংখ্যা।

বাংলার অধিবাসীগণের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা—প্রকৃতিগতভাবে এরা অলস ও নিষ্কর্মা—
স্বভাবে নিরীহ ও শান্ত—হিন্দুদের সংগঠিত সমাজ বা সংঘগুলো “দল” নামে আখ্যায়িত—
সমাজপতি—মুসলমানদের মধ্যে একই ধরনের সমাজ ও অন্যান্য বিষয়—বিয়েশাদি—শ্রেণী
অনুসারে খরচপত্রের তারতম্য—একটি অনুষ্ঠানের সর্বনিম্ন হার—নিতান্ত পরিব পরিবারের
শ্রাদ্ধ—হিন্দুদের মধ্যে ধাত্রীর ব্যবস্থা নেই—পারিশ্রমিকের পরিমাণ—হিন্দুদের মধ্যে
মায়েরাই স্তন্যদান করে—আফিম সেবনই প্রায়শ শিশু মৃত্যুর কারণ—অবস্থাস্থালী হিন্দুদের
কথাবার্তা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি—পরদা—পালঙ্কের ব্যবহার—পোশাক-পরিচ্ছদ—হিন্দু
মুসলমান রমণীদের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান—প্রচলিত কুসংস্কার—ক্রয়বিক্রয়ের পদ্ধতি—
আমোদ-প্রমোদ—প্রধান খেলা “আকুন্দা” নামে পরিচিত—জ্বালের সাহায্যে হরিণ ধরা—
মৃগয়া বা গুলি ছোড়া—মাছধরা—গৃহাভ্যন্তরীণ আমোদ-প্রমোদ—সঙ্গীত বিষয়ক বাদ্যযন্ত্র—
শিক্ষা—হিন্দু বিদ্যালয়ের সংখ্যা—মুসলিম বিদ্যালয়ের সংখ্যা—বিক্রমপুর, সংস্কৃত শিক্ষার
কেন্দ্র—জ্যোতির্বিদ্যা—চিকিৎসা শাস্ত্র—ইসলামি উচ্চশিক্ষার অবস্থা—সরকার কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বিদ্যালয়—মামলা-মকদ্দমা, অপরাধ সংঘটন এবং এসবের বাস্তব
কারণ—অপরাধমূলক কাজ—সংঘবদ্ধ ডাকাতি—প্রচলিত অপরাধের নমুনা—উদ্ভেজক
দ্রব্যাদি—আফিম ব্যবহারের পদ্ধতি—চরস—তাঁটিখানার সংখ্যা—আরক—তাড়ি ও কৃষ্ণ—
জুয়াখেলা অপরাধের একটি উৎস—পতিতালয়—১৮৩৬ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে
বিচারকৃত মামলা—বাদানুবাদ থেকে উদ্ধৃত ঝগড়ার মামলা—মিথ্যা সাক্ষ্যদান—ঈর্ষাবশত
অগ্নিসংযোগ—ব্যভিচার—নরহত্যা—সতীদাহমূলক অপরাধের সংখ্যা—জমিদারগণের পীড়ন
বা অত্যাচার—জেলখানার অবস্থা—অপরাধের বিবরণ ও প্রেক্ষারকৃত, সাজাপ্রাপ্ত ও
খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা।

দশম অধ্যায়

১৬৪—১৮৩

বাংলার পূর্বাংশ প্রদেশের শস্যভাণ্ডার—বিভিন্ন সময়ে শহরে খাদ্যশস্যের গড় মূল্য—গমের ব্যবহার—মাছ—শাকসবজির প্রাচুর্য—মসলা ইত্যাদি—লবণ ও তেলের দশ বছরের গড়মূল্য—জ্বালানি প্রচুর এবং সস্তা—মাটির তৈরি রান্নাবান্নার বাসনকোসন—প্রস্তুত করা খাদ্যসামগ্রী বিক্রি—খাদ্যদ্রব্য সস্তা হওয়ার প্রধান কারণ পরিবহনের সযোগ-সুবিধা—হাটবাজারের সংখ্যা—একজন মজুরের দৈনিক খোরাকির ন্যূনতম ব্যয়—প্রাচুর্য ও অভাবের কারণ এবং ফলাফল—প্লাবন ও প্রবল বৃষ্টিপাত থেকে অভাবের সূত্রপাত হয়—আগাছাজনিত ক্ষয়ক্ষতি—গুঁয়াপোকার আক্রমণ—শিলাবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি—দুর্ভিক্ষের ফলে গরিবদের শোচনীয় দুঃখকষ্ট ও দুর্গতি—১৭৮৪ সালে চালের মূল্য—প্লাবনে সিলেট ও ত্রিপুরা জেলার অবস্থা—১৭৮৭-৮৮ সালের প্লাবন—দুর্ভিক্ষ—প্রাণহানির সংখ্যা—সন্তান বিক্রি—শ্রমের মজুরি—শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি—শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস—যন্ত্রে তৈরি সুতা দেশীয় সুতার স্থান দখল করে নেয়—সুন্দর সূচীকর্ম করা বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস—কৃষিভৃত্য, দিনমজুর ও তাদের পারিশ্রমিকের হার—সরিষার তেল উৎপাদনের কারখানা—দাড়ী মাঝি—নৌকা ভাড়া—সড়ক কুলি—কারিগর—সূচীশিল্পীর পারিশ্রমিক—শুভ্রকরণের খরচ—শাঁখা প্রস্তুতকারী শাঁখারু—গৃহভৃত্যদের মজুরি—দরিদ্রশ্রেণী ও দাসদাসীদের অবস্থা—সংঘ বা সমিতির অভাব—দ্বিতীয় শ্রেণীর দরিদ্র—তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র—মুঘল আমলে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতাল—দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ—দাসত্ব প্রথা বাংলার পশ্চিমাঞ্চল থেকে এখানে অধিক প্রচলিত—এক একজন দাসদাসীর মূল্য।

একাদশ অধ্যায়

১৮৪—২০৬

রোগব্যাধি ও প্রতিকার, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি—দেশের আকৃতি-প্রকৃতি চারভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় ভাগ—তৃতীয় বা জল প্লাবনিক ভূ-ভাগ—চতুর্থ ভাগ বা শহরাঞ্চল—সমাধি—চিতা—ম্যালেরিয়া রোগের কারণসমূহ—সোনারগঞ্জ ও ভাওয়াল অস্বাস্থ্যকর স্থান—ধান্যক্ষেত্র বিশেষভাবে অস্বাস্থ্যকর—সন্নিহিত পাট ও শণ পচানো পুকুর অনেক সময় জ্বরের কারণ—নীল গাছ পচানো—বদ্ধ পানি ব্যবহার ও পান করা রোগব্যাধির বড় উৎস—রোগব্যাধির কয়েকটি সাধারণ উপসর্গ—১৭৮১ সালের মহামারী—১৭৯৭ সাল—১৮১৭ সালের কলেরা মহামারী—সবিরাম জ্বর—গোদ ও গলগণ্ড—গলগণ্ড—গ্ৰীহা—রক্ত আমাশয় ও উদরাময়—বাতরোগ—গুটি বসন্ত ও অন্যান্য চর্মরোগ—চোখ ওঠা রোগ—নাকরা—চর্মরোগ—গর্মিরোগ বা সিফিলিস—বদহজ্জমি রোগ—অন্ত্রকীট—উন্মাদ—জ্বলাতন—মৃগী রোগ, অসাড়া ও সন্ধ্যাস রোগ বা অঙ্গবিকৃতি—কারিগর শ্রেণীর রোগব্যাধি—দুর্ঘটনা—১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা—দেশীয় হাসপাতালে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও আকস্মিক মারামারি থেকে আহতদের ভর্তির সংখ্যা—অর্শরোগ—হার্নিয়া—জন্মগত দোষজনিত ব্যাধি—সন্তান প্রসব—দেশীয় হাসপাতাল—পাগলা গারদ—জেল হাসপাতাল—মানবেতর জীবজন্তুর রোগ।

দ্বাদশ অধ্যায়

২০৭—২১১

বিভিন্ন শিল্পের ক্রমাবনতি—শহরের সাধারণ অবনতি—শহরের উন্নতিকল্পে প্রস্তাব—উৎসকৃপ নির্মাণ—নতুন হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রয়োজন—রেভারেন্ড মি. শেফার্ড।

নির্ঘণ্ট

...

...

২১২—২২২

পরিশিষ্ট

...

...

২২৩—২২৪

প্রথম অধ্যায়

[ঢাকা জেলার সাধারণ বিবরণ—বিভাগসমূহ—প্রাকৃতিক গঠন ও
সীমারেখা—মৃত্তিকা—নদনদী ও জলবায়ু]

ঢাকা জেলার অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি

ঢাকা জেলা বঙ্গদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত। এ জেলা প্রধানত 23° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে 28° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং 90° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাবিধৌত এই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীন। এর আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায় ও ভূমি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং এর চূড়াটি ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের দিকে প্রসারিত। এ জেলা উত্তরে ময়মনসিংহ, দক্ষিণে বাকেরগঞ্জ, পূর্বে ত্রিপুরা ও পশ্চিমে ফরিদপুর বা ঢাকা জালালপুর প্রভৃতি জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পূর্বে এসব জেলা এর অধীন ছিল, এবং এই সমুদয় এলাকা নিয়ে ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল বিস্তৃত একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। এ জেলার উত্তর-দক্ষিণের সর্বাধিক প্রশস্ত স্থানের দৈর্ঘ্য ৭০ ও সর্বোচ্চ প্রস্থ ৫৯ ভৌগোলিক মাইল, এবং আয়তন ১,৭৫০ বর্গমাইলের উর্ধ্বে নয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এর আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ অনাবাদী ও বনাঞ্চল এবং এক-সপ্তমাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে নদীর শাখা-প্রশাখা এবং ঝাড়িসমূহ।

সমুদ্র থেকে এ জেলার দক্ষিণ প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল। এই সমগ্র অঞ্চলটি বড় বড় নদনদীর শাখা-প্রশাখা দ্বারা শতধাবিভক্ত। এর ফলে এ অঞ্চলের আট-দশমাংশ স্থান বছরের বেশ কিছু সময়ই দু থেকে চৌদ্দ ফুট গভীর পানিতে নিমজ্জিত থাকে। প্রাকৃতিক গঠন, বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা এবং জমির আপেক্ষিক উর্বরাশক্তি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে এই জেলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। কনাই, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা এবং ইছামতী নদী এ দু অংশের মধ্যবর্তী সীমা নির্দেশ করে।

উত্তরাঞ্চল

এ জেলার উত্তরাংশ প্রায় ৯০০ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত। এ অঞ্চলের পূর্বে মেঘনা নদী, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদীর কিসদংশ এবং একটি সীমারেখা আঢ়িয়া ও কাশিমপুরের ঘন-বনাঞ্চল

হয়ে কনাই নদীর তীরে অবস্থিত আমতা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের সীমানা কনাই নদী, ধলেশ্বরীর উপরোধ এবং ইছামতী নদীর যে স্থানে বৃষ্টিগঙ্গা মিলিত হয়েছে, সে স্থান থেকে মেঘনার সঙ্গে এর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। লক্ষ্যা নদী এ অঞ্চলকে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিভক্ত করেছে। একপাশে বিভক্ত দুটি অংশের পশ্চিমাংশে ঢাকা মহানগরী অবস্থিত এবং এ অংশই সমাদিক বিস্তৃত। বর্ষাকালে এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান চতুর্দিক নদীসমূহের উচ্চতম জলসীমার চেয়ে উপরে থাকে। শহরের বেশ মাইল উত্তরে বেশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট গড়াঞ্চল সীমান্তে অবস্থিত গিরিশ্রেণীর সমান্তরালে চলে গেছে। এ অঞ্চলের মাটি লাল কাকর এবং কাদামাটির বিভিন্ন স্তরে গঠিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান সবুজ উদ্ভিদের পাতলা আচ্ছন্ন দ্বারা এবং নদী ও খাল-নালায় দিকে পলিমাটির স্তর দ্বারা আবৃত। এই অঞ্চল একটি বিস্তৃত ভূভাগের অংশ, যার মৃত্তিকা ও উচ্চতা একই প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের দিকে প্রসারিত। আটমা পরগনার বেশ কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত এবং ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বস্থান থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত মধুপুর পর্যন্ত এ সমগ্র অঞ্চল পশ্চিমে চামতলা এবং পূর্বে নান্দিনা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৭০ মাইল ও প্রস্থে ৩০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। ছোট ছোট পাড়া এ অঞ্চলের পশ্চিমাংশ হতে ক্রমাগত আকারে বড় ও অধিক পরিমাণে উচ্চ হয়ে উত্তর পশ্চিমে চলে গেছে এবং শেষ প্রান্ত সমাদিক উচ্চতায় ঐপুরা পাহাড়ের সমান্তরালে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত হয়েছে।

এ সমস্ত পাহাড় লৌহ আকর সঞ্চিত লাল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এবং ২০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। উত্তরাঞ্চলের এ সমস্ত উচ্চভূমি কাকরমিশ্রিত মৃত্তিকাবিশিষ্ট ও ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত এবং ব্রহ্মপুত্র ও এর প্রধান শাখানদী কিনাইয়ের মধ্যে অবস্থিত। এর প্রাকৃতিক গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এ অংশে ছোট ছোট নদীনালা দ্বারা বিনোদিত; বিশেষ করে আশপাশে বড় বড় নদনদীর অববাহিকা ও পলি অঞ্চলের সঙ্গে এ অংশের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে এর অধিকাংশ অঞ্চলই অনুর্বর ও অনাবাদী এবং গন বনাঞ্চল ও অত্যন্তরভাগ বিশাল বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা গনসম্মিষ্ট। বহুসংখ্যক হাতি, বাঘ, নেকড়ে ও ভালুক এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কিছু কিছু আবাদী ভূমি এই জঙ্গলের আশপাশে সীমাবদ্ধ এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত অত্যন্তরভাগের ছোট ছোট নদীনালায় তীরবর্তী এসব কর্ষিত ভূমি কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আরো দক্ষিণে শহরের দিকে চাষাবাদ অধিক বিস্তার লাভ করেছে। এলাকায় লাল মৃত্তিকা ছোট ছোট খালমালা এবং আরো অত্যন্তরভাগে বড় বড় জলাভূমির দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এগুলোর আশপাশে ধান, সরিষা ও তিল উৎপন্ন হয়। অপর দিকে, শহরের পূর্বদিকে পলিমাটি অঞ্চল দেখা যায়। এ অংশে বিস্তীর্ণ সমতল আবাদী ভূমি নীতলক্ষ্যা ও বৃষ্টিগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্বাঞ্চলীয় উপবিভাগ

পূর্বাঞ্চলীয় উপবিভাগ মেঘনা ও নীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। বর্ষাকালে এর অধিকাংশ স্থান জলপ্রাণিত থাকে। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় এর অধিকাংশ ভূমিই পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এ ভাগের উত্তরাংশেই প্রধানত লাল মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মেঘনা নদীর সন্নিকটস্থ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত সমগ্র উচ্চভূমি অঞ্চলেও এটি লালমাটি দৃষ্টিগোচর হয়। এই উপবিভাগে খুব কমই প্রাচীন বনাঞ্চল দেখা যায় এবং পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় এখানে অধিকতর চাষাবাদ পরিলক্ষিত হয়। এককালে এ অঞ্চল প্রাচীন সোনারগাঁওয়ের অংশ ছিল। বর্তমানে এর অনাবাদী স্থানসমূহ ঘোপখাড়ে আবৃত এবং এর

ফাঁকে ফাঁকে ফলের গাছ, দিঘি ও ঘাটের চিহ্ন দৃষ্টি পড়ীয়মান হয় যে, কোথাও এক সময়ে এ সমস্ত জায়গা খননস্ফূর্তিপূর্ণ গ্রাম ছিল।

দক্ষিণাঞ্চল

দক্ষিণ বিভাগীয় অঞ্চল প্রায় ৮৫০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। জেলায় এ অঞ্চলটি সর্বাঙ্গের উর্বরা। এর সীমানা—পূর্বে উত্তরমুখী ও মেঘনা নদী, পশ্চিমে গঙ্গা নদী, উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে আড়িয়াল বা চক্কাব জলাভূমি, আড়িয়াল বা ও কুলসী পল্লব নদী নদীসমূহ এবং ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদী। দক্ষিণে এটি বাকেরগঞ্জ থেকে একটি সাধারণ দ্বারা বিভক্ত রয়েছে; এই সীমানা অবশ্য বৃহৎ সুনির্দিষ্ট নয় এবং মেঘনার তীরবর্তী সিলিগুড়ির অস্তিত্ব করে এটি গঙ্গাভীরের মাছুমাখালি হয়ে এর পশ্চিমে সিলিগুড়ি, চাপড়া ও দুবাট গ্রাম অস্তিত্ব করে রসুলপুর পরগনার খোলালগাণের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এই সমস্ত অঞ্চলটি উর্বরা পলল ভূমির অন্তর্গত। এর স্থানসমূহ বর্ষাকালে দু'থেকে ত্রিশ ফুট পর্যন্ত পানির জলে প্রাণিত থাকে।

ভূমিরূপ

এই বিভাগের উত্তরাংশের পার্শ্ববর্তী এলাকা—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জাফরগঞ্জের সমতল উচ্চভূমি এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগ অপেক্ষা বেশ নিচু। বর্ষাকালের প্রায়ভাগেই এ সমস্ত জায়গা প্রাণিত হয়ে যায় এবং এটি প্রাণিত অবস্থা পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরিপূর্ণ বর্ষার সময়ে এ অঞ্চলের জলের গভীরতা আট থেকে ত্রিশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে, কিন্তু নদীর তীরবর্তী এলাকায় সচরাচর জলের গভীরতা দুই হাতের অধিক দেখা যায় না। নদীর তীর অভ্যন্তরীণ অঞ্চল অপেক্ষা উচু হওয়াতেই এই পার্শ্বকণ্ঠ পরিণত হয়। বর্ষার পানি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বকথিত জায়গাসমূহে নতুন ঘাটের স্বর পড়তে থাকে এবং এ ঘাট নদীর তীর থেকে অধিক দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রথমত ভাঙ্গী ও মোটা বালি ও কাপাণ্ড নদীর আশপাশেই জমা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সিলিকা জাতীয় বালুকণা ও পচা-পলা উদ্ভিজ্জসমূহ ভাসমান অবস্থায় দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেখানে প্রধানত ভূভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি করে। এভাবে পূর্বে ঢাকা থেকে শুরু করে পশ্চিমে ফরিদপুর পর্যন্ত ৪০ মাইল এবং দক্ষিণে বিক্রমপুর থেকে শুরু করে জাফরগঞ্জ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে নাটোর জেলা পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল বিস্তৃত—এই সমস্ত অঞ্চলই জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে জলমগ্ন হয়ে যায়। বছরের এই সময়ে এ অঞ্চল সবুজ ধানেকরা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে নৌকা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করে। অদূরে নদীতীরে সারিষক ও মনোরম বৃক্ষশ্রেণীর অবস্থান থেকেই নদীর গতিধারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে, সমতল ভূমির অভ্যন্তরভাগে কসবক অসংখ্য গ্রাম পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত গ্রাম বা বসতি—বাড়িঘর কৃত্রিম উপায়ে ঘাট কেনে উচু করা হয়েছে—যাতে সেগুলোর 'ভিটি' বন্যার পানির উপরিতাপের চাইতেও উর্ধ্বে থাকে। বর্ষাকালে উপসদৃশ এ সকল বসতি—এলাকা ছোট আকারে ২/৩ রাস্তা এবং তাদের গবাদিপশু রাখার মতো জায়গা, অথবা কয়েকটি গ্রাম ও বাগানবাড়িসমূহ জুড়ে বেশ বড় আকারেরও হয়ে থাকে।

উত্তরাঞ্চলের পলল ভূমি অধিক পরিমাণে অম্ল ও সিলিকার সমন্বিতভাবে গঠিত। বৃহৎপুত্র ও মেঘনার চরাঞ্চলের ভূমি কুলসামূলকভাবে গঙ্গার চরাঞ্চল অপেক্ষা উচ্চ ও কম বনভূমিবিধি

হয়ে থাকে। এই মাটিতে সিলিকা ও অস্ত্রের ভাগ অধিক এবং এঁটেল মাটির পরিমাণ কম থাকার দরুন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি গঙ্গা নদীর পানি অপেক্ষা এত বেশি স্বচ্ছ বলে মনে হয়। প্রধানত লৌহ আকরযুক্ত মাটিই উত্তরাঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য। জেলার এ অংশে চুনমিশ্রিত মাটির প্রাধান্য দেখা যায় এবং এর দ্বারা স্থান বিশেষ এবং বানার ও বংশী নদীর তলদেশ গঠিত হয়েছে। কোথাও তলদেশের চতুর্দিকে এ মাটি দেখা যায়, আবার কোথাও বা সাদা এবং কালো মাটির কিছু অভ্যন্তরেও এ মাটি পরিলক্ষিত হয়। আবার অন্যত্র বিভিন্ন পরিমাণ গভীরতাবিশিষ্ট মাটির বিভিন্ন স্তরেই বেশ কিছুটা গাঢ় এবং বিস্তৃত কালো উদ্ভিজ্জ আস্তরণ দেখা যায়। এ মৃত্তিকা অনেকটা পিট কয়লার মতো। দক্ষিণাঞ্চলের গভীর জলাভূমির তলদেশে পচা উদ্ভিজ্জমিশ্রিত সবুজ মাটির স্তর পরিলক্ষিত হয়। এগুলো শক্ত ও ঘনকৃষ্ণ বর্ণের হয়ে থাকে; এবং তা এত মসৃণ যে গ্রামের লোকদেরকে এ মাটি বিচূর্ণ করে লেখার কালি প্রস্তুত করতে দেখা যায়। ফরিদপুরের সন্নিকটে বৃহদাকার হ্রদের ধারে কূপ খনন করার সময় প্রায় ৩০ ফুট অভ্যন্তরে এমনটি দেখা গেছে। উত্তরভাগে সাদা, হলুদ ও নীল—এ তিন প্রকারের মৃত্তিকা দেখা যায়। ভূমির ১৫ ফুট অভ্যন্তর পর্যন্ত লাল কঁকর মাটি দ্বারা শহরাঞ্চল গঠিত; এর নিম্নভাগে ৫/৬ ফুট স্তরের হলুদে মাটি এবং এর পরে মসৃণ বালির স্তর পরিলক্ষিত হয়। নদীর গভীরতা ও পলল মৃত্তিকায় গঠিত উপরিস্তরের ঘনত্ব ভেদে ১৮ হতে ২২ ফুট গভীরে পানির সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলে কিছুসংখ্যক ঝর্ণা আছে। মধুপুরের শেষপ্রান্ত কঁকর অঞ্চলে, শহরের উত্তরে মির্জাপুরে এবং সম্ভবত বারমিয়া বা পলাশে এরূপ ঝর্ণা আছে।

নদনদীসমূহ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর শাখা-প্রশাখা দ্বারা এ জেলা বহুধাবিভক্ত। অসংখ্য নদীনালা অভ্যন্তরভাগে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। রেনেল সাহেবের ১৭৮০ সালের জরিপ অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, ঐ জেলার দক্ষিণাঞ্চলের কিছুসংখ্যক বৃহদাকারের নদী তাদের গতিপথের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। এর ফলে যে সমস্ত ছোটখাটো নদীনালা ও বিস্তৃত পলল ভূমির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভূমিভাগের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ, জেলার দক্ষিণাঞ্চলের স্থানবিশেষেও (রেনেল সাহেবের মানচিত্রে প্রদর্শিত) অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গঙ্গা বা পদ্মা এক জায়গায় জেলার পশ্চিম সীমা নির্দেশ করেছে এবং এ জেলার চড়ান-জলাভূমিও কেদারপুর নালার সংযোগস্থল থেকে শুরু করে দক্ষিণে মাছুয়াখালী পর্যন্ত এ অঞ্চল ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলা দুটিকে পৃথক করেছে। রেনেল সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী—গঙ্গানদী মেহেদীগঞ্জে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরিবর্তে, কার্যত ঐ স্থানের বেশ কিছুটা উত্তরে বর্তমানে এর বিপুল জলরাশি দুটি পৃথক নদীর জলধারায় প্রবাহিত। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে প্রথমোক্ত যে নদীকে কালিগঙ্গা নামে অভিহিত করা হয়েছে, বর্তমানে তা কীর্তিনাশা বা শ্রীপুর নদী নামে পরিচিত। কীর্তিনাশা মলফংগঞ্জ ও রাজনগরের অদূরে কিছুটা উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত। এটাই গঙ্গার প্রধান শাখা। এর প্রশস্ততা ৩/৪ মাইল। রাজনগর খালের মোহনা এবং এর অপর তীরে অবস্থিত শ্রীপুর সংলগ্ন অগ্রবর্তী তীরভূমি—এ দুয়ের মধ্যবর্তী সর্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত অংশে নদীর বেগ এত প্রবল যে, বর্ষাকালে সে স্থান দিয়ে ছোটখাটো নৌকা নিয়ে যাতায়াত করা বিপজ্জনক। কীর্তিনাশা কার্তিকপুরের উত্তরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং এর মধ্যবর্তী অঞ্চল (রেনেল সাহেবের মানচিত্রেদৃষ্টে জয়রামপুর, কৃষ্ণাপুর ও পোমোমরা দ্বীপসমূহ) বর্তমানে বালিশিয়া

নামে বিস্তৃত সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গার দ্বিতীয় বৃহৎ শাখাটির নাম নয়াভাঙ্গনী। এ নদীটি ঢাকা জেলার কোল ঘেঁষে বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মাছুয়াখালীর নিন্দ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ নদী সাদেকপুরের (জেলার সীমা নির্দেশক একটি গ্রাম) সামান্য দক্ষিণে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। প্রায় মাঝামাঝি গতিপথ থেকে এটি দুটি বৃহৎ জনধারায় প্রবাহিত হয়ে বিস্তৃত সমতলভূমি অতিক্রম করে দাদপুরের নিন্দেট পুনরায় মিলিত হয়ে লাইতু নদীতে মিশেছে। নয়াভাঙ্গনী নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় কীর্তিনাশর সমান। গঙ্গার মূল শাখা গৌদনদী থেকে বরিশাল স্টেশনের (রেনেলের মানচিত্রে যেভাবে এর গতিপথ প্রদর্শিত হয়েছে) সন্নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকিয়ে যায়, এবং এটি বহুলাংশে পলল ভূমির চড়া পড়ে বর্তমানে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। অবশ্য এর মাঝে মাঝে 'চতলা' বা অগতির জনমগ্ন স্থান দিয়ে এবং কিছুসংখ্যক খালনালা দিয়ে ছোট আকারের নৌকা যাতায়াত করে থাকে।

ব্রহ্মপুত্র : টোক নামক স্থান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ এ জেলার উত্তর-পশ্চিমের সীমা নির্দেশপূর্বক প্রবাহিত হয়ে—সিলেট সমভূমি হতে উৎপন্ন মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। বর্ষাকালে প্রস্থে এ নদী প্রায় দু'মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বছরের প্রায় চার মাস কাল এপার ওপার হেঁটে পার হওয়া যায় এবং স্থান বিশেষে প্রায় শুকিয়ে যায়। এই সময়ে ঝিনাই, বংশী ও বানার নদী দিয়ে এর অধিকাংশ জল প্রবাহিত হয়ে যায়।

মেঘনা : মেঘনা নদী (টেলেমির বর্ণনায় এর নাম মাস্তুর) ঢাকা এবং পূর্ব দিকে অবস্থিত ত্রিপুরা জেলার সীমা নির্দেশ করেছে। উত্তরে গারো ও কাছাড় পাহাড় থেকে অসংখ্য উপনদী এবং পূর্বে কাছাড় ও সিলেট হতে মনিপুরকে বিচ্ছিন্নকারী পাহাড়ী অঞ্চল থেকে নির্গত অসংখ্য জলস্রোতের সম্মিলিত প্রবাহে এ নদীর সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কিছু পূর্বে, এর বিস্তৃতি প্রায় এক মাইল এবং নদীটি এখানে বেশ গভীর। মেঘনা নদীর অববাহিকা অঞ্চল প্রায় ৬০০০ বর্গমাইল। যে বিপুল পরিমাণ জল এই সীমাবদ্ধ অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে তা সম্ভবত বঙ্গ-ভারতের যেকোনো নদীর চাইতে বেশি। ব্রহ্মপুত্রই এ জেলার অন্যান্য নদীর প্রধান উৎস।

ঝিনাই বা যমুনা : জামালপুর সেনানিবাসের অদূরে ব্রহ্মপুত্রের দুটি শাখা বের হয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়েছে এবং চৌদ্দ মাইল প্রবাহিত হয়ে দু'দুটি ধারা পুনরায় মিলিত হয়ে প্রশস্ত আকার ধারণপূর্বক ঝিনাই বা যমুনা নামে প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পরে এ নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি ভুবনেশ্বরী নামে জাকরগঞ্জ গঙ্গার সহিত মিলিত হয়েছে এবং বৃহত্তর শাখাটি কনাই ও লৌহজঙের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিত স্রোতধারা ধলেশ্বরী নামে প্রবাহিত হয়েছে।

ধলেশ্বরী : একদা ধলেশ্বরী গঙ্গা নদীরই শাখা হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি ঝিনাই নদীর জলধারায় পরিপুষ্ট। এ নদী পূর্ব দিকে গতি পরিবর্তন করে গৌরিখালি নালার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। রেনেলের বর্ণনায় এই নদীটিকে স্বল্প-পরিসর বলা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে এটি বর্ষাকালে প্রস্থে দু'মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বুড়িগঙ্গা : বুড়িগঙ্গা পূর্বে গঙ্গা নদীরই মূল ধারা ছিল। বর্তমানে এটি ধলেশ্বরীর শাখা বিশেষ। প্রায় ২৫ মাইল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এ নদী পুনরায় ধলেশ্বরীর সঙ্গেই নারায়ণগঞ্জের সামান্য উত্তরে মিলিত হয়েছে।

শহরের অবস্থান : ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান জল নির্গমন পথ। ঢাকা শহর শেষোক্ত নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখন তা অতীতের গঙ্গার পূর্বতীরের পরিবর্তে ব্রহ্মপুত্রের দুটি শাখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পড়ে গেছে।

বংশী নদী : এ জেলার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য নদী হচ্ছে বংশী, বানার, শীতলক্ষ্যা ও ইছামতী। জামালপুরের নিম্নে ব্রহ্মপুত্র হতে বংশী নদীর উৎপত্তি হয়েছে। কাকর মাটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আটিয়া বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এটি ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে সাভারের নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ জেলার মাঝারি ধরনের নদীসমূহের মধ্যে বংশীই সব চাইতে দীর্ঘ। উৎপত্তিস্থল হতে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এটি দৈর্ঘ্যে ১০০ মাইল।

বানার নদী : বানার নদী ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদীদ্বয়কে সংযুক্ত করেছে। উত্তরাঞ্চলের শক্ত কাকর মাটি এ নদীর গভীর তলদেশের সৃষ্টি করেছে। কোথাও কোথাও এ নদী ৫০ ফুটের চাইতেও অধিক গভীর।

শীতলক্ষ্যা : শীতলক্ষ্যা নদী, এর পানির স্বচ্ছতার জন্যে শীতল (রৌপ্যসদৃশ) লক্ষ্যা নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ দেশের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নদীর মধ্যে এটি অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থ সাগরদী হতে একডালা পর্যন্ত এই নদীর প্রাথমিক গতিপথ গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকিয়ে যায়, কিন্তু একডালাতে বানারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর থেকে নারায়ণগঞ্জের নিকট ইছামতীর সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত এ গতিপথটি সারা বছরব্যাপী নাব্য থাকে।

ইছামতী : ইছামতী গঙ্গার শাখা নদী। এটি গঙ্গা ও ধলেশ্বরীর মধ্যবর্তী নিম্নভূমি দিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পরে এটি (বর্তমান নাম ইলশামাধী) চড়ন খালের মোহনার বিপরীতে ইছামতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এবং ঐ সম্মিলিত স্রোত দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে একটির নাম তুলসী গঙ্গা। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে এটিকে একটি ছোট নদী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু, বর্তমানে এটি ইলশামাধীর প্রধান শাখা। অপর শাখাটি ইছামতী নাম ধারণ করে পাটেরগোটার নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী এবং শীতলক্ষ্যার সম্মিলিত স্রোতধারাকেও ইছামতী নামে অভিহিত করা হয়। এ নদী পাটেরগোটা হতে কয়েক মাইলের ব্যবধানে ফিরিঙ্গিবাড়ীতে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গ্রীষ্মকালে অমাবস্যা পূর্ণিমাতে এতে দুই থেকে চার ফুট পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা হয়ে থাকে এবং শহর থেকে বিশ মাইল পর্যন্ত এ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্যা নদীতেও একডালা পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়ে থাকে। গঙ্গার পানি বৃদ্ধির পূর্বেই মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়তে শুরু করে এবং জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে প্রায়শই পানির সর্বোচ্চ সীমার মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে চলে আসে। অপরদিকে, ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখায় মিলিত হওয়ার পূর্বে গঙ্গা নদীতে তখন ৩/৪ ফুটের অধিক পানি থাকে না। আসাম ও সিলেটের পাহাড়ের অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে সঞ্চিত জলরাশি অজস্রধারায় প্রবাহিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় নদীসমূহে এর ফলে দ্রুত জলশ্রীতি দেখা যায় এবং কখনো কখনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ঐ একই রকম গতিতে জল আবার নেমেও যায়।

জলবায়ু

মে-জুন মাসে দক্ষিণা বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বারিপাত না হলে এর পরের মাসের মাঝামাঝি অথবা শেষার্ধ্বে সাধারণত পূর্বাঞ্চলীয় নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়। শেষোক্ত মাসে মৌসুমী ঋতু শেষ হওয়ার সাথে সাথে বায়ুপ্রবাহের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। কখনোবা উত্তর দিক, কখনো বা পশ্চিম দিক আবার কখনোবা পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক

থেকে বায়ুপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। এ মাসের শেষের দিকে মাঝে মাঝে দক্ষিণ বা পূর্ব দিক থেকে অবল বায়ুপ্রবাহ অবলা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। সবচেয়ে আবহাওয়া অনিশ্চয়ক সবচেয়ে নিশ্চিত এ দু'ধরনের আবহাওয়া যৌসূরি বায়ুপ্রবাহ কালেই অনুভূত হয়। এ বায়ু প্রবাহিত হয় পূর্বদিক থেকে।

এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসে সাধারণত দিনের প্রথমার্ধে এবং বাকিভাগে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ুপ্রবাহ নদীনালায় উপর দিগে অতিক্রম করার জন্য এতে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংযুক্ত থাকে; ফলে বছরের এ সময়ে উত্তম আক্ৰমণে প্রবাহিত হয় এবং অন্যান্য ঝড়ুর তুলনায় তা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও মনোরম থাকে। পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত বায়ু প্রভাবে এ সময়ে বৃষ্টিপাত তত হয় না। যদি ঝড়ো হাওয়াও বয়ে যায় তবে তাও প্রায়শঃ একই দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং তা উত্তর-পূর্ব দিকে দিক পরিবর্তন করে নিকটবর্তী পাহাড়ে বাধাগ্রস্ত হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে আসত বায়ুর প্রভাবেই সাধারণত এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এ বায়ু কমাটিলে ঝড়ো হয়ে থাকে।

নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বায়ু উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। প্রথমত এ বায়ু পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হয়, এবং পরে ক্রীতক বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে এর গতি পরিবর্তন করে কিছুদিন যাবৎ উত্তর দিক হতে বইতে থাকে। এরপর গতি পরিবর্তিত হয়ে কখনো বা উত্তর-পশ্চিম আবার কখনো দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এ বায়ু প্রবাহিত হতে দেখা যায়। নিম্নের তালিকার বিগত ১১ বছরের বায়ুপ্রবাহের অবস্থা সন্নিবেশিত হল।

কেন্দ্রমারি মাসের শেষার্ধে সাধারণত বারিপাতসহ কমাটিলেবলকীর কড় কড় হয়ে থাকে এবং এর পরের দু'দিন দিন পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে বায়ুপ্রবাহ জের ধরে।

সুবৃহৎ নদীসমূহ ও অসংখ্য বিস্তীর্ণ জলাশয়ের উপর দিগে প্রবাহিত জলকণাসম্পূর্ণ বায়ু উত্তম আবহাওয়াতে বহুল পরিমাণে প্রস্রাবিত করে এবং ফলে বছরের পশ্চিমারম্ভে অশ্রুতা এখানকার আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

বিগত দশ বছরের সর্বোচ্চ ১ মাসের গড়পড়তা উত্তম নিম্নতম দিন :

এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
৮৫.৩৮	৮৭.৩৯	৮৬.১৬	৮৬.১৮	৮৫.৫৬	৮৮.৩৬	৮৩.৭৫	৭৬.৭৬	৭২.২৫

প্রতি বছরের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রতি ঘণ্টা হিসেবে গড় বছর পর্যন্ত সেই তারিখের দৈনিক গড়পড়তা তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়েছে ৩.৪৪ এবং বিগত দশ বছর ১৫ই জানুয়ারির প্রাত্যহিক গড়পড়তা উত্তম দিন ১৫.৪৩।

নিম্নের তালিকা থেকে সিংহভাগের ৫টি বিভিন্ন সময়ের ঐ বছরজন্মের গড়পড়তা উত্তম পাওয়া যায়।

বছর	সূর্যোদয়	বেলা ১০ ঘটিকার	দুপুরে	বেলা ৩ ঘটিকার	নিকটতম
১৮৩২	৭০.৯	৭৫.৭	৭৮.৪	৭৯.২	৭৮.২
১৮৩৩	৭০.১	৭৬.২	৮০.২	৮১.৬	৮০.৬
১৮৩৪	৭০.২	৭৭.৪	৮০.৬	৮১.২	৭৯.১
১৮৩৫	৭০.০০	৭৬.৩	৭৯.১	৮০.৮	৭৯.০
১৮৩৬	৬৯.৭	৭৬.২	৭৮.৬	৮২.১	৭৯.৭

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসেই বছরের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বাতাস সাধারণত হালকা ও গতিপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। বায়ু তখন বেশ আর্দ্র থাকে ও বাষ্পীভবন কার্য অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। উত্তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা প্রকার অসুখ-বিসুখ দেখা যায়। শীত ঋতুতে রাত্রিকাল সাধারণত নিশ্চল এবং অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। কখনো কখনো আকাশ উন্মুক্ত ও শুষ্ক থাকে এবং এ সময় রজনীতে স্বল্পগভীর 'চিতান' পাত্রে রক্ষিত পানি জমে বরফ হতেও দেখা যায়। মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে অধিক মাত্রায় বাষ্পীভবন হতে থাকে এবং এ সময়ে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহও এই কাজে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। থার্মোমিটারে কয়েক বছরের শুষ্কতা ও আর্দ্রতার সর্বোচ্চ গড়পড়তা পার্থক্য দেখা যায় ২১। বায়ুর আর্দ্রতাই বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরই প্রভাবে দেশের এই অংশে ঘন বনাঞ্চল ও উদ্ভিদরাজি শোভা বিস্তার করেছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে এখানে কুয়াশা সৃষ্টি ও শিশির পড়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফেব্রুয়ারি মাসে কালবৈশাখীর সূচনা হয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কমবেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ১৮২৭ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের গড়পড়তা বৃষ্টিপাত নিম্নরূপ ছিল :

মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর
৩.৬	৭	৯.৬	১২	৯	১২.৫	১০.৮	৬.৮

এ সময়ের বার্ষিক সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ছিল যথাক্রমে ৯৩.৯ ইঞ্চি, ৪৬.৮ ইঞ্চি ও ৭০.৩ ইঞ্চি।

মার্চ মাস থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়া অবধি ঘন ঘন বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে তা প্রচণ্ড হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড় এ ঋতুতেই পরিলক্ষিত হয়। শিলাবৃষ্টি সময়ে সময়ে ফসলের সমূহ ক্ষতিসাধন করে থাকে ; বিশেষ করে আউস ধান ও 'স্যাফ্রন্' (জাফরান) গাছের ক্ষতির কারণ হয়। জলবায়ু প্রসঙ্গে ভূমিকম্পের বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে সাধারণত ভূ-কম্পন মৃদু আকারের হয়ে থাকে। কখনো কখনো তা প্রবলভাবে অনুভূত হয় এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ১৭৬২ সালের এপ্রিল মাসে এ অঞ্চলে যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল, তাতে মেঘনার পূর্বতীর ধরে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। ঢাকা জেলাতে নদীনালা ও বিলঝিল প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে এগুলোর জলরাশি স্ফীত হয়ে যায়। পানি সরে গেলে সেই সকল উচ্চভূমিতে অনেক মরা মাছ এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিম্নভাগের ভূমিস্তর থেকে একটা তীব্র আওয়াজসহ ভূ-কম্পন এত প্রবল হয় যে বেশ কিছুসংখ্যক বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধসে যায় এবং এর ফলে প্রায় ৫০০ লোক প্রাণ হারায়। নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের ১৫ মাইল এলাকা জুড়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমস্ত লোকজন ও গবাদিপশুসহ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়।^১ ১৭৭৫ এবং ১৮২২ সালেও প্রবল ভূমিকম্প হয়। শেষোক্ত সালের ১০ই এপ্রিল ও ১১ই মে শহরের ও তেজগাঁওয়ের^২ বেশ কিছুসংখ্যক সরকারি দালানকোঠা ও অন্যান্য বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১. East Indian Chronologist দ্রষ্টব্য।

২. জেলার নথিপত্র (রেকর্ডস)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[জীবজন্তু—উদ্ভিদ—খনিজদ্রব্য]

জীবজন্তু

কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে দেশের এই অংশের জীবজন্তু গাছের বন্ধীপের অপরাপর অংশের অনুরূপ। এই জেলার দুই অংশের প্রাকৃতিক গঠনে যেমন বিরাট পার্থক্য বর্তমানে তেমনি জীবজন্তুর বৈচিত্র্যও সুস্পষ্ট। উত্তরাংশে সাধারণত শিকারি প্রাণী এবং বিভিন্ন প্রকারের চতুষ্পদ প্রাণী বাস করে। দক্ষিণাংশে সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম। এখানে জনচর পাখি, সরীসৃপ আর বিভিন্ন প্রকার মাছের প্রাধান্য। দুগ্ধপায়ী (Mammalia) শ্রেণীতে নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলোর উল্লেখ করা চলে : সিমিয়া সারকোপাইথিকাস (Simia cercopithecus) জাতীয় বানর সাধারণত শহরের আশপাশে ঘুরে বেড়ায় আর ফলের বগল খসে করে। গণ কেইরোপটেরার (Cheiroptera) অন্তর্গত চারটি প্রজাতি দেখা যায় : এগুলো হচ্ছে (১) হার্ডউইকের ডাইসোপিজ মুরিনাস (Dysopes murinus) বা সাধারণত বাদুড়। চালাঘরের ছাউনীতে এরা বাস করে। (২) টেরোপাস রাউসেটি (Pteropus roussette) বা উড়ন্ত শেয়াল (Flying fox) : ভাট, পিপুল আর তেঁতুল গাছের ছায়াতলা শাখা-প্রশাখা হচ্ছে এদের প্রিয় বাসস্থান। গোধূলিলগ্নে এরা খাদ্য সংগ্রহে বেরোয় এবং কলা ও অন্যান্য ফলের গাছে ঘুরে বেড়ায়; এদের ধ্বংসযজ্ঞ বানরের চেয়ে কম নয়। (৩) ম্যাগাডারমা (Magaderma) : এই বাদুড় অন্যান্য প্রজাতির বাদুড় থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এদের সম্প্রসারিত বহিঃকর্ণদ্বয় ঠিক মাথার উপরিভাগে সংযুক্ত থাকে। এ ছাড়াও এদের নাসা-অস্থির ওপরে পাতা আকৃতির পাতলা পর্দা থাকে। এদের লেজ নেই। উপরের রং ইঁদুরের রঙের মতো আর নিচের গাত্রবর্ণে থাকে একটা হালকা আভা। অন্যান্য বাদুড়ের মতো এদের স্তন বক্ষ-ফলকের কাছে অবস্থিত নয়, বরং রিনোলফি (Rhinolphi) গোত্রের মতো বক্ষস্থলের মধ্যভাগে অবস্থিত স্তনবৃন্ত সাধারণত বক্ষস্থলের উপরে দেখা যায়। ম্যাগাডারমা সাধারণত শহরের আশপাশে পরিত্যক্ত মন্দিরে আর জঙ্গলে শুকনো গর্তে বাসা বাঁধে। (৪) ভেসপারটিলিও পেকটাস (Vespertilio pectus) বা পিনাটের ডোরাকাটা বাদুড় (striped bat of Pinnat) : রমণীয় এই ক্ষুদ্রে বাদুড়গুলো জঙ্গলের অভ্যন্তরভাগে সচরাচর দেখা যায়। জঙ্গলে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে এই ছোট প্রাণীগুলো উড়ে বেড়ায়। দূর

থেকে এগুলোকে প্রজাপতি বলে ভ্রম হতে পারে। মনোরম কমলা রঙের পশমে এদের অতি চমৎকার দেখায়। এই বাদুড়ের আরেক নাম কমলা-বাদুড়। ডানাগুলো কালো রঙের, কালোর ওপর থাকে হলদে রঙের ডোরা। মণিবন্ধ থেকে এই ডোরাগুলো শুরু হয়ে ক্রমে হালকা হয়ে আঙুলের পাশ দিয়ে ছোট ছোট ফোঁটার আকারে সংযুক্ত পর্দায় ছড়িয়ে পড়ে। এ অঞ্চলে কস্তুরী ইঁদুর বা ধূর্ত সোরেক্স ইন্ডিকাস (*Sorex indicus*) বেজী, গন্ধ গোবুল (খাটোশ) (*Viverra bengalensis*) প্রভৃতি প্রাণী সচরাচর দেখা যায়।

উত্তরাংশের জঙ্গল বাঘ এবং চিতাবাঘ অধ্যুষিত। বন্যা আর অনাবৃষ্টির সময় এরা গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে গৃহপালিত পশুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এদের ধ্বংস করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হত। মোগল আমলে বাঘ শিকারের জন্য জায়গীর বরাদ্দ করা হত। এদের পীড়াপীড়ির ফলে ১৭৭১ সালে সরকার পুনরায় এ ব্যাপারে অনুমোদন দান করেন এবং জমিদারদেরকে লোক সরবরাহের নির্দেশ দেন। ১৮০৪ সালে সরকারি পুরস্কারের জন্য মোট ২৭০টি বাঘের চামড়া শহরে আনা হয়েছিল। কিন্তু পুরস্কারের জন্য ধার্য অঙ্ক থেকে পাঁচ টাকা কমানোর ফলে এই সংখ্যা নেমে গিয়ে বছরে গড়ে ৩৫টিতে দাঁড়িয়েছিল। আর বিগত তের বছরে সামগ্রিকভাবে অনধিক একশত বার জন পুরস্কার গ্রহণ করেছে। এই অঞ্চলের শিকারিগণ বাঘ শিকারে সাধারণত বিষ মাখানো তীর ব্যবহার করত। উইলিয়ামসের ফিল্ড স্পোর্টস অব ইন্ডিয়া (*Field Sports of India*) বই থেকে জানা যায় যে, বন্য শূয়োরের সংখ্যাও বড় কম ছিল না, আর অন্যান্য পশুর তুলনায় সম্ভবত তারাই ফসলের সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করত। উত্তরাংশের জঙ্গল, বিশেষ করে আটিয়ার পরগনা ছিল হাতির বাসভূমি। এই বিরাটকায় জীবগুলো প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে গাছপালা ও ফসলের প্রচুর ক্ষতিসাধন করত। হাতিগুলো এ অঞ্চলেরই আদি বাসিন্দা, কিন্তু অনেক সময় পোষা হাতিও জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে এদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। কাশিম আলীর শাসনকালে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে শৈথিল্য আসে, অনেকেই কাশিমপুর এবং ভাওয়াল পরগনা ছেড়ে চলে যান। ১৭৯১ সালে সরকারি ব্যয়ে কাশিমপুরে একটি খেদা তৈরি হয় এবং ২১টি হাতি ধরা হয়। সরকারি হিসাবে জানা যায়, একমাত্র চট্টগ্রাম থেকেই বছরে ৮০টি হাতি ধরা হত আর সেখান থেকে সেগুলো কাশিমপুর ডিপোতে আনা হত। গড়ে প্রায় ২০০টি হাতি এই কেন্দ্রে জমা হত। ছোট ছোট বাচ্চাসহ স্ত্রী হাতি সাধারণত ধরা পড়ত। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কয়েক বছর পূর্বে একটি মৃত গর্ভবতী হাতির জরায়ু নিরীক্ষণের সুযোগ আমার হয়েছিল। হাতির জরায়ু দ্বিকক্ষবিশিষ্ট (*double*), প্রতিটি কক্ষে একটি করে কর্নু থাকে, কর্নুর মুখে ফেলোপিয়ান টিউব (*fallopian tube*) লাগানো থাকে। এর ডিম্ব অনেকটা আয়তাকার আর অমরা দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত। অমরা (*placenta*) দেখতে অনেকটা বেন্টের ন্যায়, যা ডিম্বকে আটকে রাখে। প্লাসেন্টা, জ্রণপর্দা আর অন্যান্য পর্দার গঠনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেসবের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। ধড়ের তুলনায় জ্রণের মাথা কিছুটা পেছনের দিকে হেলানো থাকে। জ্রণের অংশসমূহ, বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের অরিকল দুটির মধ্যবর্তী ফোরামেন ওবেলি (*forame ovale*) আর থাইমাস গ্রন্থি পূর্ণ বিকশিত ছিল। থাইমাস গ্রন্থি ত্রিভুজাকৃতির, সামনের মেডিসাস্টিনাম (*anterior mediastinum*) সম্পূর্ণরূপে এর দ্বারা অধিকৃত। সাদা তরলে পূর্ণ অসংখ্য কোষ সমন্বয়ে এই গ্রন্থি গঠিত। জরায়ু আর অমরার (*placenta*) ওজন ছিল প্রায় ১৩৬ পাউন্ড; জ্রণের ওজন ছিল ২২ পাউন্ডের মতো, কাজেই গর্ভবতী জরায়ুর সর্বমোট ওজন ছিল ৩৪৮ পাউন্ড।

হরিণ

উত্তরাংশের জঙ্গলে হরিণের চারটি প্রজাতি সচরাচর দেখা যায়। এগুলি হল : গুসু হরিণ (Gous deer), সারভাস হিপপেল্যাপাস (Cervus hippelaphus), সম্বু (Sambu), সারভাস এরিসটোটেলিস (Cervus aristotelis) অথবা হরিণ হরিণ (Black Russa of Bengali), চোরাযুক্ত হরিণ, সারভাস এককর্ণ (Cervus axis) এবং গোলাব সারভাস মুন্ডজ্যাক (Cervus Muntjack)। শেষোক্ত প্রজাতিটি গোলাব বৃক্ক কম দেখা যায়, এর কণ্ঠস্বর অনেকটা কুকুরের মতো। তাই স্থানীয় শিকারীদের কাছে হরিণ (Barking Deer) নামেই এরা সমধিক পরিচিত। এদের উপরে চোয়ালের কান্দুর (Canine teeth) অনেকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে, আর মাথার উপরে ঠোঁটের মতো কঠকঠোঁট উপস্থিত থাকে; এই উপাদানের উপরই শিয়ের অবস্থান। এই ঠোঁটের নাম কটুটি যুদ্ধের সাথে প্রায় একই লাইনে অবস্থান করে। আর এর উপরে দুটো আলিতে বিভক্ত হয়ে যায়, লম্বাট আর নাসা অস্থির কাছাকাছি অংশে তারা সংযুক্ত হয়। শিং কুচিং তিন ইঞ্চির বেশি নয় হয়, দুই আলি মাঝখানে কপালের ওপর চামড়ার দুটি ঝাঁজ থাকে। এই চামড়ার ঝাঁজে কটুরী জাতীয় সূক্ষ্ম দ্রব্য থাকে; কটুরীর জন্য নেপালের মুন্ডজ্যাক কটুরী-মৃগ নামেই সমধিক পরিচিত। গাছতলায় পড়ে থাকা আমলকী, আম ও পেয়ারা প্রভৃতি ফলই এদের খাদ্য। এ ছাড়া দীর্ঘ দাঁত দিয়ে এরা ছোট ছোট শেকড় ভুলে খায় বলেও জানা গেছে। উত্তরাংশের হরিণ সবে আর ভিলের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। তাওয়াল জঙ্গলের কৃষকগণ কুকুরকে হরিণ শিকারের তালিম দেয়। হরিণ শিকারের জন্য জমিদারগণ সাধারণত বড় বড় জালের কাঁচ ব্যবহার করেন। হরিণ শিকারের একটা চমকপ্রদ পদ্ধতি এখানে প্রচলিত আছে। এই শিকারে ঝাঁক ও মাদুর দিয়ে তৈরি একটা ঝুড়ি বা ডালা ব্যবহৃত হয় বলে এ ধরনের শিকারীদের নাম 'ডালা শিকারি'। ঝুড়ির প্রস্থচ্ছেদ ৪ ফুটের মতো। খুব হাল্কা করে তৈরি হয় এটা। ঝুড়িটিতে কাদামাটির প্রলেপ দেওয়া থাকে, মাঝখানে থাকে মশাল রাখার জন্য ছোট একটু জায়গা। মশাল স্থাপন করে ঝুড়িটি হ্যাটের মতো মাথার দিগে শিকারি জঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, তার হাতের ঘণ্টা অবিরাম ঝংকার তুলতে থাকে; ঝুড়ির ছায়ার অন্তরালে দু-তিন জন অস্ত্রসজ্জিত লোক তাকে অনুসরণ করে। ঘণ্টাঝনি আর মশালের চোখ কলস্যাগ্নে আলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে হরিণ ক্রমেই শিকারীদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং বিমোহিত হয়ে একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কলে অতি সহজেই শিকারীদের নালান্দে এসে যায়। ডালা শিকারিরা বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মস্তুরা ও অনুষ্ঠানবস্ত্র পরিধান করে থাকে। জলাভূমির আশপাশে বন্য-মহিষ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, পেয়ারা আর খেঁকশেয়ার শহরের আশপাশের জঙ্গলে দেখা যায়। বেংগাল পূর্বাংশে খরগোশ পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু খরগোশ, কালো খরগোশ বা শশক (নেপাল হিপপেল্যাপাস অথবা পিয়ারসন, (Lepus hispidus of Pearson), ব্যতিক্রম ইন্দুর, শশক প্রভৃতি এই জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কালো খরগোশ বা শশক আর হার্ট উইকের নেপাল সাইমেন্সিস (Lepus sinensis)-এর মধ্যে মিল বিশেষ লক্ষণীয়। উত্তরাংশে প্রচুর কালো খরগোশ পাওয়া যায়। স্থানীয় এবং ইউরোপীয় শিকারিরা প্রায়ই খরগোশ শিকার করে। স্থানীয় অধিবাসীগণ খরগোশের মাংস খায়, কিন্তু কালো শশককে তারা অতি মনে করে। ব্যতিক্রম ইন্দুর বাসের বিশেষ ক্ষতি করে। তারা কেউকে খাস দিগে মাটির নিচে তাদের কুঠুরিতে সন্ধ্যা করে এবং এই সব কুঠুরী সাথে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাটি খুঁড়ে গল তৈরি করে।

গরিব গ্রামবাসীগণ প্রায়ই এই সব ইঁদুরের বাসার সন্ধান করে, আর এক একটা বাসা থেকে অনেক সময় ১ মন থেকে ২ মন ধান পেয়ে থাকে। শজারু হিস্টিক্স ক্রিস্টাটার (*Histix cristata*) বাসভূমি হল বাগান আর গ্রামের আশপাশের উঁচু ঢিবি। বাঙিকুট ইঁদুরের মতো এরাও মাটি খুঁড়ে বাসা বাঁধে আর আখ, লাউ, কুমড়া, কচু প্রভৃতি নষ্ট করে। এরা বাঁশ গাছের শেকড়ও নষ্ট করে ফেলে। গর্তের মুখে খড়ের ধোঁয়া দিয়ে শজারুকে তার আশ্রয় থেকে তাড়ানো হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকেরা শজারুর মাংস ভোজন করে থাকে। শজারুর কাঁটা অনেক প্রকার কাজে ব্যবহৃত হয়। চিরুনি ও গহনাপত্র তৈরির কাজে আর কান ফোঁড়ানোর জন্যও এই কাঁটা ব্যবহার করা হয়। ভালুক উরসুজ নাইজার (*Ursus niger*) উত্তরাংশের উঁচু পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস করে। ভোঁদড় বা উদ্‌বিড়াল (*Otter*), লুটরা ভালথ্রেইজ (*Lutra vulgrais*) দেশের নদীগুলোতে বাস করে। এদের পার্থক্য গাত্র বর্ণ নিয়ে—কোনোটা হাল্কা বা ধূসর বর্ণের, কোনোটা বা গাঢ় খয়েরি রঙের। ভোঁদড় সব কটি নদীতেই দেখা যায়, তবে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ আর সিলেটের নদীগুলোতে এদের সংখ্যা একটু বেশি। নদীতীরে সাধারণত জল থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে ভোঁদড় তার আশ্রয় তৈরি করে, আর এক একটি আশ্রয়ে একসাথে প্রায় ১২-১৫টি ভোঁদড় বাস করে। চামড়ার জন্য প্রতিবছর বহুসংখ্যক ভোঁদড় হত্যা করা হয়। এই চামড়া ভুটান এবং চীন দেশে রপ্তানি করা হয়। ভোঁদড়কে গর্ত থেকে বাইরে নিয়ে আসার জন্য অন্য একটা শিক্ষিত পোষা ভোঁদড়কে কাজে লাগানো হয়। এভাবে তাকে গর্তের বাইরে এনে গারুড়ীরা বল্লম দিয়ে এগুলোকে হত্যা করে। হাল্কা রঙের ভোঁদড়কে জেলেরা মাছ তাড়িয়ে জালের মধ্যে নিয়ে আসার কাজেও তালিম দেয়। দেশের নদীগুলো শুশুক বা প্লাটামিস্টা গানজেটিকা (*Platamista gangetica*) অধ্যুষিত। গারুড়ীগণ শীতকালে শুশুক শিকারে লিপ্ত হয়। ভোঁদড় আর শুশুক শিকারই এদের প্রধান পেশা। তারা শুশুকের মাংস ভোজন করে আর এর তেল জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে অথবা গ্রাম্য ডাক্তারদের কাছে বিক্রি করে দেয়। শুশুকের তেল বাত-রোগের অসুধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন পাখি

পাখির মধ্যে বহুসংখ্যক প্রজাতি এই অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও শকুন, কাক, চিল আর ঈগলের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। স্ট্রিক্স ক্যানডিডাস (*Strix candidus*) আর স্ট্রিক্স নোকচুয়া ইন্ডিকা (*Strix noctua indica*) এই দুটি হল এই অঞ্চলে পঁচার সবচেয়ে সাধারণ প্রজাতি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এখানকার অধিবাসীরাও এই পাখিগুলোকে ভীতির চোখে দেখে, এদের বাসার সন্নিহিতে উপস্থিত হওয়ার অর্থই হল সমূহ অমঙ্গলের আশঙ্কা। প্যাসারিন (*Passarine*) বা ইনসিজুরিয়াল শ্রেণীর প্রজাতিগুলোর মধ্যে মাছরাঙা বা আলসেডো (*Alcedo*) হল সবচেয়ে সাধারণ। দোয়েল পাখিও এই শ্রেণীরই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রজাতির দুটি রকম হচ্ছে নীল এবং লাল রঙের মাছরাঙা। এ দুটিই তাদের চামড়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শীতকালে মগ উপজাতীয়গণ এই অঞ্চল এবং বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলায় এই পাখি শিকারে লিপ্ত হয়। পাখিগুলোকে ফাঁদে ফেলার জন্য খাঁচায় করে একটা পোষা মাছরাঙা তারা সাথে রাখে। এর দেহ রোদে শুকিয়ে নানা প্রকার ধারক পদার্থের সাহায্যে তারা রপ্তানিযোগ্য চামড়া প্রস্তুত করে এবং প্রচুর পরিমাণে তা চীন দেশে প্রেরণ

טז

বাসিন্দা। যেখানে শাপলা গাছ প্রচুর জন্মে সেখানেই এরা বাসা করে। শাপলা পাতায় অসংখ্য কীট জন্মে আর এই কীটগুলোই হচ্ছে জেকানার অতি প্রিয় খাদ্য। লম্বা ধানের ডাঁটা বাঁকিয়ে ছোট পাকিয়ে শাপলা-পাতার ওপর এরা বাসা তৈরি করে। পরফাইরিস সুলতানা (*Porphyris sultana*) বা বেগুনি গেলিনুলও (*Gallinule*) জলাভূমির বাসিন্দা। এদের সংখ্যা খুব বেশি, আর এরা ফসলের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। জঙ্গলের মধ্যে কোনো খাদের কাছে মাটি খুঁড়ে তারা বাসা তৈরি করে। কোনো একটা কলিম পাখি (এ পাখির স্থানীয় নাম) মারা গেলে বা আহত হলে দলপতি মৃতদেহটি কোনো আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দেয়। কলিমের ডিম দেখতে মুরগির ডিমের মতো। এক রকম গেলিনুল কোড়া নামে পরিচিত; কপালে লালরঙের পর্দা আর হলদে ঠোঁট এদের বিশেষত্ব। মুসলমানরা কোড়াকে যুদ্ধ শিক্ষা দেয়। একটা ভাল শিকারি কোড়া ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হয়। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে এই পাখির ডাক খুব অদ্ভুত। গলা ফুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গভীর ফাঁপা শব্দ উৎপন্ন করে, এর পরেই আমেরিকার ট্রামপিটার পাখির মতো হঠাৎ তীব্র কাঁপুনিবিশিষ্ট শব্দে সবাইকে সচকিত করে তোলে। কোড়ার স্বরযন্ত্র কেটে পরীক্ষা না করলেও এর গঠন যে অনেকটা ট্রামপিটার পাখির মতোই তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই অঞ্চলে নিম্নোক্ত পাখিগুলো সচরাচর দেখা যায় : ফুলিকা ক্রিস্টাটা (*Fulica cristata*) বা ঝুঁটিধারী কুট, ক্যারাদ্রাস বেনট্রালিস (*Charadrus ventralis*) বা টিট্রিভ পাখি (*Spur-winged plover*) এবং কাদা খোঁচা (*Scolopax gallinago*)। কুকুট জাতীয় পাখির মধ্যে রয়েছে ফ্লোরিকান ওটিস হনথুরা (*Floricorn otis honthoura*) ময়ূর, চকোর বা তিত্ পাখি, কোয়েল, কোটারনিক্স (*Coturnix*) এর তিনটা প্রজাতি আর বন কবুতর।

লিগুপাদ (*Palmipedies*) পাখিদের মধ্যে রিন্কপ্স নাইগ্রা (*Ryncops nigra*) বা কাঁচি-চঞ্চু অতি পরিচিত পাখিগুলোর একটি; প্রতিটি বড় নদীতে একে দেখা যাবে ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য তীক্ষ্ণ চঞ্চুর সাহায্যে জলে স্কিমিং করছে। পানি মোরগের মতো কাঁচি-চঞ্চু পাখি বালুচরেই ডিম পাড়ে।

পেলিকানাস অনোক্রাটুলাস (*Pelicanus onocrotulus*) বা পেলিকানকে অধিকাংশ জলাভূমিতেই দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার মাছ, যেমন—কই, খলসে প্রভৃতি ধরার জন্য ফাঁদ হিসেবে এই পাখিটি ব্যবহার করা হয়। এদের চামড়ায় এক প্রকার তেল জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই তেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রকার মাছ এর অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই উদ্দেশ্যে কৃষকগণ বর্ষার আগমনে পেলিকান পাখি ধরে আর শীতকালে এদের মুক্ত করে দেয়। ফাঁদ হিসেবে পাখিগুলোকে নৌকার সাথে বেঁধে রাখা হয়। মাঝে মাঝে মাছ ধরার মৌসুমে কৃষকগণ নিষ্ঠুরভাবে সেলাই দিয়ে এদের চোখ বন্ধ করে রাখে। জলাভূমিগুলোতে প্রায়ই পেলিকানের আর একটা প্রজাতি দেখা যায়। এই প্রজাতিটি সিরিস (*siris*) এবং অন্যান্য বকের সাথে দেশান্তরী হয়ে আসে। এর রং ধবধবে সাদা, তবে বুকের ও পাখার নিচের পালক আর অক্ষিগোলক পাটলবর্ণের। এদের চামড়া থেকে তেল নিঃসৃত হয় না। এই সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট স্পুনবিল বা চামচে ঠোঁটার মতো একেও ‘রোজিয়েট’ (*Roseate*) বা ‘লোহিত’ নামে শনাক্ত করা চলে। প্লটাস ভেলেনটি বা বর্শাধারী (*Darter*) যুক্তপাদ পাখিকে প্রায়ই নদীতীরে ঝুলন্ত বৃক্ষশাখা অথবা জেলেদের বাঁশের মাচানে শিকারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখা যায়। এ্যানাটিডি বর্গের (*Anatidae*) সবচেয়ে সাধারণ প্রজাতিগুলো হচ্ছে : এ্যানাস ইন্ডিকা (*Anas indica*) বা ডোরা মাথার হাঁস, এ্যানাস ক্লাইপিয়াটা (*Anas clypeata*) বা (*Shoveller*), এ্যানাস ক্রিকা (*Anas crecca*) বা

সরীসৃপ

পাখির তুলনায় সরীসৃপের প্রকারভেদ অপেক্ষাকৃত কম। কিলোনিয়ান (Chelonian) বর্গের কচ্ছপের মধ্যে এমিস হামিলটনি (Amys hamiltoni) বিশেষ সুপরিচিত। এর খোলস আয়তাকার, শক্ত ও ধূসর; পাগুলো হলদে দাগবিশিষ্ট। ট্রাইনিঙ্গসের চারটি প্রজাতি দেখা যায়। এদের মধ্যে ট্রাইনিঙ্গ গেনজেটিকাস (T. gangeticus)-এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর শক্ত আবরণের চারপাশে নমনীয় কোমলাস্থি থাকে; এর লিঙ্গপদ ধূসর বর্ণের এবং মাথা জলপাই আকৃতির (Olivaceous)। এই কচ্ছপগুলো অতিশয় পেটুক; এরা নদীতে নিষ্কিণ্ত জীবজন্তুর মৃতদেহ ভোজন করে। অন্য যে সব প্রজাতি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে ট্রাইনিঙ্গ সাবপ্লানাস (Trinix subplanus) বা প্রশস্ত নরম জাতের কচ্ছপ। ট্রাইনিক্স প্যাংটেটাস (T. punctatus) এটিও নরম কচ্ছপ। এর মাথায় সাদা ডোরাকাটা থাকে। ট্রাইনিঙ্গ ইন্ডিকাস (Trinix indicus) এই কচ্ছপের রং সবুজ তবে এর গায়ে বিক্ষিপ্ত সাদা সাদা ডোরা থাকে। জেলেরা বাজারে কচ্ছপ বিক্রি করে। হিন্দু অধিবাসীগণ কচ্ছপের মাংস খায়। সুরিয়ান রেপটাইলদের (Surian reptiles) মধ্যে নদীতে অসংখ্য কুমির আর বিশেষ করে বড় বড় ঘড়িয়াল (Garial) বাস করে। স্টেলিও গেকো (Stellio gecko) বা সান্ডা, লোফিড্রাস এগামিডিস (Lophyrus agamoides) বা গিরগিটি, লেসারটা স্কিন্‌কাস (Lacerta scincus) বা ভেমানি সেম্প (Bhamanee samp), সাধারণ মনিটর পালচের (Mointor palcher) প্রভৃতি প্রাণী বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জঙ্গলে পাওয়া যায়। সান্ডা বা গেকো ক্ষীতদেহী, চোখ বড়, বিক্ষি (tubercles) লালচে গোলাকার এবং বিক্ষিপ্তভাবে সান্ডার মাঝে ছড়ানো। পায়ের আঙুলের নিচে চামড়ায় আড়াআড়ি ভাঁজ আছে, যা তলকে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে। এই প্রাণীর গলায় দুটি ছোট থলে আছে। থলে দুটিতে খড়ি-গোলা পানির মতো সাদা তরল পদার্থ থাকে। একটা প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদ করার সময় এর খানিকটা আমার হাতে লেগে যায় এবং পরিণামে একটা ছোট ফোঁসকা দেখা দেয়; সেইসাথে সমস্ত বাহ্যতে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি হয়।

সর্পবর্গের অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলো সচরাচর দেখা যায়। অনেক পাইথন টাইগ্রিস শহরের আনাচে-কানাচে জঙ্গলে বাস করে। এই সাপ লম্বায় প্রায় বিশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ওফিডিয়ান সরীসৃপের শিরাবিন্যাস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোপেনহেগেনের জ্যাকোবসন যে বর্ণনা দিয়েছেন, এই প্রজাতিতে তা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। এখানে ভেনা পোর্টা শুধু এবডোমিন্যাল ভেইন দিয়েই তৈরি হয় নি, এর বহিঃমাংসপেশি এবং মেডুলা স্পাইনালিজও রয়েছে, যার ফলে পরিপাকতন্ত্র শ্বায়ুতন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এ থেকে সাপের খাদ্যভক্ষণের নিষ্ক্রিয়তা সুপরিষ্কৃত। টিফ্লোপ্স লুমব্রিকেলিজ (Typhlops lumbricalis) সাধারণত পাললিক মাটিতে পাওয়া যায়। এদের কেঁচো বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। এই সাপ লম্বায় কখনো কখনো এক ফুটের মতো আর কনিষ্ঠ আঙুলের মতো মোটা হয়, দেহের আঁশগুলো একটি অপরটিকে সামান্য ঢেকে রাখে। এদের চোখ অতি ক্ষুদ্র আর লেজ মাথার মতোই মোটা হওয়ায় অনেক সময় দুই-মাথার সাপ নামেও

পরিচিত। পাইথন টাইগ্রিস আর টিফলোপ্‌স লুমবিফেলিজ সাপে বিষ থাকে না। সচরাচর দৃষ্ট অন্য প্রজাতিগুলো হচ্ছে কলুবর টুম্না (*Coluber dhumna*) (নির্বিশ), কলুবর গ্যালাথিয়া (*C. galathaca*), কলুবর মোয়েজট্রিস (*C. moestris*), মেরেমের ড্রাইনাস (*Dryinus of Merrem*), রাসেলের কলুবর নাসেটাস (*C. nasatus of Russel*)। শেমোক্ত এই সাপটি সরু আর লম্বা, নাকের প্রান্তে ছোট সুচালো উপাঙ্গ আছে। মেরেমের ডেনড্রোফিস বা রাসেলের ক্যাটেনুলেটাস (*Dendrophis of Merrem or C. caterulateus of Russel*) মেরেমের কোফিয়াস ভাইরিডিস (*Cophias viridis of Merrem*) বা রাসেলের বুডুপার (*Boodoapeur of Russel*)-এইগুলো বিষাক্ত সাপ। এদের বাস কচুক্ষেতে। কচু গাছের সাথে এদের গাভবর্ণের আশ্চর্য মিল রয়েছে। মেরেমের নেট্রিক্স টোলোটেটাস (*Natrix tollatus*) বা লিনের কলুবর ফেসিয়েটাসকে পিঠের দুটি সাদা লাইন আর আড়াআড়ি কালো দাগ দেখে শনাক্ত করা যায়। হাইড্রোফিস অবস্কিউরাস (*Hydrophis obscurus*) আর হা. নাইগ্রোসিন্টাস (*H. nigrocinctus*) এই প্রজাতি দুটি দানাগ্নি নামে পরিচিত। মৌসুমের শুরুতে মেঘনায় এদের দেখা যায়, আর প্রায়ই জেলেদের জালে এরা ধরা পড়ে। হাইড্রোফিস হল সত্যিকার জল-সাপ। এদের লেজ চ্যাপ্টা; দেখতে অনেকটা বাইন মাছের মতো। এই সাপের আঁশগুলো ছোট, কালো অথবা ধূসর বর্ণের। এই সাপের ফুসফুস লেজের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে এটা অতি পাতলা পর্দার মতো। অন্যান্য সাপের ন্যায় ফুসফুস শিথিল অবস্থায় পেটের কুঠুরির মধ্যে ঝুলে থাকে না, বরং পর্দার যোজন দিয়ে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। বায়ু থলের ন্যায় ফুসফুস সাঁতারে সাহায্য করতে পারে। হাইড্রোফিস লবণাক্ত পানি ছাড়া বাঁচে না বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা সত্য নয়। কারণ উভয় প্রজাতিকে মিঠা পানিতে দু মাসেরও বেশি জীবিত অবস্থায় খোলস পান্টাতে দেখেছি। হাইড্রোফিস বিষাক্ত সাপ। রঙিন নাগ বা কোব্রা ডায়সেফালো (*Cobra dicephalo*) খুব কম দেখা যায়। বর্ষার শুরুতে অথবা বন্যার সময় সাপের প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময় তারা আগ্রয়শীল ত্যাগ করে উঁচু স্থানে কৃষকদের বাড়ির আশপাশে চলে আসে এবং বহুসংখ্যক সাপ কৃষকদের হাতে মারা পড়ে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্পদংশনে ছাপ্পান্ন জন লোক মারা যায়। সাধারণ ব্যাং আর হাইলো (*Hyla*) বা গোছো ব্যাং হল এই অঞ্চলের দুটি মাত্র ব্যাট্রেশিয়ান প্রজাতি।

নানা প্রকার মাছ

নদীতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। রে (*Ray*) বা শাপলাপাতা, রাইয়া ফ্লুভিয়াটিলিস (*Raia fluviatilis*) এবং সাধারণ হাঙ্গর বা স্কোয়ালাস ক্যারকারিয়াস (*Squalus carcharias*) প্রভৃতি মাছ মেঘনা ও গঙ্গা নদীর গভীর পানিতে দেখা যায়। ১৮৩৬ সালের শীতকালে ঢাকার বিশ মাইল উজানে মেঘনার মোহনা থেকে একশত বিশ মাইল দূরে একটি জলাভূমিতে দশ ফুট লম্বা একটা তিমি মাছ শিকার করা হয়েছিল। স্কোয়ালাস প্রিসটিস বা করাত মাছ বঙ্গবঙ্গকালে বড় নদীতে দেখা যায়। আমি সবচেয়ে বড় পাঁচ ফুট লম্বা করাত মাছ দেখেছি। জেলেরা হাঙ্গর আর রে মাছকে কুমিরের চেয়েও বেশি ভয় করে। রে মাছ তার লেজের অগ্রভাগের কাঁটা দিয়ে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে; এমনকি এর ফলে মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নয়। গণ টেট্রোডন (*Tetrodon*)-এর দুটি প্রজাতি টেট্রোডন পোটকা (*Tetrodon Potca*) আর টেট্রোডন কুটকুটিয়া (*T. culcutia*) বাজারে পাওয়া যায়। বিষাক্ত টেট্রোডন টেপাও এই অঞ্চলে দেখা যায়।

অস্থিহীন মাছের অ্যাপোডিস (Apodis) বর্গের প্রতিনিধিত্ব করে : মারেনা (Maraena), ম্যাক্রোগনেথাস (Macrogathus), ওফিসুরাস (Ophisurus) এবং ইউনিব্রাংকাপারচুরা (Unibranchapentura)। প্রায়শঃ মাছ বাজারে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ম্যাক্রোগনেথাস বা বাইন মাছ সুলভ। নিউট্রিক্যাপারচুরা জপাটুনি ও ঝাড়িতে বাস করে। এদের দেহ নলাকৃতি ; প্রায় দুই ফুট দীর্ঘ। লেজের দিকে চাপা ছত্র মাথাটা ছোট এবং গলার চেয়েও সরু। এদের গায়ের রং লাল, তবে পিঠে বিক্ষিপ্ত হলুদেটে দেখা আছে, কিন্তু বৃকের নিম্নাংশ তেলতেলে। মাঝে মাঝে সাদা বা ধোঁয়াটে রঙের কুচিয়ার সাক্ষাৎ মেলে। কয়েক বছর পূর্বে মাটি খুঁড়ে একটা ধোঁয়াটে কুচিয়া পাওয়া গিয়েছিল। কার্ভিনাক্স হুদের তলদেশের ধূসর বর্ণের প্রোটিয়াস এ্যাংগুইনাস (Proteus anguinus)-এর মতো আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এদের রং হালকা। কুচিয়ার শ্বাসতন্ত্র এবং রক্ত পরিবহনতন্ত্র অদ্ভুত। এদেরকে উভচর প্রাণীর সাথে তুলনা করা চলে। ফুলকার ঝিল্লিতে জলীয় শ্বাসক্রিয়া অতি সামান্যই হয়, আর এটা প্রধানত প্রথম ও দ্বিতীয় খিলান (arches)-এর সাথে যুক্ত থাকে। এই অভাব পূরণের জন্য গলার দুই পাশে একটি করে ছোট পাতলা থলি আছে, যা মুখ গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়েছে। কুচিয়া পানির উপরে উঠে এই থলি বায়ু দ্বারা পূর্ণ করে। একটি পূর্ণকৃত থলি দেখতে আখরোট দানার মতো। এই থলির বাতাস দীর্ঘ সময় পানির নিচে ব্যবহার করা চলে। মাছে সাধারণত ফুলকা-শিরা স্বর্ণপঙ্ক্তির ডান অঙ্গিন থেকে উৎপন্ন হয়ে ফুলকা বা শ্বসন ঝিল্লিসমূহে ছড়িয়ে পড়ে ; কিন্তু কুচিয়ার ক্ষেত্রে এই শিরা আংশিকভাবে এই অঙ্গসমূহে এবং আংশিকভাবে শ্বসন থলিতে ছড়িয়ে আছে। দুটি বড় শাখা কোনো শাখা-প্রশাখা বিস্তার না করে একত্রে যুক্ত হয়ে মহাধমনী সৃষ্টি করেছে। কিছু রক্ত অক্সিজেনের সংস্পর্শে না এসেই প্রবাহিত হয়। ঝিল্লি ধমনীর বাহ্যের মধ্যে পারদ অন্তর্ক্বেপ করে শিরার এই বণ্টন প্রমাণ করা যায়। বন্ধ-জলাশয়ের কর্দমাক্ত গর্তের অনেক গভীরে কুচিয়া লুকিয়ে থাকে। এরা অতি মন্থর ও নিস্তেজ, পক্ষান্তরে বাইন মাছের সজীবতা চমকপ্রদ। খোরাসিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত গোবায়স (Gobios), অফিওসেফালাস (Ophiocephalus), কইয়াস (Coios), ট্রাইকোপোডাস (Trichopodus), ল্যাব্রাস (Labrus), বোলা (Bola) আর চান্দা (Chanda) প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। অফিউ মেফালাস লাটা, কইয়াস কবোজিয়াস আর ট্রাইকোপোডাস, খলিসা প্রভৃতি মাছ সব জলাশয়েই পাওয়া যায়। পত্র বিন্যাসের ন্যায় সজ্জিত অতিরিক্ত শ্বসনাস্থ থাকায় এরা কঠিন জীবন ধারণে সক্ষম এবং পানি ছাড়া অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। কই ও খলিসা মাঝে মাঝে ডাকায় পাওয়া যায় ; মনে করা হয় যে, এরা মেঘ থেকে পড়েছে। মার্চ এবং এপ্রিল মাসে জলাশয় শুকিয়ে গেলে মাছগুলো দলে দলে নতুন জলাশয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে তারা রওনা হয়, ফলে অনেক সময় পানি থেকে দূরে মাঠের মধ্যে পাওয়া যায়। কানসার তীক্ষ্ণ ঝাঁজের সাহায্যে মাটি আঁকড়ে ধরে আর লেজের মাংসপেশিতে ঝাঁকানি বা সংকোচন সৃষ্টি করে এরা এগিয়ে চলে। এই দেশান্তর অভিযানে কোনো কোনোটা আধা মাইল পর্যন্ত পাড়ি দেয়, কতগুলো আবার পাখির কবলে পড়ে তাদের উদর পূর্তি করে। ফলে এদের অর্ধেকও গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে বোলাপমা পাওয়া যায় আর সামান্য পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে অধিবাসীদের খাদ্য তালিকায় স্থান লাভ করে। বর্ষাকালে বড় বড় বোলাপমা বাজারে সুলভ। এদের মাথার উপরের বিভিন্ন প্রকার কুঠুরি ব্যবহার জানা যায় নি। কুঠুরিগুলো পরস্পর যুক্ত আর এদের মধ্যে কিছুটা জলীয় পদার্থ থাকে। টর্পেডো বা এই জাতীয় অন্যান্য মাছের সাথে এর সম্ভবত কোনো মিল নেই। এ্যাবডোমিন্যাল (Abdominal) বর্গ সবচেয়ে বড় বলে মনে

হয়। এর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিতে যথেষ্ট প্রকারভেদ আছে। ম্যাকরোপটেরাস মাগুর (Macrophterous magur) প্রচুর পাওয়া যায়। এদেরও অতিরিক্ত শ্বসনাস্ত্র (arborescent organ) রয়েছে। গণ শিলুরাস্-এর বহু প্রজাতি আছে। শিলুরাস্ সিংগিও (Silurus singio) অনেকটা মাগুর মাছের মতো ; এরও অতিরিক্ত শ্বসনাস্ত্র আছে। শ্বসনযন্ত্রের পরিপূরক হিসেবে মেব্রানগের দুই পাশে দুটি নালা আছে। মাগুর, সিং, খলিসা আর কই একত্রে একই জলাশয়ে বাস করে আর স্থল অভিযানে কমবেশি অংশ নেয়। বোয়াল সমস্ত বাংলায় এবং বিশেষ করে এই জেলায় প্রচুর পাওয়া যায়। এরা খুব বড় হয় আর নদীর পেটুক মাছের মধ্যে এই মাছ একটি। বোয়াল মাছের চোয়াল প্রশস্ত, মুখের খিলান উপবৃত্তাকার, কতকটা হাল্লুর মাছের মতো। ভিতরে ধারালো বক্র দাঁতের পাটি। এই মাছ পিস্তধারী। অন্য যেসব প্রজাতি সচরাচর দেখা যায় তা হচ্ছে শিলুরাস্ পাব্দা (Silurus pabda), শিলুরাস্ গেরুয়া। গণ পাইমেলোডাস্ (Pimelodus)-এর মধ্যে আছে, পা. এ্যায়োর বা পাংগাস ; পা. টেংরা, পা. বাতশিয়া (P. batessia), পা. রিতা (P. rita) পা. বাঘারিয়া (P. Bagharia), পা. গাগোর (P. gagare) আর সিলোনডিয়া (P. silondia)। শেষের প্রজাতিটি বড় নদীতে গভীর পানিতে বাস করে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইসোকস্ কাউসিলা (Esox caucilla) বেশি পাওয়া যায়। এই মাছের তীক্ষ্ণ দাঁতে সজ্জিত চোয়াল চামড়া কেটে ফেলতে পারে। মিউজিল করসুলা বা আন্দারি বা মুলেট নদীতীরের কাছাকাছি অগভীর পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে চরে বেড়ায়। শীতকালে এই মাছের বাজার বেশ গরম। পলিনেমাস্ রিসুয়া (Polynemus risua) বা তপসে মাছ এপ্রিল-মে মাসে প্রচুর পাওয়া যায়; এই মাছ স্বাদ ও আয়তনের বিচারে নিকৃষ্টমানের। এই মাছে সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন সাতটি লম্বা পেটোয়াল রে (Pectoral ray) আছে, যা লিউস সিলিয়ারিস (Lews ciliaris)-এর ন্যায় গাছে। ঝড়ি বা শেওলা আঁকড়ে ধরে এবং খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে।^১ এই তন্তুগুলো বড় নদী বহন করে, যা পঞ্চম নাড়ীর একটি শাখার সাথে মেডুলা স্পাইনালিজের শাখা যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে। এরা ক্যানসার গোড়ায় জড়িয়ে উভয় পার্শ্বে একটি করে প্রেক্সাস্ তৈরি করেছে। এই প্রেক্সাস্ প্রত্যেক রে-তে একটা করে শাখা উৎপন্ন করে। ক্লুপিয়া ফ্যাসা (Clupea phasa) বা ভারতীয় হেরিং গঙ্গা এবং মেঘনার মোহনায় পাওয়া যায় এবং বর্ষা শেষে বাজারে প্রচুর বিক্রি হয়। হিলসা আর ক্লুপ্যানাডোন ইলিশা (Clupanadon ilisha) পাওয়া যায় প্রচুর; আকারে বড় আর স্বাদে অতুলনীয়। বর্ষাকালে গঙ্গা নদীতে এই মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। এই সময় প্রজননের জন্য এরা নদীতে আসে এবং জালে ধরা পড়ে। লবণ দিয়ে এই মাছ সংরক্ষণ করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়। মিস্টাস্ চিটালা (Mystus chittala) আর মিস্টাস্ রামকরাতি (M. ramkarati) নদী ও পুকুরে পাওয়া যায় এবং বাজারে সুলভ। গ্রামবাসীদের প্রধান আমিষ জাতীয় খাদ্যতালিকায় এই প্রজাতিগুলো অন্তর্ভুক্ত : কইয়াস কবযোযিয়াস্ (Coius cobjojeus), টুকোপোডাস্ কলিশা (Tuchopodus colisha), শিলুরাস্ সিংগিও (Silurus singio) আর মিস্টাস্ মাগুর (Mystus magore)। অন্য বৃহদায়তন প্রজাতিগুলোর মধ্যে আছে সাইপ্রিনাস রোহিতা (Cyprinus rohita) বা রুই, সাইপ্রিনাস্ কাতলা (C. catla) বা কাতল, সাইপ্রিনাস্ কালবাসিয়া (C. culbasia) বা কালিবাউস, আরসা পুটিটরিয়া (C. putitoria) বা পুঁটিমাছ। এগুলো কয়েক ফুটের বেশি লম্বা হয় না। এদের কানসা দিয়ে চিরুনি তৈরি হয়। হেমিলটনের একরকম সাইপ্রিনাসকে পুঁটি

^১ Sir Claries Bill's Treatise on the Hand.

বলা হয়। শীতকালে এই মাছ গ্রহণ পাওয়া যায়। এই মাছ সিঁদুর করে তেল পাওয়া যায়। এই তেল সাধারণত পরিব মুসলমানরা জ্বালানিক্রমে ব্যবহার করে। টাউন নামের ক্ষেত্রেও এই তেল বিক্রি হয়। বেশ কিছু পরিমাণ তেল কলকাতার রপ্তানি করা হয়। প্রাদেউচিয়ান বর্ণের বিভিন্ন মাছ যেমন—ইসোকাস, পলিনেমাস, (Polynemus) আর মিউজি (Mugil) মাছে প্রবণেশ্বর ও এরার ব্রাডার বা বায়ু ধারার মধ্যে সবুজ স্বেদন রয়েছে। সইলিনাস, শিলুরাস, পাইমেলোডাস, ম্যাক্রোপ টেরোনাস (Macrop teronius) আর কবিতিস (Cobitis) প্রভৃতিতে ম্যামালের ন্যায় কতগুলো অসিকুলা (Ossicula) বাবা এই স্বেদন রক্ষিত হয়। এই মাছগুলোর মধ্যে এরার ব্রাডারের আকৃতি ও গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা এত ছোট যে চলাকোরায় কোনো সাহায্য করে না; যেমন পাইমেলোডাস বাঘারিয়া মাছের ওজন যেখানে ১০ পাউন্ড, সেখানে এরার ব্রাডার দুটি এক একটি মটর দানার মতো। বোলা পোমা, মিসটাস চিতলা আর কুপ্যানডোন ইলিসার এরার ব্রাডারের লম্বা নল দিয়ে এই সংযোগ রক্ষিত হয়। এরার ব্রাডার প্রবণেশ্বরের সাথে এর মিশে গেছে, যদিও একটা পাতলা পর্দা এদের পৃথক করে রাখে। মিসটাস ককসুলা আর কুপ্যানডোন ইলিসার মধ্যে পরিণাকতন্ত্রের গঠন প্রণালীতে সামান্য আত্ম: যেমন পাকহুলী গোলাকার, মাংসপেশিযুক্ত বা খাদ্য বিচূর্ণকের কাজ করে। পাকহুলীতে হালু থাকে যা খাদ্য চূর্ণ করতে সাহায্য করে। পাকহুলীর পাতলা আবরণীতে বহুটি মিউকাস আছে; পাইলোরাসের (pylorus) চারদিকে সিকার (coecal appendages) সন্ধ্যা অনেক। কুপ্যানডোন ইলিসার খাদ্যানালীতে মিউকাস মিশ্রণের জন্য প্রোবিক্যাল ফিলান্ডে পেছনে দুটি থলে আছে। এই মাছের মুখের মধ্যে কোমলাহির সূক্ষ্ম প্রাচীর থাকে। এটি হালুনিয় নাম সূক্ষ্ম ফুলকাগুলোকে বায়ুর সুড়সুড়ি থেকে রক্ষা করে। বৈধ সীমানার মধ্যে মাছ ধরার অধিকার জমিদারের হাতে ন্যস্ত। মৎস্য বাতে তাদের আর নির্ভর করে মৌসুমের ওপর। অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত জেলেকে প্রতিমাসে নৌকানিহু ১ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। এই কম জলাশয়ের সীমার ওপর নির্ভরশীল। বর্ষাকালে এই হার কমে গিয়ে চার খানা থেকে এক টাকা পর্যন্ত হয়। পানি কমে গেলে এক একটি জলাশয় ৫ থেকে ৫০০ টাকার বিক্রি হয় আর প্রায়ই জেলগণ যৌথভাবে জলাশয় ক্রয় করে। মাতে মাতে অন্য পেশার লোকও এই কাজে অংশগ্রহণ করে। মাছ ধরার জন্য প্রায় ১৮ প্রকার জাল ব্যবহৃত হয়। জালগুলো লম্বায় ৪ থেকে ২৫০ হাত এবং প্রস্থে ২ থেকে ২৪ হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই জালের বিভিন্ন নাম আছে যেমন—তপসে মাছের জন্য তন্তুি জাল, হিলস, চিতা, বোলা প্রভৃতি মাছের জন্য কোনা জাল ইত্যাদি। এ ছাড়াও পোলে, কোঁচ, বর্ধ, পড়া ইত্যাদিও মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখান থেকে গ্রহণ তখনো মাছ বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ক্রাস্টাসিয়া এবং শামুক এখানে গ্রহণ পরিমাণে পাওয়া যায়। একজনকর নদীতে হারা (Mya) প্রজাতির একটি কিনুক পাওয়া যায়। এই কিনুকে মুতা উৎপন্ন হয়। শীতকালে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। বেদে (Budiya) নামক মুসলমানরা এই কিনুক সংগ্রহ করে। এই ব্যবসারে সাধারণত ৮০-১০০ খানা নৌকা খাটানো হয়। এই কিনুকের মুতা ছোট বলে নাম কম; গ্রামবাসীরা চামচের পরিবর্তে কিনুক ব্যবহার করে।

পার্ব্বর্তী জেলাসমূহ থেকে আশত জীবজন্তু

পার্ব্বর্তী জেলাসমূহের বেশকিছু জীবজন্তু চাক জেলায় লেখা যায় তারা হচ্ছে শিলুরা পাহাড়ের গয়াল আর প্যাডোমিন; সিলেটের হুঁচো ও বালুর আতীর প্রাণী আর শাকাক। এ ছাড়াও বিভিন্ন

প্রকার পাখি যেমন আরগোজ (Argos) বা ময়ূর, হুপু, বুসেরোজ (Buceros) প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে এখানে আনা হয়। ট্যালপা ইউরোপীয়া (Talpa europia) নামের একটা ছুঁচোকে আমি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলাম। এটা ছিল ইউরোপের সাধারণ ছুঁচো। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস গারো পাহাড়ে ওরাং ওটাং আছে। এই প্রাণীকে তারা বলে বনমানুষ। তাদের মতে এরা উল্লুক বা 'জিবন' থেকে স্বতন্ত্র। গারো পাহাড়ের মানুষ উল্লুক বা 'জিবন' ধরতে অভ্যস্ত। তাদের চিনতে ভুল হবার কথা নয়। সেখানে ওরাং ওটাং আছে এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত। পরলোকগত কারুথারস ১৮৩৭ সালে এই অঞ্চল পরিদর্শনের সময় এই ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান চালান। তিনি জানান যে, বনমানুষ বা ওরাং ওটাং এখানে দেখা গেছে, তবে তারা অতি বিরল। অনেক বছর পূর্বে এই জাতীয় একটা প্রাণী ধরা হয়েছিল। আবুল ফজল এই বনমানুষটিকে বানর জাতীয় প্রাণী বলে উল্লেখ করেছেন। বানরের সাথে এর মুখমণ্ডলের আশ্চর্য মিল আছে; তবে এর কোনো লেজ নেই। এরা সোজা হয়ে হাঁটে, গায়ের চামড়া কালো ও লোমশ। এই জাতীয় একটি প্রাণী বাংলা থেকে আবুল ফজলের নিকট পাঠানো হয়েছিল। প্রাণীটি ছিল অদ্ভুত^১ চামড়ার রং কালো, (ওরাং ওটাং—এ নীল আভাযুক্ত) লোমের আবরণ কমে গিয়েছিল (ওরাং ওটাং পুরু ও লোমশ)। এ থেকে নিশ্চিত প্রমাণ হয় যে এ বনমানুষই প্রকৃত ওরাং ওটাং।

উদ্ভিজ্জ

উত্তর বিভাগের উচ্চ কাঁকর অঞ্চল আর পলিগঠিত জলাভূমি অঞ্চল উদ্ভিজ্জের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন বর্গ, প্রকার ও প্রজাতির বৈচিত্র্যহেতু সবগুলোর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে উপযোগিতার ভিত্তিতে সাজিয়ে কেবল অতি পরিচিত কয়েকটি আলোচনাই করব।

ভোজ্য উদ্ভিদ—জলাভূমি ও আশপাশের উদ্ভিদ

মিসরীয় পদ্ম, নিমফিয়া লোটাস (Nymphaea lotus বর্গ Nymphaeaceae Salisb.) অথবা জল-কমল। এ গাছের কন্দাকৃতি মূল শালুক আর বীজ ও ডাঁটা শাপলা নামে খাদ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়। কৃষকগণ জমি চাষ দেবার সময় শালুক সংগ্রহ করে এবং সেদ্ধ করে ভোজন করে। শালুক থেকে একপ্রকার শ্বেতসার পাওয়া যায়—যা স্থানীয় ডাক্তারগণ এবারুন্টের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন। বীজ থেকে খই তৈরি করা হয়। পানি-কলা বা ওয়াটার গ্যানটেন (Desmonium indicum of Roxb, Steatistes alismoides, Linn)। একে প্রশস্তপত্র জল-সৈনিকও (Broad leaved water soldier) বলা হয়; যেহেতু এর কাঁটাগুলো দেখতে ঠিক জলের উপর শ্রেণীবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো। শাপলার মতো এটাও ঝিল অঞ্চলে জন্মে। এই গাছের বীজ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করা হয়। সিংগারা Trapa বর্গের (Onagrise water cattrops)। এটার রয়েছে দুটি প্রজাতি; Trapa pispinosa, আর T. quadrispinosa। দুটির প্রাচুর্যই সমান আর উপর্যুক্ত উদ্ভিদগুলোর সাথে একই পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়। এর বাদামের শাঁস প্রচুর পরিমাণে বাজারে বিক্রি হয়। কমল গুটা বা রক্ত-কমল (Nelumbium speciosum, বর্গ Nymphaeaceae, juss.)। এই গাছের বড়সড় লম্বা কন্দমূল আর ফলের বীজ শাপলার মতোই গ্রামবাসীদের খাদ্য। হিন্দুগণ এই ফুল পূজায় ব্যবহার করে আর বাজারে মোড়কের কাজে এর পাতা ব্যবহৃত হয়। মুকানা বা

^১ আইন-ই-আকবরী : গ্রাউইন অনূদিত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০।

পকল (*Anneslia apinosa*, Roxb.) বাগানের পূর্বাঞ্চলের স্থানগুলোতে এই উদ্ভিদটি বিশেষভাবে দেখা যায়। নিম্নভূমিতে যেখানে জলের গভীরতা যথেষ্ট সেখানে এই গাছ জন্মে। ফল কালো রঙের সুতীক্ষ্ণ কাঁটায় আবৃত, ভেতরে স্বচ্ছ মণ্ডুক কয়েকটা দেখা পাবে, যাদের মধ্যে লুকাইত থাকে ফলের বীজ। অধিবাসীগণ বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। মে মাস থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত মুকানা বাজারে পাওয়া যায়। ঘেঁচু (*Aponogeton monostachion*, বর্গ *Niades*, Juss.) বা এক কাঁলকী এ্যাপনোজিটন। নিচু ধানের ভূমিতে সচরাচর এদের দেখা মেলে। শালুকের মতোই জমি চাষ দেবার সময় কৃষকরা খাদ্য হিসেবে এই গাছের কন্দমূল সংগ্রহ করে। দীর্ঘদিন জলমগ্ন অবস্থায় এই উদ্ভিদের প্রাচুর্য দেখা যায়, আর বন্যা থেকে উদ্ধৃত খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের সময় ঘেঁচুই হল অপেক্ষাকৃত গরিব গ্রামবাসীদের প্রধান খাদ্যবস্তু।

আর্দ্র ও শুষ্ক ভূমির উদ্ভিদ্ধ : যেগুলোর পাতা ও শাখা-প্রশাখা সবজিরূপে ব্যবহৃত হয়

কলমি শাক (*Convobulus repens*)। এই উদ্ভিদ জলের উপরিস্থানে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। কচি ডাঁটা আর গাছের অগ্রভাগ শাকরূপে ভোজন করা হয়। হেলেক্স (*Jussier repens*, বর্গ *Onagr.*) সচরাচর জলাভূমিতে দেখা যায়। গাছের ডাঁটা ও পাতা ভেতো এবং সর্বসাধারণের একটি রুচিকর সবজি উপকরণ। পুঁই শাক (*Basella Ilcida* বর্গ *Atriplices juss*) বা ঝলমলে মালাবার নাইটসেড (*Shining Malabar Nightshade*)। এর কচি শাখা-প্রশাখা একটি উপাদেয় সবজি। আগার্ক (*Agarch*, *Achyranthes alternifolia*, বর্গ *Amaranth*), লুনিয়া (*Protulacea oleracea* অথবা *Garden purslane*) এবং চৌলি (*Protulacea quadrifolia* অথবা *Creceping anual prushlane*) এইগুলো শাকসবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গন্ধভেদালী (*Oldenlandia alata* বর্গ *Saxifrag juss*) আর মুন্দি (*Sphaeranthus millis* বর্গ *সিনারোসেফালি Cinarocephaloe. juss*) এখানে প্রচুর জন্মে। এদের পাতা কটু গন্ধযুক্ত। দেশীয় খাদ্য তৈরিতে পাতার ব্যবহার আছে।

ফলের গাছ—শুষ্ক ও আর্দ্র ভূমি অঞ্চলের গাছপালা

পানিজোলা (*paniyola*, ফ্লেকোরসিয়া *Flacourtia* ক্যাটাক্রাকটা *Catafracta*, বর্গ *টিলিয়াসি Tiliaceae juss.*)—আকার ও আয়তনে কুলের মতো; ফল বেগুনি রঙের, বর্ষাকালে শহরের বাজারে এই ফল প্রচুর পাওয়া যায়। চড়ক পূজার সময় প্রায়শ্চিত্তকারীগণ দৈহিক নিপীড়নের জন্য এই গাছের কাঁটায়ুক্ত শাখা ব্যবহার করে। মুনকুল বা ময়না (বাংগুয়েরিয়া *Vangueria* স্পিনোজ *spinose*, বর্গ *রুবিয়াসি Rubiaceae. juss*) এই গাছ জঙ্গলে প্রচুর জন্মে। বর্ষাকালে প্রচুর ফল শহরের বাজারে নেওয়া হয়। এই ফলই হচ্ছে ইন্ডিয়ান গ্রাম। ফল আয়তাকার, রসালো এবং এর মধ্যে থাকে দুই বীজযুক্ত একটা কৃষ্ণ সুপারি। সফরিয়াম (সিডিয়াম পিরিফেরাম *Psidium Pyriferum*, বর্গ *মিরেটাসি Myrtaceae. juss*) শ্বেতপেয়ারা (*White guava*) জঙ্গলের একটি সাধারণ বৃক্ষ। পেয়ারা হল বাজারের সবচেয়ে সস্তা ফলগুলোর একটি। আমলকী বা আমলা (*ফিলানথাস Phyllanthus* এমলিকা *embica*, Linn.) মাইরোবালানাস এমলিকা *Myrobalanus*

emblica, Rumph, বর্গ, Euphorbiaceae, juss.) ফলটি আয়তনে প্রায় গুজবেরি ফলের সমান। শহরের বাজারে প্রচুর বিক্রি হয়। ক্ষীরণী (মিমাসপস কন্কি Mimfuhssops Kanki বর্গ, স্যাপোটাসি Sapotaceae, juss) এই গাছ থেকে এক রকম ক্রান্তিনাশক ফল পাওয়া যায়, যা গ্রামবাসীদের কাছে খুব প্রিয়। লুডকা (পিরারডিয়া সাপিড়া, Pierardia Sapida Roxb.) পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে এই গাছ সচরাচর দেখা যায়। এই অঞ্চল আর পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলায় এই গাছ প্রচুর জন্মে। এটি হল চীনের লুডকা। ফলগুলো গুজবেরি ফলের মতো, কিছুটা হলদেটে আর সামান্য টক স্বাদবিশিষ্ট। কামরান্দা (অ্যাভেরহোয়া ক্যামবোলা Averrhoa Carambola, Rump,) বর্গ অক্সালিডি Oxalidae, Decandolle) : এটি জঙ্গলের একটি সাধারণ গাছ, পেয়ারা গাছের সাথে একই পরিস্থিতিতে জন্মাতে দেখা যায়। কাঁচা ফল একটি সবজি উপকরণ। বর্ষাকালে এই ফলটি প্রচুর পাওয়া যায়। জলপাই (ইলিওকারপাস সেরাটা Eloecarpus serrata, বর্গ ইলিওকার্পি, Eloecarpi, juss.)। ইন্ডিয়ান অলিভ গুচ্ছ ও উচ্চভূমি অঞ্চলে এই গাছটি দেখা যায়।

কাঁচা ফলই সাধারণত ব্যবহৃত হয়; ফল দিয়ে আচার তৈরি হয়। ডেফুল (আরটোকারপাস লাকুচা, Artocarpus lacaocha) : এই গাছের কাঁচা ফল থেকে একরকম সাদা আঠালো রস পাওয়া যায়। পাকা ফল ফালি ফালি করে কেটে গরম পানিতে কিছু সময় ডুবিয়ে রাখলে এক প্রকার কুথ বের হয়। এই কুথের মধ্যে চাল সেদ্ধ করে চাটনি প্রস্তুত হয়। চালতা (ডিলেনিয়া স্পিসিওজা Dillenia spiciosa, Thumb) জেলার উত্তরভাগে গভীর জঙ্গলে এই গাছ প্রচুর জন্মে। ফলের আয়তন বড়—একটা আপেলের মতো, স্বাদ খুব টক। দেশীয় রান্নায় চালতার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ইমলি (টামারিনডাস ইন্ডিকা, বর্গ লিগিউমিন, Tamarindus indica, ord. Legumin) : জঙ্গলের একটি সাধারণ বৃক্ষ, গ্রামাঞ্চলে এর চাষ হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে তৈতুল রপ্তানি হয়। কদবেল বা কবিণ্ডু (ফেরোনিয়া এলিফ্যানটাম Feronia elephantum, বর্গ Aurantea ceae, corr. de serr) : এলিফ্যান্ট আপেল। এই গাছটি সাধারণত জেলার উত্তরাঞ্চলে জন্মে। এ গাছের ফল হাতির অতি প্রিয় খাদ্য। এর শাঁসের সাথে লবণ, তেল, লংকা মিশিয়ে রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য তৈরি হয়। গণ ফিকাস—এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রজাতি দেখা যায় : গুলার, ফি. গুমেরাটা; ডুমুর ফি. কারিকা; আরলুটা, ফি. ভ্যাগানস। এগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমুর (আমরা রহিতোকা এবং ওয়াইট আন্ডারসনিয়া কুকুলাটা) : এই গাছের ফল ও ফুল দুটিই রান্নার উপকরণ। আম (ম্যাংগিফেরা ইন্ডিকা, বর্গ টেবিনথাসি, জাস) : উত্তরাংশের অতিপরিচিত বৃক্ষ। কাঁচা ফল দেশী খাদ্য প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। জংলী খেজুর (ফোয়েনিক্স পারিনিফেরা, রোস্ত্র বর্গ Palmae) : এই জাতের খেজুর গাছ প্রায় তিন ফুট লম্বা হয়; জঙ্গলেই এদের সচরাচর দেখা যায়। ফল বাজারে বিক্রি হয়। বেত (ক্যালামাস রোটাং, রোস্ত্র) : গাছের কচি কাণ্ড সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফল খাওয়া হয়। জংলী বা বন হলদি (কারকুমা জেডোরিয়া, বর্গ ক্যানো, Canoe, জাস) : জেলার উত্তরাংশে প্রচুর জন্মে। অতিরিক্ত মুনাফার জন্য আসল হলুদের সাথে বন হলুদ মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। ‘নামান’ (Naman) : গাছের ফল আর শতমূলীর (ন্যাসপারাগাস রেসেমোসাস) শেকড় সিরাপের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও আদা আর লেবু অনুরূপ পদ্ধতিতে তৈরি করে দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠানো হয়। কাঁঠাল আর বেল এই জেলার সর্বত্রই বিদ্যমান।

ঔষধি ওষধি গাছপালা

জয়ন্তী (একিনোমিন সেসবান) নামক গাছের পাতার রস *athelmintic* : প্রত্যক্ষ মাংস ও দুই আউন্স পরিমাণ রস প্রয়োজন। সোনালী (ক্যাসিয়া ফিসটুলা) : শাসের সাথে তৈরুল, চিনি ও গোলাপ জল মিশিয়ে তা রেচক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছুবেদ বেগুনির জন্য শীতলকারী পানীয় তৈরিতে শূটের খোসা ব্যবহারের বেওয়ার্জ আছে। সোন (কর্ডনিয়া পুরপুরিয়া) অথবা পাহাড়িয়া বেগুনি আবলুস (Purple mountain ebony) : ছুবেদ প্রতিকারে এর কাঠ ব্যবহৃত হয়। কট কলেজা (সিজালপিনিয়া বড়ুচেয়া) : এই গাছটি ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রচুর দেখা যায়। গাছের বীজ উপকারী টনিক, পাতা থেকে প্রস্তুত কাথ ছুবে উপকারী। কয়েক প্রকার তরল মলম প্রস্তুতে এটি দরকার হয়। অপবাজিতা (ক্রিটোরিয়া টারনাটা) : মলকা দীপপুঞ্জের টারনেট দীপ এই গাছের অর্ধ কুমি। কথক্কে আক্রান্ত রোগীর অনবরত ঘাম করলে এই পাতার রসের সাথে আদার রস মিশিয়ে বাওঝানো হয়। রক্ত চন্দন (এডিনানথিয়া প্যাভোনিয়া) বা ব্যাটার্ড ফ্লাওয়ার ফেন্স (Bastard flower fence) : এই গাছ অনেক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। কুসকুমের রোগে আর বিশেষ করে হিমোপটিগিস (Haemopytis) রোগে বীজ এবং কাঠ থেকে প্রস্তুত কাথ অথবা তরল মলম বিশেষ উপকারী। বীজ এবং কাঠ ঘষে একটা মণ্ড প্রস্তুত করা হয়; এই মণ্ডের সাথে শুকনো হলুদ বাটা আর মধু মিশিয়ে কঠিন চক্ষুরোগে মণ্ডের সাথে চোখের পাতায় স্পর্শ করার রীতি আছে। খাদিরা (ন্যাকাসিয়া কাটেচু) : কঠিন চর্মরোগে এই গাছের কাঠের মণ্ড প্রয়োগ করা হয়। গুলক, বাসুত, পলতা মুখা, ছুয়ানি প্রভৃতি গাছের সাথে ঝরের কাঠ মিশিয়ে একত্রকার নির্যাস প্রস্তুত করা হয়। তা ছাড়া ওষের আর নিমপাতার সাথে নির্যাস তৈরিতে এই গাছের উপাদান ব্যবহৃত হয়। এক পাউন্ড জলে প্রতিটি উপাদান আধা ছায়া করে নিরে উত্তাপ দিয়ে চার আউন্সে পরিণত করা হয়। মাশানি (গ্রাইসিন লাক্সিলাজ) : বাস্তারি নামে এক রকম তরল মলম তৈরিতে এই গাছের উপাদান দরকার হয়, দীর্ঘস্থায়ী চর্মরোগে এই মলম ব্যবহৃত হয়। কালো কালকাসুন্দা (ক্যাসিয়া পুরপুরিয়া) : এই গাছের পাতা, বিচূর্ণীকৃত বীজ আর গন্ধক সহযোগে মলম তৈরি হয়—খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি চর্মরোগে একত্রে বিশেষ উপকারী। গুলক (মিনিসপারমাম গ্যাবরাম) : কুষ্ঠ রোগে এই গাছের ঠাণ্ডা কাথ ব্যবহারের রীতি আছে। গাছের শাখা টুকরো টুকরো করে কেটে বেঁতলানো হয়, তারপর ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। কাণ্ড ও জলের অনুপাত ১ : ৫। তিন দিন ভিজিয়ে রাখার পর বেঁতলানো কাণ্ড তুলে নেওয়া হয়, জল অতি সতর্কতার সাথে ঢেলে ফেলা হয়, গাছের মিটে একরকম সাদা পাউডার সঞ্চিত থাকে। এই গুঁড়ো পাউডার রোদে শুকিয়ে নিরে কুষ্ঠ রোগের প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়। চিরা (গ্রামবাগো জেলাথিকা) বা সিহেলী বীড ওয়ার্ট (Ceylon lead wart) : কুটীর এবং বাগানের চারপাশে বেড়া হিসেবে এই গাছের আবেটনী অতি মনোরম। গ্রীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এই গাছের শেকড় থেকে প্রস্তুত ঔষধ বিশেষ উপকারী। তা ছাড়া অজীর্ণ রোগে টনিক হিসেবে এই ঔষধের ব্যবহার রয়েছে। গ্রামবাগো রিজিয়া বা পোলাপি লীড ওয়ার্ট—এর প্রাচুর্য দেখা যায় এই জেলায়। এর হান্দির নাম চিরা। উত্তর প্রদেশের কাটা শেকড় চূর্ণ করে ব্যবহৃত হয়। বিচিভি ট্রোজিয়া ইনভলুক্টিয়া; কালিসাই ট্রোজিয়া) : কুষ্ঠ রোগে এই গাছের শেকড় বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়; গাছের পাতা আদা এবং কাইফুস (Kyphul) সাথে মিশিয়ে মাখাব্যবহার শুষ্করূপে ব্যবহৃত হয়। বাসক বা গ্রাস (আতিসিয়া আধা টোডা) মালাবারের বাদাম (Malabar nut) : পাতার রস কনিষ্ঠে প্রেরা নির্গমনী ঔষধ

(expectorant) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক মাত্রা ওষুধের জন্য দুই ড্রাম পাতার রস এবং এক ড্রাম আদার রস প্রয়োজন। বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার তেল প্রস্তুতে বাসক একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। মুখা (সাইপেরাস রোটানডাস) : জঙ্গলে আগাছার আকারে এই গাছ প্রচুর ছড়িয়ে আছে। এর কন্দমূল চেঁছে নিয়ে টাটকা আদার সাথে গুঁড়ো করা হয়। মধুসহযোগে এই ওষুধ রক্ত আমাশয় রোগীর পক্ষে উপকারী। ৮ রতি বা ২০ গ্রেনের মাত্রা ব্যবহার করাই রীতি। শ্যামলতা (ইচিটিজ ফ্রুটসেছেন্জ) : একটা লতানো গাছ। গাছের কাণ্ডে এক প্রকার তেতো রস থাকে। পাতা আর ডাঁটা থেকে তৈরি ক্বাথ জ্বরের রোগীকে খাওয়ানো হয়। ভুঁই কুমড়া (টিকোজানথিজ টিউবারোজা) : এই গাছের কন্দমূল শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পাউডারে পরিণত করা হয়। প্লীহা, যকৃত ও অন্ত্রের প্রদাহে ১০ গ্রেনের এক এক মাত্রা করে এই ওষুধ খাওয়ানো হয়। তেলের সাথে মিশিয়ে কাঁচা কন্দ কুষ্ঠের ঘায়ের উপর প্রলেপ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। সাঁচি (একিরান্ত্রিজ ট্রেইনড্রা) : নিম ও হেলেঞ্চার সাথে সেদ্ধ করে বাত রোগে মেডিকেটেড ভ্যাপার তৈরি হয়। বালা (প্যাভোনিয়া ওডোরাটা) : সুগন্ধি প্যাভোনিয়া বাগানের শোভা বৃদ্ধি করে। মোথা, বেল, ধনে অথবা রাঁধুনি এবং বালা পাতা প্রতিটি দুই গ্রাম করে এক পাউন্ড জলের সাথে সেদ্ধ করা হয়। তাপ দিয়ে এই পরিমাণকে চার আউন্সে পরিণত করা হয়। এটি একটি ধারক ওষুধ (astringent), রক্ত আমাশয় রোগীকে এই ওষুধ দেওয়া হয়। নাগকেশর (মেজুয়া ফেরিয়া) : একটি বিরাট বৃক্ষ। সাধারণত জেলার উত্তরভাগে দেখা যায়, বাগানেও রোপণ করা হয়। কাশি রোগে এই গাছের ফুল তেলের সাথে মিশিয়ে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহার করা হয়। বীজ থেকে এক প্রকার দাহ্য তেল পাওয়া যায়। পুনরনবা (বোয়েরহিবিয়া প্রোকামবেনজ) : মূত্র বৃদ্ধিকারী, শোথ রোগেও পুনরনবার ব্যবহার হয়। বাত রোগের প্রতিকার হিসেবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুইভাবেই ব্যবহৃত হয়। রসুন, সবজি (Subzee) গুড় আর চাল ভাজার সাথে এটা ব্যবহার করতে হয়। এক ভাগ পুনরনবা পাতার সাথে তিন ভাগ রসুন, চার ভাগ সবজি পাতা আর আট ভাগ গুড় ও চাল ভাজা নেওয়া হয়। সমস্ত অংশটিকে ২০ গ্রেনের ছোট ছোট 'পিল'-এ ভাগ করা হয়। প্রতিরাতে দুটি করে পিল সেব্য। তরুকা (অ্যালথিয়া এ্যালুগেজ) : এই নল জাতীয় গাছ জলাভূমিতে সচরাচর দেখা যায়, গ্রামবাসীরা দড়িদড়া প্রস্তুতে ব্যবহার করে। শেকড়ের রস অর্শ রোগে উপকারী। হাড়জোড়া (সিজাস কোয়াদ্রাং গুলারিজ) : এ গাছের ডাঁটা চূর্ণ করে আদা অথবা সর্ষের সাথে মিশিয়ে ক্ষতের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। রোগরা (ভারবিসিয়ান প্রোসট্রাটা) : এর কাণ্ডের রস চিনিসহযোগে জঙ্গিস বা কামাল এবং গনোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। সিরাজুল ওডিনা উইডিয়ার নমি কাকর : গাছের সবুজ শাখার চার আউন্স রসের সাথে দুই আউন্স তেঁতুল মিশিয়ে আফিম অথবা অপর কোনো নেশার ফলে অচেতন ব্যক্তিকে বমি করানোর প্রয়াসে খাওয়ানো হয়। তুলসী (ওসিমাম ভিলেজাম) : মিষ্টি তুলসী। তুলসীপাতার রস, আদা আর গোল মরিচ মিশিয়ে সবিরাম জ্বরের রোগীকে খাওয়ানো হয়। জ্বরের বিরাম পর্যায়ে এই ওষুধ সেব্য। তা ছাড়া, বমি উপশমের কাজেও এর ব্যবহার আছে। শিমুল (বোমবাক্স হেপটাফিলা) শিমুল তুলা (Silk cotton) : এই গাছ সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। শিমুল ফুল, আফিম, ছাগলের দুধ ও চিনি একত্রে সেদ্ধ করে অর্শ রোগের ওষুধ তৈরি হয়। এই ওষুধ দুই গ্রাম করে দিনে তিনবার সেব্য। চম্পা (মিকেলিয়া চম্পকা) : মিষ্টি হলদে চম্পা। শিরঃঘূর্ণন বা মাথা ধরায় তিল তেলের সাথে ফুল বেটে ললাটে প্রলেপ দিলে তা প্রশমিত হয়। পেটের বেদনায় চম্পা পাতার

রস মধুসহযোগে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। নাগফনী (ক্যাকটাস ইন্ডিকা) : গাছের সাদা রস রেচক গুণসম্পন্ন। ১০ ফোঁটা রস চিনি সহযোগে সেবা। শেফালিকা (নিকটান্থিড আরবোর ট্রিজট্রিজ) : এই গাছের ফুল দিনের বেলা নেতিয়ে পড়ে, তাই এর নাম হয়েছে দুঃখী উদ্ভিদ বা ভারতের বিলাপী (Indian mourner)। এ গাছের পাতা জল ও চিনির সাথে সেদ্ধ করে জ্বরের সময় ঘাম বৃদ্ধিকারী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাদা আর হলদেটে ফুলগুলো জুঁই ফুলের মতো সুগন্ধ উৎপাদন করে। জবা (ইরিসিনকাস রোজা সিনেন্সিস) : ঠাণ্ডা জলে প্রস্তুত জবা ফুলের নির্যাস Menorrhagia রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। পলিতা মান্দার (ইরিথিনা ইন্ডিকা) : সবুজ পাতার রস ক্রিমিনাশক ও রেচক গুণসম্পন্ন। প্রতি মাত্রায় দুই আউন্স করে রস সেবা। আকন্দ (ইসক্লোপিয়াস জাইগানটিয়া) সোয়ালো ওয়ার্ট অব ব্রাউন (Swallow wart of brown) : সাদা রকমের (variety) গাছই এই অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। সিফিলিস এবং কৃষ্ণ রোগে শেকড়ের ছাল ব্যবহৃত হয়। সীজ (ইউফোরিবিয়া নারসি-ফলিয়া) ওলিয়ান্ডার লিভড স্পার্জ (Oleander leaved spurge) : এ গাছের সাদা রস রেচক গুণসম্পন্ন। এর কাণ্ড থেকে প্রস্তুত মণ্ড আদার সাথে মিশিয়ে পাগলা কুকুরে দংশিত ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয়। তাতে জলাতনক সৃষ্টির ভয় থাকে না।

ইশরমূল (এরিষ্টালোকিয়া ইন্ডিকা) বা ইন্ডিয়ান বার্থ ওয়ার্ট (Indian birth wart) : জেলার উত্তরভাগে এই গাছটি প্রচুর জন্মে। গাছের শেকড়ের রস কাশি ও হাঁপানি রোগের ওষুধ। কদম্ব (নাউক্লিয়া কদম্বা) : শোথ ইত্যাদি রোগে এই গাছের পাতা বেটে প্রয়োগ করা হয়। ফুল আদার সাথে বেটে ভগন্দর রোগে ব্যবহৃত হয়। মাতুরা (ক্যালিকার্পা ইনক্যানা) : এ গাছ থেকেই সুপ্রসিদ্ধ শীতলপাটি তৈরি হয়। ফুলের ক্বাথ Menorrhagia রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। দুই ড্রাম ফুল ও দুই আউন্স জল এই অনুপাত ব্যবহার করা হয়। এক মাত্রার জন্য এক আউন্স ক্বাথই যথেষ্ট। ভিকা পূর্ণি বা থানকুনি (হাইড্রোকোটাইল এশিয়াটিকা) : এই গাছের রস আদার রসের সাথে রক্ত আমাশয় রোগের প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়। যষ্টিমধু (ক্যালিসি রইজা গ্ল্যাবরা) : উত্তরভাগে সাধারণত দেখা যায়। জ্বরের সময় তৃষ্ণা প্রশমিত করার জন্য শেকড় ব্যবহৃত হয়, তা ছাড়া অন্যান্য উপাদান সমন্বয়ে সিফিলিসের প্রতিকারেও এর প্রয়োগ করা হয়। বকুল (মিমোসপজ এলেনজি) : গাছের বীজ গুঁড়া করে পোষ্টাই করা হয়, দুরারোগ্য কোষ্ঠবদ্ধতায় এই পোষ্টাই চমৎকার ফলদায়ক। জাম্প টোকোরী (Zamp tokuri) (সিডা এশিয়াটিকা) : গাছের পাতা আর শাখার সেদ্ধ পানি বিশেষ ধরনের ক্ষতে (Phagedenic sore) সেক দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। সজনে (হিপোরানথিরা মরিংগা) : এ গাছ দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। শেকড়ের ছাল সর্ষে বীজ আর কাঁচা আদার সাথে বেটে বাতের বেদনায় প্রলেপ দেওয়া হয়। অজীর্ণ ও গ্নীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কুন্দুরী (ব্রায়োনিয়া গ্রানজিজ) : এই গাছের শেকড়ের ছাল শুকিয়ে গুঁড়া করা হয়, এই পাউডার ভালো বিরেচক, প্রতি মাত্রায় ৩০ গ্রেন করে সেবা। পাতরচুর (প্লেকট্রানথাস এ্যারোমাটিকাস) : শিরার রোগে (Stranguary & chardee) পাতার রস উপকারী। রক্ত-কমল (নিমফিয়া রুবরা) : অস্ত্র ও পাকস্থলী থেকে রক্তক্ষরণে ফুল ও ডাঁটা থেকে প্রস্তুত পাউডার বিশেষ উপকারী। সুন্দী শাপলা (নিমফিয়া সায়েনিয়া) : নীলাভ ফুলের শাপলা এক রকম তেল তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই তেল পেটের অসুখে ব্যবহৃত হয়। আরো কতকগুলো ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ হচ্ছে জমল গুটা (ক্রোটন টিগ্রিয়াম), স্ট্রিকনোক্স

নাকস ভরিকো), নিম (মিলিয়া আজাডি রাকটা), ধুতরা (ধাতুরা মেটাল), ভেরেডা (রিসিনাস কমিউনিজ)। এগুলো সাধারণত পতিত জমির গাছপালা।

পশুর খাদ্য ও বিবিধ কাজে ব্যবহৃত উদ্ভিদ

বীণা ও এনাদ্রোপগোন মিউরিকাটাস নামক ঘাস উত্তরভাগে যেসব জায়গা জলে নিমজ্জিত হয় না সেখানে জন্মে। অপেক্ষাকৃত গরিব শ্রেণীর লোকেরা কুঁড়েঘরের ছাউনি তৈরির কাজে এই ঘাস ব্যবহার করে। কিন্তু এটা তত টেকসই বা উপযোগী নয়। উলু (স্যাকারাম সিলিভিকাম, বর্গ, গ্রামিনী) : উত্তরাঞ্চলে এই ঘাস প্রচুর জন্মে এবং ছাউনি তৈরির কাজে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কাশ বা খগরা (স্যাকারাম স্পনটেনিয়াম, বর্গ, গ্রামিনী) বা বোনা আখ : বাচ্চা প্রসবের পরে গো-মহিষকে এই ঘাস খেতে দেওয়া হয়। নল (আরুণ্ডো খাগড়া, বর্গ, গ্রামিনী) : চর ও জলাভূমিতে এই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। উচ্চতায় আট দশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। কুঁড়েঘরের চালা তৈরিতে এটা কাজে লাগে। মুলোয়া বা পুরু মাদুর তৈরি করতেও এটা ব্যবহৃত হয়। বক্ষা (রট-বিলিয়া গ্লাবরা, বর্গ, গ্রামিনী) : এর আরেক নাম 'শক্তঘাস'। এই ঘাস এখানে প্রচুর জন্মে, এটা পশুর প্রধান খাদ্য। কুশা (পোয়া সাইননোসুরইডিজ, রোস্ত্র, বর্গ, গ্রামিনী) : তৃণভূমির ঘাসের (Meadow green) : একটা প্রজাতি। কুঁড়েঘরের দেওয়াল ও দরজা তৈরিতে এর ব্যবহার আছে। কচি ঘাস পশুর খাদ্য। দুবলা (পেনিকাম ডাকটিলোন) বা (Creeping panick grass) এই ঘাস এখানে প্রচুর জন্মে। পশ্চিমের জেলাগুলোর চেয়ে এখানকার দুবলা ঘাস উন্নতমানের। দক্ষিণভাগে নদীতীরের হালকা মাটিতে এই ঘাসের প্রাচুর্য বিশেষ লক্ষণীয়। এই তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চল হচ্ছে জেলার উত্তম চারণক্ষেত্র। এর পাতার রস হিন্দু ডাক্তারগণ ওষুধরূপে ব্যবহার করেন। হোগলা (ট্রাইফা এলিফ্যানটিনা, বর্গ, টাকুফি, জাস) : ইংরেজিতে বলা হয় Elephant grass বা "reed mace"। সদ্যোজাত চর অঞ্চলে হোগলা গাছ প্রচুর জন্মাতে দেখা যায়। জউ (টোমারিক্স ইন্ডিকা) : এই গাছও সদ্যোজাত চর অঞ্চলের হালকা মাটিতে প্রচুর জন্মে। জউ আর হোগলা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিজল গাছ হল পতিত জমির একটি সাধারণ উদ্ভিদ। এটাও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এখানে বাঁশের চারটি রকম (Variety) দেখা যায়। এদের বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত হয়, কিন্তু এখানকার উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর বিধায় পার্শ্ববর্তী সিলেট জেলা থেকে প্রতি বছর বেশ কিছু বাঁশ আমদানি করতে হয়। বোনা বাঁশ (অরুন্ডিনাসি স্পিনোজা) দক্ষিণ ভাগের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে, অন্যান্য রকমের সাথে প্রধান পার্থক্য হল এর শেকড় থেকে অসংখ্য কাঁটা চারদিকে সঙ্গিনের ন্যায় শোভা পায়। এই জেলার বাঁশে প্রায়ই 'তাবাশির' থাকে, তবে সিলেট অঞ্চলের বাঁশেই বেশি দেখা যায়। কর্পূরের সাথে সাদৃশ্য হেতু বালু জাতীয় এই বস্তুকে 'বাঁশ কফুর' বলা হয়। এটা পরকলা গুণ (Optical property) সম্পন্ন। ওষুধ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

গুন্ডতুর বিচারে বাঁশের পরেই গড়ালী গাছের স্থান। জঙ্গলের সেরা গাছগুলোর মধ্যে গড়ালী একটি। সাধারণত জঙ্গলের উচ্চভূমি অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর আকারে এই গাছ শোভা পায়। বর্ষাকালে জলপথ সম্প্রসারিত হলে কাঠুরেগণ গড়ালী গাছ কেটে নিয়ে আসে। ঘর তৈরিতে ও জ্বালানি হিসেবে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বন্য উদ্ভিদের মধ্যে আম, হিজল, বরই ও গাব গাছ লাক্স লাক্স তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। তেল নিষ্কাশন, হামানদিস্তা,

স্ট্যাম্পার ও কাগজ তৈরির জন্য তেঁতুল গাছ ব্যবহৃত হয়। তাঁতের মাকু, চিঙ্গি নৌকা ও জলাধার তৈরির কাজে তালগাছ এবং বাঙ্গ, বারকোশ, পেয়ালার আর বিভিন্ন প্রকার গাছের বাসনপত্র তৈরির কাজে কদম গাছ ব্যবহৃত হয়। ঢেঁকি ও স্ট্যাম্পার তৈরির জন্য গাব (ডিওম্পিরোজ ক্লুটিনোজ) কাঠ ব্যবহার করা হয়। হরীতকী ও বয়রা কাঠ থেকে নৌকা, ঘরের খুঁটি ও কড়ি-বরগা তৈরি হয়। কাঁঠাল গাছের কাঠ হালকা হওয়ায় বড় বড় নৌকার অগ্রভাগ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ট্রাংক, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি তৈরির জন্য মিস্ত্রিগণ এই কাঠ ব্যবহার করে। লোহার বদলে বেতের বন্ধনী দ্বারা ঢুরী ও শাদু নামক ছোট ছোট নৌকা আমকাঠ দিয়ে তৈরি হয়। ডাব গাছের ছাল (বুটিয়া ফ্রানডোজ) ধারক শূণসম্পন্ন। এই গাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা আছে।

খনিজ দ্রব্য

লোহাই এই জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ। উত্তরভাগের কাঁকর অঞ্চলের লাল মাটিতে পিও ও দানার আকারে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। মাটির উপরিভাগে এদের নিশানা দেখা যায়। দেশের এই অঞ্চল সরকার বাজুহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবুল ফজলের সময় এই অঞ্চল লৌহ খনিজের জন্য বিখ্যাত ছিল বলে উল্লেখ আছে। এই খনিজলোর অবস্থান সম্পর্কে সরকারি তথ্যে তখনকার কালেকটর মিঃ ম্যাশাই ১৮০০ সালে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত খনিজলো খুব সম্ভবত জঙ্গলাবৃত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এখানকার লোহা অপেক্ষাকৃত নিকট মানের।

তৃতীয় অধ্যায়

[জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বিক্রমাদিত্য—বানিয়া ও পাল রাজবংশ—আদিশূর রাজবংশ—বল্লাল সেন—মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়]

রাজা বিক্রমাদিত্য

জেলার দক্ষিণাংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কিংবদন্তিতে বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা জানতে পারা যায়—যিনি খ্রিস্ট-অব্দের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে রাজ্যশাসন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এই যুবরাজ ভারতের বহু দূরদূরান্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে এবং দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকালে তিনি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি দ্বীপে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে কয়েক বছর যাবৎ রাজ্যশাসন করেছিলেন বলেও কথিত আছে। বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের জন্য তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং উজ্জয়িনীতে তাঁর রাজত্বকাল থেকে অদ্যাবধি তাঁর সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এই জেলার সঙ্গে জড়িত তাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বস্তুত তাঁর এ স্থানে আগমনের সঙ্গে জড়িত একমাত্র স্মারক হচ্ছে বিক্রমপুর নামটি। বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর অবস্থান হিসেবে এখনো এ স্থানটি বিদ্যমান আছে। পরবর্তী রাজন্যবর্গ, যাদের কথা আমরা শুনতে পাই, তাঁরা ছিলেন বানিয়া বা বৌদ্ধরাজা। এঁরা ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে গঙ্গার পূর্বদিকে অবস্থিত নদীগুলোর কোনো একটিতে ধর্মীয় কৃত্যাদি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন এবং দিনাজপুর, রংপুর ও পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি জেলাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ সকল নৃপতির আগমনের তারিখ জানা যায় নি। কিন্তু তাঁরা কোনো এক সুদূর অতীতে আগমন করেছিলেন বলে কথিত আছে। এটাই সম্ভাব্য যে, তাঁরা অন্তত বিক্রমাদিত্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন।

বানিয়া ও পাল রাজবংশ

বাংলার রাজন্যবর্গের মধ্যে পালবংশের রাজাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বানিয়াগণ এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, এঁরা ১৪২০ বছরেরও অধিককাল পূর্বে রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত এদেশে তাঁদের আধিপত্য লাভের পূর্বে আদি প্রবাসী ও তাঁদের বংশধরগণ রাজ্যের পূর্বাংশে সামান্য মাত্র উপনিবেশের অধিকারী হয়েছিলেন।

বানিয়া রাজাদের তিন জন মাত্র এ জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলে তাদের রাজধানীসমূহের অবস্থান এখনো দৃষ্ট হয়। হুশপাল তালিপাবাদ পরগনার মধুপুরে, সাভারের সন্নিকটবর্তী কুঠিবাড়িতে হুসুন্দর, এবং ভাওয়ালের কাপাসিয়াতে শিওপাল বসবাস করেন। এই সকল রাজার নামের সঙ্গে বংপুরে বসতি স্থাপনকারী বানিয়া রাজাদের নামের সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় অনুমান হয় যে, তাঁরা এক এবং অভিন্ন বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটা উত্তমরূপে জানা যায় যে, বংপুর শাখার বানিয়াগণ একদা প্রাচীন কামরূপ রাজ্য বা নিম্ন আসামের অধীশ্বর ছিলেন এবং এ জেলা সেই রাজ্যের একটি অংশ ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, ব্রাহ্মপুত্র থেকে শীতলক্ষ্যার শাখা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই স্থান পর্যন্ত কামরূপ প্রথমে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানকালেও এখানে বেশ কিছু পরিমাণ কোচ ও রাজবংশী উপজাতিদের অস্তিত্ব থেকে এটা নিশ্চিত বোঝা যায় যে, এই রাজ্য দক্ষিণ ও পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও যমুনা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই এলাকা নিঃসন্দেহে বঙ্গরাজ্য ও উপরিউক্ত রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করেছিল, এবং বিক্রমপুর ছিল এরই কেন্দ্রস্থান।

আদিশূর রাজবংশ

আইন-ই-আকবরী-তে আদিশূর রাজবংশকে পাল রাজবংশের পূর্বের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দেশের এ অংশে সাধারণত অনুমান করা হয় যে, তাঁরা সমসাময়িক ছিলেন এবং একই সময়ে বুড়িগঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করেন। কনৌজ শহর থেকে পাঁচটি ব্রাহ্মণ পরিবার নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবর্ণের সংস্কার সাধনের জন্য আদিশূর খ্যাতি অর্জন করেন; কিন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বন এবং তাঁর সময়ে সমগ্রদেশ বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্র ইত্যাদি রাজ্যে বিভক্ত হওয়া ছাড়া—তাঁর রাজত্বের আর কোনো কিছু জানা যায় না। তাঁর পূর্বপুরুষরূপে অনুমিত বিক্রমাদিত্যের মতোই তদীয় ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে।

বল্লাল সেন

বল্লাল সেনের বংশ বা কুলজী বিষয়ে আইন-ই-আকবরী ও দেশের কিংবদন্তিতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এখানে তাঁকে সাধারণত বিক্রমপুর রাজসরকারে আদিশূরের পরবর্তী উত্তরাধিকারী বলে ধরা হয়, এবং তিনি সেখানকার রাজা ছিলেন বলে কথিত হন। মুসলমানগণ কর্তৃক বাংলার এই অংশ জয় করার প্রাক্কালেও বানিয়া রাজন্যবর্গ বুড়িগঙ্গার উত্তরাংশে তাদের রাজ্যশাসন করছিলেন। এই জনপ্রিয় কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি অবশ্য ব্রাহ্মণদের বিবাহের ঘটকদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এদেরকে দেশের অন্য যে কোনো শ্রেণীর লোক অপেক্ষা বল্লাল সেনের কুলজী ও ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণত অধিকতর সুপরিচিত বলে অনুমান করা হয়। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনার সঙ্গে আবুল ফজলের বর্ণনার পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু বল্লাল সেনের একজন বংশধর রাজা ছিলেন। তিনি গৌড় শাসন করতেন এবং তাঁর সময়ে সেই শহরের পতন ঘটে—এ ধরনের বর্ণনার সঙ্গে আবুল ফজলের মতের সাদৃশ্য রয়েছে। অন্যদিকে তাদের মতে, বল্লাল সেনের দৌহিত্র দনুজ মাধব (দনুজ মর্দন দেব?) ছিলেন যুবরাজ, যিনি সেই সময়ে বিক্রমপুরে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। এখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুরা বল্লাল সেনকে

আদিশূরের জনৈক স্ত্রীর গর্ভজাত এবং একজন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ব্রহ্মপুত্রের সন্তানরূপে অভিহিত করে থাকেন। তিনি বুড়িগঙ্গার উত্তরে জঙ্গলে জন্মলাভ করেন ও লালিতপালিত হন। এখানে তাঁর মা আদিশূর কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছিলেন। আরো জনশ্রুতি আছে যে, এ অবস্থায় দুর্গার নিকট তিনি বা আদিশূর যে আশ্রয় লাভ করেন, তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দেবীর উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মাণ করেন, যার মূর্তি বল্লাল সেন এই জঙ্গলে আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বল্লাল সেন আদিশূর কর্তৃক দণ্ডকরূপে লালিতপালিত হন। এই স্থান তাঁর লুপ্তায়িত অবস্থানরূপে ঢাকেশ্বরী (Dehaka Iserry) নামে খ্যাত হয়েছিল। কিন্তু এই জঙ্গল পরবর্তীকালে পরিষ্কার করার ফলে সেখানে একটি শহর গড়ে ওঠে যার নাম হয় ঢাকা। রাজা বল্লাল সেনই হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের পুনর্বিন্যাস করেন। হিন্দু সমাজ আজো সেইভাবেই আছে।

মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর শাসনভার কয়েকজন কাজীর উপর ন্যস্ত করা হয় এবং এঁরা বিক্রমপুর, সাভার ও সোনারগাঁওয়ে বসবাস করেন। তৎকালীন ধর্মীয় প্রশাসকদের মধ্যে ‘পীর আদম’ ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি বিক্রমপুরের প্রশাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে তিনি ধর্মান্ধতা ও অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত হয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।

পরবর্তীকালে সেখানে বিভিন্ন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশের এ অংশে প্রথম যে ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, তিনি সুলতানউদ্দিন তুঘরি। ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে এই শাসনকর্তা ত্রিপুরায় অভিযান চালান এবং সেখান থেকে ধন-সম্পদ ও হস্তিসহ প্রচুর দ্রব্য লুণ্ঠন করে ফিরে আসেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর একসময়ের প্রভু বালিমের (বলবন) বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করেন এবং সম্রাট সোনারগাঁও পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে পলায়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু সম্রাটের সেনাবাহিনীর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দেশটাকে লক্ষণাবতী ও সোনারগাঁও—এ দুটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করা হলে, বাহাদুর খান সোনারগাঁও সরকারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে ফিরিস্তার বর্ণনানুসারে^১ সোনারগাঁও ও লক্ষণাবতী থেকে অভিযোগ আসছিল যে, আমীর ওমরাহ ও শাসকগণ অধিবাসীদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা ও অবিচার করছেন। এতদ্রূপে সম্রাট তুঘলিশাহ একদল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং আলিফ খানকে দিল্লিতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল পরিদর্শনে যাত্রা করেন। দিল্লি থেকে অগ্রসরমাণ সৈন্যবাহিনীকে বাধা প্রদান সম্ভব নয় ভেবে বাহাদুর খান অগত্যা তুঘলিশাহ বা তুঘলিকের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে বন্দীরূপে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতার বৈরম খান উপাধি ধারণ করে তাঁর উত্তরাধিকারী হন ও চৌদ্দ বছর যাবৎ দেশ শাসন করেন। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বৈরম খানের মৃত্যু হলে, তাঁর সিলাহদার বা অস্ত্রবাহক ফকরুদ্দিন

১ মার্কোপোলো উল্লেখ করেন যে, ১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে যখন তিনি তাতার বংশীয় প্রসিদ্ধ খানে রাজদরবারে অবস্থান করছিলেন, তখন সেই সেনাপতি কর্তৃক বাঙালা রাজ্য বিজিত হয়। এ দেশে একজন রাজা ছিলেন এবং এর নিজস্ব ভাষা ছিল। এখানে প্রচুর তুলো উৎপন্ন হত এবং ব্যাপক ও বিরাট আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।—মাসডেনের অনুবাদ।

সুলতান সিকান্দার উপাধি নিয়ে রাজকীয় লালছত্র ও অন্যান্য প্রতীক চিহ্ন ধারণ করেন এবং নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি সোনারগাঁয়ের সৈন্যদলকে হত করে কাদের খানকে নিহত করতে সমর্থ হন। (এই কাদের খানের নিকট একদা তিনি পরাজিত হয়েছিলেন) এবং এভাবে তিনি প্রায় আড়াই বছর যাবৎ পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অতঃপর তিনি লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা আলী মোবারক কর্তৃক সমতাচ্যুত ও নিহত হন।

স্বাধীন নরপতিগণ কর্তৃক রাজ্যশাসন

সুলতান সিকান্দরের উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাজাদের মধ্যে এই জেলা প্রসঙ্গে যাদের নাম ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়, তারা হচ্ছেন ইলিয়াস, খাজা সুলতান শামসুদ্দিন ভাস্কর, তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান সিকান্দর শাহ ও সুলতান আল্লাউদ্দীন হুসেন শাহ। এরা সবাই জেলার উত্তরভাগে অবস্থিত একডালা নামক শক্তিশালী দুর্গে বসবাস করতেন। এখানে দু'দুবার সম্রাট ফিরোজ কর্তৃক ইলিয়াস খাজা ও তদীয় পুত্র অবরোধ অবস্থার সম্মুখীন হন। কিন্তু দু'বারই দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যর্থ অভিযান চালানোর পর সম্রাট তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এবং শেষ পর্যন্ত সুলতান সিকান্দর শাহের স্বাধীনতা স্বীকার করেন নেন। একডালা দুর্গ থেকে হুসেন শাহ কামরূপ অভিযান চালিয়ে কামরূপের রাজধানী দখল করেন। স্বাধীনভাবে বাংলা শাসনকারী রাজন্যবর্গের মধ্যে হুসেন শাহকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতিরূপে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন। ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতমন্ডলের এ দেশ পরিভ্রমণকালে সুলতান হুসেন শাহ নরসিংদার (উড়িষ্যা) রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যপ্ত ছিলেন। এ সময় তাঁর রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ২,০০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং মাহত ছিল বলে উক্ত পরিব্রাজক বর্ণনা করে গেছেন।^১

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকা

বাংলার স্বাধীন নরপতিগণের পরবর্তী শেরশাহী রাজবংশের আধিপত্যের অবসানে এবং ষোড়শ শতকের শেষভাগে ঢাকার সন্নিকটবর্তী অঞ্চল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার বা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলো এক একটি রাজ্য নামের মর্যাদায় বিভূষিত ছিল। ত্রিপুরাও তখন একটি স্বাধীন এলাকারূপে গঠিত হয়। (বর্তমান কালে যেমন আছে) এবং এর রাজারা পূর্বে আরাকানী রাজাদের অধীন ছিলেন। তখন তারা 'মানিক' উপাধি ধারণ করতেন; অন্যদিকে অভিজাত ব্যক্তির নিতেন 'নারায়ণ' উপাধি। এর রাজধানী বাকলা—বাকেরগঞ্জ জেলার চন্দ্রদ্বীপ পরগনায় অবস্থিত ছিল। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ফিচ^২ এটিকে একটি সম্পদশালী দেশরূপে বর্ণনা করেন এবং এদেশ প্রচুর পরিমাণ ধান, চাল, তুলো ও পশমজাত দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শহরের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, “রাস্তাগুলো বৃহৎ এবং বাড়িগুলো সুন্দর সাজানো ও উচ্চাকারে

১ লুইস ভার্তমানস কৃত নেভিগেশন এন্ড ডিসকভারি, জেনটেলম্যান অব বোম-রিচার্ড ইচেন কর্তৃক অনূদিত।

২ র্যালফ ফিচ ছিলেন চীন সম্রাট ও কয়েক রাজার নিকট রানী এলিজাবেথ কর্তৃক প্রেরিত দূতগণের অন্যতম ব্যক্তি। 'পুরকাস কলেকসন অব ট্রাভেলস' দ্রষ্টব্য।

নির্মিত।” তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেন যে, “রাজা খুব ভদ্র ও স্বভাবসুন্দর ব্যক্তি। তিনি বন্দুক নিয়ে শিকার করতে যথেষ্ট আনন্দ পান। মেয়েরা তাদের গলায় ও বাহুতে রৌপ্যনির্মিত প্রচুর গোলাকার অলংকার পরিধান করে থাকে। তাদের পাগুলো রৌপ্য ও তাম্রনির্মিত অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত এবং আংটিগুলো হস্তীদন্তনির্মিত।” এ সব রাজ্যের মধ্যে একটি ছিল শ্রীপুর। এটি সোনারগাঁও-এর প্রায় ছ ‘লীগ’ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পর্তুগিজরা এখানে বসতিস্থাপন করেন বলে জানা যায় এবং ফিচের পরিভ্রমণ কালে দেশের এ অংশে সম্পূর্ণ না হলেও তাদের বেশ কিছুটা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সোনারগাঁওয়ের কথা বলতে গিয়ে ফিচ আরো উল্লেখ করেন যে, “এ সকল দেশের প্রধান রাজা ঈশা খান নামে অভিহিত, এবং তিনিই অন্যান্য রাজার নেতা। তিনি খ্রিস্টানদেরও প্রধান বন্ধু।” চণ্ডী খান শহর বাকুলার দক্ষিণে মেঘনার মোহনা সংলগ্ন সুন্দরবন অংশে অবস্থিত ছিল। এর রাজা জলদস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করত বলে প্রতীয়মান হয়।

আরাকান রাজ্যের চাটিগাঁ ও সন্দ্বীপ এলাকা

চাটিগাঁ ও সন্দ্বীপ আরাকান রাজ্যের অংশ ছিল। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভেনিসীয় পরিব্রাজক সিজার ফ্রেডারিক সন্দ্বীপকে সমগ্র দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্বর, ঘনবসতিপূর্ণ ও উত্তমরূপে আবাদকৃত এলাকা হিসেবে বর্ণনা করেন। এখানে খাদ্যদ্রব্য অসাধারণ সস্তা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, বছরে প্রায় ২০০ জাহাজ লবণ দিয়ে বোঝাই করা হত। দেশের এ অংশে জাহাজ নির্মাণের জন্য এত প্রচুর পরিমাণ কাঠের উপকরণ পাওয়া যেত যে, কনষ্টানটিনোপলের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়া অপেক্ষা এ স্থানে তাঁর জাহাজ নির্মাণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত সস্তা দেখতে পান। দীর্ঘ ৮০ বছর পরেও এই দ্বীপের উর্বরতা ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করেন এবং ভূখণ্ডকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও ফলপ্রসূ স্থানরূপে বর্ণনা করেন।^১

আফগানদের বিতাড়ন

সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাংলার অভ্যন্তরভাগ থেকে বিতাড়িত আফগানদের বেশিরভাগ লোক উড়িষ্যা ও ঢাকা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এখানে তাদের বেশ কিছুসংখ্যক লোক সম্মিলিত হয় এবং উত্তরভাগের বনজঙ্গলে তাদের আশ্রয় স্থান নির্মাণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজা মানসিংহ আটিয়া পরগনার শ্রীপুরে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তারা অবশ্য শিগগিরই এই পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করে, এবং অত্যল্পকালের মধ্যে ডেমরার সন্নিকটে গণকপাড়া ও গৌরীপুরে দুর্গ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কথিত আছে, সেখানে তাদেরকে দমন করতে না পেরে হতাশ হয়ে রাজা মানসিংহ আফগানদের উৎপীড়ন করা থেকে বিরত থাকেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হলে, আফগানদের অন্যতম সেনাপতি ওসমান খান ২০,০০০ আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলার নিম্নাঞ্চল জয় করেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশের এ অংশে তাঁর আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে (১৬১২ খ্রিঃ) প্রদেশের (বাংলার) শাসনকর্তা ইসলাম খান কর্তৃক দুজন

১ স্যার থমাস হার্বার্টের ট্রাভেলস্। হার্বার্ট ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে এ দেশ পরিভ্রমণ করেন।

মুঘল রাজকর্মচারী সুজাত খান ও ইত্‌মাম খান—ওসমান খানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দীর্ঘস্থায়ী ও তুমুল যুদ্ধের পর ওসমান খান নিহত হন ও তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজয় বরণ করে। গ্রাডউটন লিখেছেন যে, এই বিজয়লাভের পর, ইসলাম খান তাঁর রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। স্টুয়ার্ট কর্তৃক বর্ণিত তারিখ থেকে এটা প্রায় চার বছর পরের ঘটনা, যিনি রাজধানী স্থানান্তরের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উপকূলভাগে মগদের অতর্কিত আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করেন।^১ অন্যদিকে হার্বাটের মতে, আফগানরা ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে পরাজয় বরণ করেন।^২ তিনি বর্ণনা দেন যে, তারা “প্রধান নগর ‘ঢায়েক’ (ঢাকা) অবরোধ করে তা জয় করেন,” কিন্তু পূর্বেলিখিত সুজাত খান ও ইত্‌মাম খান (Ethamam Khan) “১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে ওসমানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। উভয়পক্ষে সাহসিকতাপূর্ণ লড়াই চলে। কিন্তু ওসমানের ব্যবহৃত পাল্লা হস্তীর কারণে ইজ্জত খান অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত ও আহত হন সত্য বটে, মুঘল সৈন্যবাহিনী অপ্রতিভ হয়ে পড়ে; কিন্তু ওসমানকে পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে আহত ব্যক্তি আশ্চর্য একটা সুযোগ নিয়ে বল্লম দিয়ে তাকে এফোড়-ওফোড় করে দেন। এই দুর্ভাগ্যের দক্ষন পশ্চানগণ পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন এবং অবশেষে পলায়ন করেন। অতঃপর মুঘলগণ শুধু ঢাকাই পুনরুদ্ধার করেননি, পৌত্তলিকদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক স্বেচ্ছাচার ও লুণ্ঠনকার্য চালান। অতঃপর সমস্ত ধনসম্পদ (এখান থেকে বিপুল ধনসম্পদ আখ্যায় প্রেরণ করা হয়) তাদের সাহসিকতা ও বিজয়ের প্রমাণস্বরূপ স্তুপীকৃত করা হয় এবং ওসমানের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের বন্দী করা হয়।” এ জেলা থেকে আফগানদের বিতাড়নের অত্যাশঙ্ক্যের মধ্যে ইসলাম খান মগ ও পর্তুগিজগণকে পরাজিত করেন। আরাকানের রাজা পর্তুগীজ জলদস্যু সিভাসতিয়ান গঞ্জালেসের সঙ্গে আঁতাত করেন।

এ সময়ে সন্দ্বীপ গঞ্জালেসের অধীনে ছিল এবং বিভিন্ন আকারের অস্ত্রশস্ত্রের সুসজ্জিত ৮০টি যুদ্ধজাহাজ ছাড়াও, এদের সৈন্যবাহিনী ১০০০ পর্তুগীজ, ২০০০ অন্যান্য সিপাই, ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা প্রদেশের দক্ষিণাংশের উপর আক্রমণ চালায়। মেঘনার পূর্বতীর বরাবর গ্রাম-নগর ধ্বংস করে তাদের সম্মিলিত বাহিনী জল ও স্থলপথে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে মোঘল সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের প্রবল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয় ও তারা পরাজিত হয়। এই ঘটনার পরই ইসলাম খান প্রায় এক বছরকাল যাবৎ ঢাকার শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা কাসিম খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শাসনকর্তার পদ সৃষ্টির সময় থেকে সুলতান সুজা কর্তৃক রাজধানী স্থানান্তর পর্যন্ত (২৬ বছরের এই মধ্যবর্তী সময়) সম্ভবত এই জেলা অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বহিরাক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান উড়িষ্যা থেকে অভিযান করেন এবং বেশ কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ও হস্তীবাহিনী নিয়ে তিনি শহরে উপস্থিত হন। তাঁর আগমনে প্রদেশের শাসনকর্তা ইব্রাহীম খান রাজমহলে পালিয়ে যান। সেখানে বিদ্রোহী যুবরাজ তাঁর অনুগমন করেন। অতঃপর রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করে এবং নওয়ারা বা নৌবাহিনী দখলপূর্বক (এই সময়ে ইব্রাহীম খান নিহত হন) তিনি উড়িষ্যার সুবাদার আহমদ বেগের পশ্চাচ্ছাবন করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। হার্বাটের বর্ণনায় জানা যায়, সম্পদশালী এই সমগ্র প্রদেশটি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে,

১ স্টুয়ার্ট-কৃত হিষ্টি অব বেঙ্গল।

২ হার্বাট ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে পরিভ্রমণ করেন।

এর স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদি হস্তগত করে এবং ব্যভিচার চালিয়ে তিনি অধিবাসীদের নিকট থেকে বলপূর্বক শপথ ও জামিনস্বরূপ অর্থ আদায় করেন। যুবরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আহমেদ বেগ তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং বিরাট মূল্যের মসলিন বস্ত্রাদি ও আগর কাঠ ছাড়াও, তদীয় চাচা ইব্রাহীম খানের ২৫ লক্ষ টাকা, ৫০০ হস্তী এবং ৪০০ অশ্ব ইত্যাদি সম্পত্তি ও চার কোটি টাকা, সঞ্চিত সরকারি অর্থ-সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দেন। শাহজাহানের জবর-দখলের স্বল্পকালীন সময়ে আমীর-ওমরাহগণের প্রধান খান খানানের পুত্র দরাব খানের হস্তে দেশের সরকার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। তিনি কয়েক মাস কাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁর প্রভুর সাহায্যার্থে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করায় যুবরাজ পারভেজ কর্তৃক (প্রভুর পরাজয়ের পর) তিনি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষিত হন এবং তাঁকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। হার্বাটের বর্ণনানুযায়ী, এ জেলার জমিদারগণ কর্তৃক তিনি ধৃত ও সম্রাটের শিবিরে প্রেরিত হন। অতঃপর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। দরাব খানের ইতিহাস সম্বন্ধে এটা হচ্ছে হার্বাটের বক্তব্য। কিন্তু অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি শাহজাহানের নিকট বিশ্বাসঘাতকরূপে প্রমাণিত হন এবং জামিনস্বরূপ তদীয় পুত্র যুবরাজের হস্তে অর্পিত হয়। অবশেষে পুত্রকে পিতার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জীবন দিতে হয়। আরো জানা যায় যে, দরাব খান পিতার স্বার্থে ও যুবরাজ পারভেজের অনুকম্পার উপর নির্ভর করে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও বন্দী হন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে রেহাই দিতে অস্বীকার করেন এবং আশ্রয় তাঁর শির প্রেরণের নির্দেশ দেন। খানরিদ খান, মুকাররম খান ও ফিদাঈ খানের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে অপেক্ষাকৃত শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তী কাসিম খান জঙ্গ, আজিম খান ও ইসলাম খান মাশহাদীর শাসনামলে—তাঁরা পুনরায় তাঁদের সীমান্ত শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমিতে আসামীয়গণ আক্রমণ চালায় এবং প্রায় ঢাকার সন্নিকটে পৌঁছে যায়। এই মুহূর্তে নওয়ারার সাহায্যে ইসলাম খান মাশহাদী তাঁদের মোকাবিলা করেন। এখানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং এতে আসামীয়দের ৪,০০০ লোক নিহত হয়। মুঘল শাসনকর্তা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে শত্রুদেশের অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়েন এবং তাঁদের পনেরটি দুর্গ দখল করেন। পূর্বে বহু বছর যাবৎ জেলার দক্ষিণাঞ্চলসমূহে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে মগরা কম দুর্ধর্ষ ছিল না এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর জঘন্যতম নিষ্ঠুরতা ও বহু লোককে ধরে নিয়ে দাসে পরিণত করার অভ্যাস তাদের ছিল। মগদের হাত থেকে রক্ষার জন্য এ সময়ে দেশের বিধিবদ্ধকৃত খাজনা সম্পূর্ণরূপে জায়গীরে পরিণত করা হয়। রাজস্ব হ্রাসের পরিমাণ এরূপ ছিল যে, ফিদাঈ খান বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা প্রদানের শর্তে শাসনকর্তার পদ লাভ করেন; এর মধ্যে ৫ লক্ষ দিতে হত সম্রাটকে এবং আর বাদবাকি ৫ লক্ষ দিতে হত নূরজাহান বেগমকে। আরো কথিত আছে যে, আসামীয়দের আক্রমণের সময়ে একটি কানাকড়িও দিল্লিতে পাঠানো হয় নি। কাসিম খান জঙ্গ ও আজিম খানের শাসনামলে মগেরা ভীষণ উৎপাত শুরু করে, কিন্তু ইসলাম খান মাশহাদীর সময়ে আরাকান সেনাপতি মুকুট রায়ের সদ্যবহারের ফলে এ জেলা তাঁদের আক্রমণের হাত থেকে কিছুটা অব্যাহতি লাভ করে। ইনি তাঁর মালিক আরাকানরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং মুঘল সম্রাটের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। আসাম অভিযান থেকে ফিরে এলে ইসলাম খান মাশহাদীকে সুউচ্চ মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করে তাঁর পদে সাঈফ খানকে নিয়োগ করা হয়। এই নবাব শাসনকর্তারূপে মাত্র অল্প কয়েক মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু তাঁর ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মহাম্মদ সুজাকে এই সুবা বা

প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তাঁর বিশ বছরব্যাপী শাসনকার্য পরিচালনাকালে তিনি রাষ্ট্রের সকল বিভাগের সংস্কার সাধন করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর শাসনাধীনে দেশের আঞ্চলিক খাজনার একটি উন্নত ধরনের “জুমা-তামারী” (Jumma Toomary) বা প্রজার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উড়িষ্যার এলাকা দখল করে এবং পরবর্তীকালে আসাম বিজয়ের দ্বারা তোড়মূলকৃত সরকার বা পরগনার সঙ্গে পনেরটি সরকার যুক্ত করার ফলে বেশ কিছু পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ঢাকায় স্বল্পকালীন অবস্থানের পর সুলতান সুজা রাজমহলকে দেশের রাজধানী করেন। এই সময়ে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর শাসনভার সহকারী শাসনকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং এঁদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আজিম খান।

মীরজুমলার শাসনকাল

ঢাকার ইতিহাসে বোধহয় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ যুগ ছিল ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে মীরজুমলার শাসনকর্তা পদে নিয়োগের সময় থেকে মুর্শিদাবাদ দেশের প্রধান নগর হওয়া পর্যন্ত সময়কাল। মীরজুমলার শাসনকালে ঢাকাকে পুনরায় রাজধানী করা হয়। আরাকান থেকে আক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্যে মীরজুমলা লক্ষ্যা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি বিভিন্ন দুর্গ নির্মাণ করেন ও শহরের সন্নিকটে কয়েকটি ভালো সামরিক সড়ক ও সেতু তৈরি করেন। আরাকান, হতভাগ্য সুলতান সুজার মৃত্যুসংবাদ লাভ করে তিনি লক্ষ্যার তীরবর্তী হাজীগঞ্জ দুর্গ থেকে অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌসেনার সম্মিলিত বিরাট বাহিনী নিয়ে আসাম আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদলের লোকদের মৃত্যু ও রোগব্যাধির কারণে অবশেষে তিনি সে দেশ থেকে সরে আসেন। অতঃপর তিনি নিজেও পীড়িত হয়ে পড়েন এবং ঢাকার সন্নিকটে মৃত্যুবরণ করেন। জনশ্রুতি অনুসারে, তাঁর নশ্বর দেহ তদীয় অন্তিম প্রার্থনানুযায়ী ইম্পাহানের কাছে তাঁর জন্মস্থানে নিয়ে কবরস্থ করা হয়। এখানে অদ্যাবধি মুসলমান অধিবাসীরা মীরজুমলার স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। এরা তাঁকে ‘খান খানান’ নামে ঢাকার নবাবদের মধ্যে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তারূপে উল্লেখ করে থাকে।

শায়েস্তা খান

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র শায়েস্তা খান আমীর-আল-ওমরাহ্ মীরজুমলার স্থলাভিষিক্ত হন। এই নবাবের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোর অন্যতম ছিল চট্টগ্রাম অভিযান। এর ফলে চট্টগ্রাম অবরোধ ও তা দখল করা হয় এবং মুসলিম সেনাদলের এই সাফল্যের স্বরণে এর নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ রাখা হয়। শাসনকর্তারূপে ফিদাই খান, আজিম খান এবং আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহাম্মদ আজিমের শাসনকার্য পরিচালনার দু’বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ব্যতিরেকে নবাব শায়েস্তা খান দীর্ঘ পনের বছরকাল যাবৎ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময়ে শহরতলিসহ ঢাকা নগরী চৌদ্দ মাইল দূরত্বে অবস্থিত টঙ্গি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমুদয় এলাকা বহু বাগান ও ঘরবাড়ি দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। বর্তমানে এর অধিকাংশ এলাকাই জঙ্গলাবৃত। শায়েস্তা খান কর্তৃক জনসাধারণের ব্যবহার্য বেশ কিছুসংখ্যক অট্টালিকা, যেমন মসজিদ, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি নির্মিত হয়। এখানে “শায়েস্তা-খানী” নামে পরিচিত অট্টালিকা নির্মাণ বা বাড়ি-গাঁথার প্রচলিত রীতি বিচার করে প্রতীয়মান হয় যে, শহরের ইষ্টকনির্মিত বিরাট বিরাট অট্টালিকার বেশিরভাগই তাঁর সময়ে

তৈরি হয়েছিল। খাদ্যশস্য ও তৈল রপ্তানির ওপর অতিমাত্রায় আরোপিত কর আদায়ের অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত সস্তাদামে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা যেত। এই জেলা এই সময়ে বেশ শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। অথচ পূর্বে বহু বছরব্যাপী একরূপ পরিবেশ ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আজ্ঞানুযায়ী দেশের বিভিন্ন ইংরেজ ফ্যাক্টরি—এই নবাব কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এই নবাব অথবা তাঁর সহকারী বাহাদুর খান কর্তৃক বাণিজ্য প্রতিনিধিগণ ঢাকায় কিছুকাল আটক থাকেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহের পর শাসনকর্তার পদ থেকে নবাব ইব্রাহীম খানকে বরখাস্ত করে সম্রাট আওরঙ্গজেব তদীয় দৌহিত্র যুবরাজ আজিম-উস-শানকে বাংলার নিজামত পদে নিয়োগ করেন।

মুর্শিদকুলি খানের দেওয়ানি লাভ

সুলতান সুজার সময় থেকে সরকারি রাজস্বের কোনোরূপ উন্নতি না হওয়ায় ঐ একই সময়ে তিনি সরকারি খাজনা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদকুলি খানকে দেওয়ানির ভার অর্পণ করেন। ইতঃপূর্বে মুর্শিদকুলি খান উক্ত বিভাগের নিম্নপদে কার্যরত থেকে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেওয়ানের প্রাথমিক কার্যাবলির অন্যতম ছিল—তিন সহস্র অশ্ব নিয়ে গঠিত রাজকীয় পারিবারিক সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া (ঢাকার মতো নিম্নাঞ্চলে যাদেরকে কাজে লাগানো খুব কমই সম্ভব হত) এবং তাদের ভরণপোষণার্থে ব্যবহৃত জায়গীরসমূহ পুনর্গঠন বা ফেরত নেওয়া। এসব পন্থা অবলম্বন করে এবং প্রদেশের সমানুপাতিক বা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কর নির্ধারণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট পরিমাণে সফলকাম হয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে সম্রাটের দরবারে অনুগ্রহ লাভ করায় তিনি আজিম-উস-শানের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। আজিম-উস-শান তাঁর সরকারের অর্ধসংক্রান্ত বিষয়ের ওপর একরূপভাবে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের নিকট নতি স্বীকার করতে পারেন নি। ফলে যুবরাজ তাঁর শাসনকার্যের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি প্রস্তাবের প্রতি অচিরেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন। একটি অশ্বারোহী নগদী-সৈন্যদলের^১ সেনাধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহিদ মুর্শিদকুলি খানকে হত্যা করার জন্য পথে ওত পেতে থাকেন। দেওয়ান যখন যুবরাজের নিকট আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের জন্য পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন উক্ত সেনাধ্যক্ষ ও তাঁর সৈন্যদল রাজপথের ওপর দেওয়ানকে সম্ভাষণের জন্য এগিয়ে যায়; তাঁর নিকট তাঁরা অত্যন্ত অভদ্রজনোচিতভাবে তাদের বকেয়া বেতন দাবি করে এবং তাঁকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। কিন্তু মুর্শিদকুলি খান তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন এবং তিনি তাঁর সশস্ত্র রক্ষীদলের অগ্রভাগে গমন করে জোরপূর্বক রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। এখানে তিনি আজিম-উস-শানকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার করেন এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যও তিনি তাঁকে অভিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, দেওয়ান তাঁকে একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান, কিন্তু যুবরাজ তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। মুর্শিদকুলি খান স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে সম্রাটের নিকট তাঁকে অপমান করার সমুদয় বৃত্তান্ত লিখে পাঠান, এবং যুবরাজের সঙ্গে একই স্থানে থাকাটা আর কোনোক্রমেই নিরাপদ নয় বিবেচনা করে তিনি মুকসুদাবাদ বা মুর্শিদাবাদে তাঁর বাসস্থান স্থির করেন। তখন থেকেই ঐ নগরীর একরূপ নামকরণ হয়। সম্রাটের নিকট তাঁর প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজিম-উস-শানকে বিহারে প্রস্থানের নির্দেশ প্রদান করা হয়,

১ নগদ ঢাকায় বেতন প্রদান থেকে একরূপ নামকরণ করা হয়।

কিন্তু বাংলায় তাঁর উত্তরাধিকারীত্বপে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত না করায় তিনি তাঁর পুত্র ফররুখশিয়রের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। অতঃপর এই যুবরাজ শেখ কুলশ খানের শলাপরামর্শ মোতাবেক প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি তাঁর মহানুভবতা ও ন্যায়বিচারের দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খান সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক নাজিম নিযুক্ত হন, কিন্তু ফররুখশিয়রের দিষ্টির সিংহাসনে না বসা পর্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নাজিমত্বপে স্বীকৃত হন নি কিংবা ‘মুর্তিমান আল মূলক’ উপাধি নিয়ে শাসনকর্তার পদেও অভিষিক্ত হন নি। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের শাসনভার একজন নায়েব বা নাজিমের সহকারীর ওপর অর্পণ করা হয়; এবং এই সময় থেকে ঢাকা নগরী রাজধানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত প্রদেশটি সমগ্র দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। তা উত্তরে পারো পাহাড় থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড় থেকে পশ্চিমে বঙ্গের পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। “অন্যদিকে এর নায়েবাত বা শাসনকর্তার পদকে প্রথম শ্রেণীর ও নিম্নতমের অধীনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিয়োগরূপে বিবেচনা করা হত; কেননা, এই এলাকাটি ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ হিসেবে সবচেয়ে সম্পদশালী এবং রাজকীয় হিসাবের দ্বারায় নির্ধারিত রাজস্বের হার কম হওয়া সত্ত্বেও আদেশিক প্রতিনিধির পৃথক জমা-ভান্ডিকার এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ।”^১

১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মীর্জা নুৎকুতাহ নায়েব নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলি খানের এক সৌহৃদীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। তিনি একপে ডাক্তার খান উপাধি ধারণ করেন; এবং অন্যদিকে ‘মুর্শিদকুলি খান’ উপাধি মীর্জা নুৎকুতাহকে প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য সম্রাট শাহজাহানের সময় থেকে মুঘল সরকারকে বার্ষিক সামান্য কিছু উপহার-উপঢৌকম দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখছিল। এই নায়েবের আমলে উক্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করে প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই বিজয়ের পর মুর্শিদকুলি খান নায়েব পরিচিতি মীর্জা নুৎকুতাহ ভদ্রীর পুত্র সুজাউদ্দিন খান কর্তৃক ‘রুমতম জহ’ উপাধিসহ উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর নবাব সুজাউদ্দিন খানের পুত্র সরকার আল খান ঢাকার নায়েবের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে বসবাস করেন এবং দুজন সহকারী শাসনকর্তার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ঐদের একজন ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক কশকশ রায়, এবং অন্যজন ছিলেন গালিব আলী খান, যিনি আত্মীয়তা সূত্রে সরকারের রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁদের বৌধ শাসনামলে এই প্রদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় ছিল। পূর্ববর্তী নবাবের মন্ত্রী মীর হাবিব কর্তৃক যে উচ্চ ও অস্বাভাবিক কর আদায় করা হত, তা বাতিল করা হয়; নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়; কমে সময় দেশদ্বারী প্রাচুর্য ও শান্তি বিরাজ করতে থাকে। দুজন সহকারী শাসনকর্তার ঢাকার থাকাকালীন সময়ে মুরাদ আলী নওয়ারার কর্তৃত্বভার পেয়েছিলেন। একসময় তিনি সরকারের ধর্ম তত্ত্বাবধিস্থ বেগমের প্রভাবে গালিব আলীর হুলাতিবিস্ত হন। গালিবের সহকারী কশকশ রায় পরবর্তী সময়ে তাঁর দেওয়ানের পদে ইস্তফা দেওয়ার শাসনকার্য মুরাদ আলীর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় পড়ে যায়। তিনি তাঁর সহযোগী নওয়ারার পেশকার রাজকীয়তায় সঙ্গে মিশিত হয়ে অস্বাভাবিক এই জেলাকে সমৃদ্ধিশালী অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও দুঃস্থ-দুর্দশায় ফেলে দেয়।

১ ইন্ড ইতিহাস কোম্পানির বিবরণীর উপর পদ্য রিপোর্টের পরিচিতি।

দেন। আলীবর্দী খানের ডাডুপুত্র ও জামাতা শাহামৎ জঙ্গ নওয়ারিশ মোহাম্মদ খান অতঃপর
 সবফরাজ খানের স্থলে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর পূর্বাধিকারীর ন্যায় মুর্শিদাবাদে
 বসবাস করেন এবং সম্রাটের দেওয়ান ও সহকারী নাজিম এই উভয় পদে অধিষ্ঠিত থেকে
 শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ব্রিটিশের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বহুবছর যাবৎ তিনি উল্লিখিত
 পদে বহাল ছিলেন। তিনি ঢাকায় তাঁর সহকারীরূপে মুর্শিদাবাদে তাঁর মন্ত্রী হুসেন কুলি
 খানের ডাডুপুত্র হুসেনউদ্দিন খানকে নিয়োগ করেন। আলীবর্দী খান মসনদে তাঁর
 উত্তরাধিকারীরূপে তদীয় দত্তক ও দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে মনোনীত করাতে ভারী-
 উত্তরাধিকারী ও শাহামৎ জঙ্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দেয় এবং পরিশেষে ঢাকায়
 হুসেনউদ্দিন খান এবং মুর্শিদাবাদে তদীয় চাচার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বের
 পরিসমাপ্তি ঘটে। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার অভিপ্রায়ে বাকেরগঞ্জ
 জেলার ধনী জমিদারপুত্র আগা সাদেককে নিয়োগ করেন। এই ব্যক্তি হুসেনউদ্দিন খানের
 একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ গমন করেন; কিন্তু দুর্দশা
 মোচনের জন্য প্রত্যাশিত বিচারের পরিবর্তে সেখানে তিনি হুসেন কুলি খান কর্তৃক বন্দী হন।
 অতঃপর সেখানে তিনি সিরাজউদ্দৌলার একটি প্রস্তাব কার্যকর করতে প্ররোচিত হন। এই
 উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তখন তাঁর
 পিতা মহাম্মদ বাখের অবস্থান করছিলেন। নায়েব হওয়ার শর্তে তিনি তাঁর পিতাকে এই
 ষড়যন্ত্রে শরিক হতে পরামর্শ দেন। অতঃপর এই পক্ষ গভীর রাতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশপূর্বক
 হুসেনউদ্দিনকে হত্যা করে। পরদিন সকালবেলা হত্যার বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে শহরের
 অধিবাসীরা একত্র হয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে এবং আগা বাখের ও তদীয় পুত্রকে আক্রমণ করে।
 নায়েবাত (Neabut) পদে নিয়োগ লাভের সনদ প্রদর্শনের প্রয়োজন হওয়ায় আগা বাখের
 তরবারি ধারণ করে, কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাত হত্যা করা হয়। নিদারুণভাবে আহত হওয়া
 সত্ত্বেও পুত্র আগা সাদেক পলায়ন করতে সক্ষম হন। অতঃপর শাহামৎ জঙ্গ নওয়ারিশ
 নওয়ারা মহলের পেশকার রাজবল্লভকে হুসেনউদ্দিনের স্থলে সরকারের শাসনকার্য
 পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের সকল সম্পত্তি
 বাজেয়াপ্ত করা। এর মধ্য থেকে তিনি নিজে জায়গাজমির বেশিরভাগ অংশ আত্মসাৎ করেন,
 যা পরবর্তীকালে রাজনগরের অত্যন্ত মূল্যবান জমিদারিরূপে পরিগণিত হয়। রাজবল্লভ তাঁর
 শাসনকার্যের স্বল্পকালীন সময়ে দু'কোটি টাকা হস্তগত করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র
 কৃষ্ণচন্দ্র দাস এই টাকার বেশির ভাগ অংশ জেলার বাইরে পাচার করে দেয় এবং শাহামৎ
 জঙ্গের মৃত্যুর পর জগন্নাথ দর্শনের ডান করে কলকাতা পালিয়ে যায়। কৃষ্ণচন্দ্র দাস (কিসেন
 দাস) ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় লাভ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি টাকা লুকিয়ে
 রেখেছেন—এই অনুমান করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তারই সন্ধানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে
 শত্রুতা শুরু করতে প্ররোচিত হন। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে
 এবং এরই ফলে ইংরেজ সমগ্র দেশের কর্তৃত্ব লাভ করে। যশরত খান (Juseraut Khan)
 রাজবল্লভের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। এই ব্যক্তি এ জেলার সরকারি মোহরার ছিলেন এবং
 তিনি আলীবর্দী খান, সিরাজউদ্দৌলা, কাসিম আলী এবং অন্যান্যের সমগ্র শাসনামল থেকে
 শুরু করে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নায়েব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নবাব কাসিম
 আলী তাঁকে ঢাকার সকল ইংরেজকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, কিন্তু নবাবের এই বর্বরোচিত
 আদেশ পালনের পরিবর্তে তিনি উদারচিত্তে তাদেরকে আশ্রয় দান করেন এবং বিশ্বস্ত অনুচর
 দিয়ে তাদেরকে কলকাতায় প্রেরণ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ করার

প্রাকালে বেশ কিছুসংখ্যক রাজবন্দী ঢাকায় ছিলেন। এদের মধ্যে প্রধানত ছিলেন সরফরাজ খান ও হসেনকুলি খানের পরিবারবর্গের লোকজন।^১

১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ তাঁদেরকে মুক্ত করে দেন এবং তাঁদের জন্য সর্বমোট ৩৪,৭৫৫ টাকার ভাতা মঞ্জুর করেন। এই টাকার কিছু অংশ তাঁদের বংশধরদের কেউ কেউ এখনো পেয়ে থাকেন। আরবের অধিবাসী মীর মৃতজার নিকট বিয়ে দেওয়া একমাত্র কন্যার (একমাত্র সন্তানও) গর্ভজাত তিনজন দৌহিত্র রেখে যশরত খান ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসমৎ জঙ্গ সাত বছর কাল নবাব ছিলেন; আর নুসরৎ জঙ্গ ছিলেন সাঁইত্রিশ বছর। উভয়েই সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁদের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা শামসুদ্দৌলা তাঁদের উত্তরাধিকারী হন। এই নবাব ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে এবং তদীয় ভ্রাতা নুসরৎ জঙ্গের জীবনকালে মীর্জাজান তাপসের সঙ্গে একযোগে বাংলায় ব্রিটিশ সরকারকে ধ্বংস করার এবং অভ্যন্তরীণ বিপ্লব সৃষ্টি ও দেশদ্রোহিতামূলক চিঠিপত্র আদান-প্রদান ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বিহারের জমিদারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বিচারের সম্মুখীন হন। বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বন্দী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

অতঃপর ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতার মৃত্যুকালে তিনি নবাবের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরই পুত্র কমরউদ্দৌলা প্রায় তিন বছর নবাবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান নবাব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১ এই সকল বন্দীর মধ্যে একজন ছিলেন সরফরাজ খানের পুত্র আমানী খান। ইনি ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে যশরত খানকে ধৃত করার জন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং দুর্গের দখল লাভ করেন, কিন্তু জনৈক ষড়যন্ত্রকারীর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, যিনি বিষয়টি নবাবের নিকট প্রকাশ করে দেন। আবদু হাদী খান কর্তৃক মীরজাফরকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে জাফর খান সিরাজউদ্দৌলার বিধবা পত্নী লুৎফুননেসাকে এই বন্দীশালায় প্রেরণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

[নগর—বন্দর—গ্রাম—পরগনা—রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের উপায়]

ঢাকার অবস্থান

ধলেশ্বরীর সঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের প্রায় আট মাইল উপরে, বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে ঢাকা নগরী অবস্থিত। নদীটি এখানে গভীর এবং বড় বড় নৌকা চলাচলের উপযোগী। বর্ষাকালে নদীটি বেশ প্রশস্ত হয় এবং মিনার ও বৃহৎ অটালিকাশোভিত ঢাকা নগরীকে তখন পাশ্চাত্যের ভেনিসের ন্যায়, জলোখিত নগরী বলে প্রতীয়মান হয়। ঢাকার পূর্ব সীমায় শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্ন সমতল পলিমাটি অঞ্চল এবং ইতস্ততবিক্ষিপ্ত মুসলমান গোরস্থান, পরিত্যক্ত উদ্যানরাজি, মন্দির-মসজিদ ও বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু ঘরবাড়ি ইত্যাদি সমেত একটি জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ এর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সীমা নির্দেশ করে। বর্ষা মৌসুমে এ অংশের চতুষ্পার্শ্বস্থ নিম্ন সমতল ভূমি বহু ফুট গভীর পানিতে প্রাবিত হয়ে যায়; এ সময়ে ঢাকা শহর জটিল আঁকাবাঁকা খাল-নালা ও জলাভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, এবং এগুলো বুড়িগঙ্গার সঙ্গে শীতলক্ষ্যার সংযোগ সাধন করে। যে দশটি থানার এলাকা ঢাকা নগরীর অন্তর্ভুক্ত, তার আয়তন উনচল্লিশ বর্গমাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যে অংশটি নিয়ে শহরটি গঠিত, তা কেবল নদীর তীরেই সীমাবদ্ধ; এবং তীর বরাবর শহরের রাস্তাঘাট, বাজার ও গলিপথ ইত্যাদি দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে প্রায় $1\frac{3}{8}$ মাইল বিস্তৃত। শহরের অভ্যন্তরভাগ ধোলাইখালের একটি শাখা দ্বারা বিভক্ত; অধিকাংশ দেশীয় শহরগুলোর মতো এ শহরটি ইষ্টকনির্মিত দালানকোঠার পাশাপাশি কুঁড়েঘর, সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা ও গলিপথ ইত্যাদি নিয়ে অনিয়মিতভাবে গড়ে উঠেছে। এর প্রধান দুটি সড়ক প্রায় সমকোণে এসে মিলিত হয়েছে। একটি লালবাগ থেকে ধোলাইখাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দু'মাইলের উর্ধ্বে। এটি নদীর সামান্য দূরত্বে প্রায় তার সমান্তরালে প্রসারিত এবং এর থেকে বহু শাখা-সড়ক নদীতীরবর্তী ঘাটগুলো পর্যন্ত চলে গেছে। অন্য সড়কটি শহরের উত্তর দিকে ক্যান্টনমেন্ট ও শহরতলির দিক প্রসারিত। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় সোয়া মাইল এবং তুলনামূলকভাবে বেশ প্রশস্ত ও পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা অধিক নিয়মিতভাবে তৈরি। যে স্থানে এ দুটো রাস্তা সংযুক্ত হয়েছে, সেখানে ছোট বর্গাকৃতি একটি উন্মুক্ত জায়গা আছে, এবং এর কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকৃতি উদ্যান অবস্থিত। উক্ত বর্গাকার স্থানের নিকটবর্তী

এবং নদীতীর বরাবর অর্ধ-মাইলের মধ্যে ইংলিশ ফ্যাক্টরি, সেন্ট টমাস গির্জা, সরকারি স্কুল, দেশীয় হাসপাতাল এবং ইউরোপীয় অধিবাসীদের অধিকাংশ বাড়িঘর অবস্থিত।

চকবাজার

চকবাজার এলাকা শহরের পশ্চিম সীমার এবং নদীর সমান্তরালে প্রসারিত সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। এটা বেশ বড় আকারের বর্গাকৃতি স্থান এবং প্রধানত মসজিদ ও দোকানপাট দ্বারা পরিবেষ্টিত। যে উন্মুক্ত স্থানে বাজার বসে, তার চতুর্দিক একটি নিচু দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চতুষ্পার্শ্বে গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা আছে। এর কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট ভারী কামান আছে; এটি কয়েক বছর পূর্বে নদীতীরে পাওয়া গিয়েছিল। শহরের নানাদিকে অসংখ্য সড়ক রয়েছে; এগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং আঁকাবাঁকা। প্রায় দশ বছর পূর্বে মি. ওয়ান্টার যে সামান্য কয়েকটি রাস্তা প্রশস্ত করেছিলেন, শুধু সেই কয়টি রাস্তাই যানবাহন চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। সাধারণত বর্গাকার ও চকের আকারে সজ্জিত মধ্যবর্তী স্থানসমূহ বসতবাড়ি ও কুঁড়েঘর ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ এবং এগুলো সংকীর্ণ ফুটপাথ দ্বারা একটা অন্যটা থেকে পৃথক ও সাধারণভাবে জঙ্গল এবং গভীর গর্তসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত; এসব গর্ত থেকে দালানকোঠা নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাটি খনন করা হয়েছিল।

স্থাপত্য রীতি

বাংলার অন্যান্য শহরের দালানকোঠার ন্যায় এগুলোর স্থাপত্য রীতি অনেকটা একই রকম। সড়কমুখো বাড়িঘরগুলো সাধারণত খুব অপ্রশস্ত এবং এক থেকে চারতলা পর্যন্ত উচু। শহরের কয়েকটি এলাকায় কিছুসংখ্যক বিশেষ শ্রেণীর লোক বাস করে; এসব স্থান হল তাঁতিবাজার ও শাঁখারীবাজার। এ সমস্ত জায়গায় গৃহনির্মাণের জন্য জমি উচ্চহারে বিক্রি হয়ে থাকে; সেখানে বহু চারতলা দালানের সম্মুখভাগে মাত্র আট বা দশ ফুটের মতো জায়গা রয়েছে; অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেয়ালসমূহ দরজা বা জানালাহীন নিশ্চিদ্র এবং পশ্চাদদিকে বিশ গজ পর্যন্ত প্রসারিত। এসব দালানের কেবল শেষ প্রান্তগুলো ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একতলার উপরে মধ্যবর্তী স্থান একটি ছোট প্রাঙ্গণের ন্যায় খোলা রাখা হয়। ইউরোপীয় অধিবাসীগণের বাড়িগুলো বেশ বড় বড় এবং উত্তমরূপে তৈরি এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসার সময়ে এসব দালানকোঠা শহরটিকে একটি চমৎকার শোভা দান করে। এগুলোর অধিকাংশই বুদ্ধিগঙ্গার তীরে অবস্থিত; এবং এসব দালানের ছাদে উদ্যান রয়েছে। বর্ষা সমাগমে এগুলোর দেয়ালগুলো নদীবিধৌত হয়ে থাকে। শহরের আর্মেনীয় ও গ্রিক বসতি এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় ইষ্টকনির্মিত বাড়িঘর আছে, কিন্তু এসবের অধিকাংশই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

জনহিতকর পূর্ত কাজকর্ম ও প্রতিষ্ঠানাদি

শহর ও শহরতলির সাধারণ ব্যবহার্য দালানকোঠা, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহ নিম্নে উল্লিখিত হল :

(১) দশটি থানা বা পুলিশ স্টেশন। (২) শহরটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্তকারী খোলাইখাল ও এর শাখাগুলোর উপরে নির্মিত দশটি সেতু; এগুলোর একটি লৌহনির্মিত চমৎকার বুলবুল

সেতু। ১৮৩০ সালে মি. ওয়ান্টারের এখানে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সময়ে জনসাধারণের দানে এটি নির্মিত হয়েছিল। এ শহর, প্রধানত সেতুটি নির্মাণ এবং নগরের অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য ও আরাম-আয়েশের সহায়ক অন্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। (৩) ১৩টি ঘাট বা যাত্রী ওঠা-নামার স্থান। (৪) সাতটি ফেরিঘাট। (৫) ১২টি বাজার—যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ দৈনিক বিক্রয় হয়। (৬) তিনটি ইদারা বা কূপ। (৭) ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি। (৮) জজের কাছারি। (৯) কালেক্টরের কাছারি। (১০) রাজস্ব বিষয়ক কমিশনারের কাছারি। (১১) মুন্সেফ কাছারি ও (১২) ডাকঘর। নিম্নলিখিত স্থানের সঙ্গে ডাক যোগাযোগের জন্য এখানে শাখা আছে—যথা, কলকাতা, চট্টগ্রাম ও আরাকান; ময়মনসিংহ, জামালপুর ও আসাম; সিলেট; চেরাপুঞ্জি ও বরিশাল। (১৩) কোতোয়ালি থানা। (১৪) জেলখানা। (১৫) জেল হাসপাতাল। (১৬) পাগলাগারদ। (১৭) দেশীয় হাসপাতাল। (১৮) টিকাদান প্রতিষ্ঠান। (১৯) দাতব্য তহবিল। (২০) সেন্ট টমাসের গির্জা। (২১) ব্যাপটিষ্ট মিশন সভাগৃহ। (২২) রোমান ক্যাথলিক গির্জা। (২৩) আর্মেনীয় গির্জা। (২৪) গ্রিক গির্জা। (২৫) হিন্দুদের একশত উনিশটি মন্দির। (২৬) সরকারি স্কুল। (২৭) এগারটি ব্যাপটিষ্ট মিশন স্কুল। (২৮) চৌদ্দটি হিন্দু ও মুসলিম স্কুল। (২৯) মুসলমানদের একশত আশিটি মসজিদ। (৩০) কনজারভেসি বা সংরক্ষণ বিভাগ। (৩১) ইংরেজ, আর্মেনীয় ও গ্রিকদের সমাধিক্ষেত্রসমূহ। (৩২) শাসনকার্য পরিচালকের দপ্তর। (৩৩) সেনাবাহিনীর রসদপত্র যোগানোর দপ্তর। (৩৪) মিলিটারি অরফান স্টেশন কমিটি। (৩৫) দেশীয় পদাতিক বাহিনীর একটি রেজিমেন্ট ও গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বা সামরিক ছাউনি। (৩৬) হস্তীশালা।

মুসলমানদের উপাসনার স্থান

মুসলমানদের প্রধান প্রধান উপাসনার স্থান হল ঈদগাহ ও হসেনী দালান। ঈদ-উৎসব পালন করার সময় যুবরাজ সুজা ও তদীয় অসংখ্য অনুচরবর্গের প্রার্থনার স্থান সংকুলানের জন্য ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুজার পারিবারিক বিষয়ক দেওয়ান মীর আবুল কাশিম কর্তৃক ঈদগাহটি নির্মিত হয়।

পরবর্তী (হসেনী দালান) মীর মুরাদ নামক জনৈক ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ইনি সুলতান মোহাম্মদ আজিমের আমলে নওয়ারাহ মহলের দারোগা পদে এবং জনপূর্ত বিষয়ক কার্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। হসেনী দালান সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, মীর মুরাদ স্বপ্নযোগে ইমাম হসেনকে একটি ‘তাজিয়া কান্না’ বা শোক-গৃহ উত্তোলন করতে দেখেন; ফলে তিনি বর্তমান অটালিকাটি গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন, এবং এর নামকরণ করেন হসেনী দালান। মহররমের সময় উক্ত দালানের আলোকসজ্জা ও পবিত্রপর্ব উপলক্ষে গরিবদের খাওয়ানো ইত্যাদির ব্যয়ভার তিনি নির্বাহ করতেন। তৎকালে তাঁর দ্বারা এজন্য যে ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল, প্রদেশের পরবর্তী শাসনকর্তাগণ তা অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে সরকার এই একই উদ্দেশ্যে নবাবকে বার্ষিক ২,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

হিন্দুদের প্রধান উপাসনার স্থান

ঢাকেশ্বরী মন্দির হিন্দুদের প্রধান পূজাস্থান; এটি চকের প্রায় দু’মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এ মন্দিরটি বল্লাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত আছে; কিন্তু তাঁর নির্মিত মূল অটালিকার

কোনো চিহ্ন আজ আর বিদ্যমান নেই। এ স্থানটি একজন নবাবের কার্যে নিযুক্ত জনৈক হিন্দু কর্মচারীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, এবং কথিত আছে, বর্তমান মন্দিরটি প্রায় ১০০ বছর পূর্বে কোম্পানির কমার্শিয়াল ফ্যাক্টরিতে কার্যরত জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

ঢাকা শব্দের উৎপত্তি

কেউ কেউ অনুমান করেন যে, ঢাকা শব্দটির উৎপত্তি ঢাক নামক একটি বৃক্ষ থেকে, যা এখানে প্রচুর জন্মে। আবার কেউ কেউ ঢাকা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন, যার অর্থ “আবৃত” বা ঢাকা, যে নামে বঙ্গাল সেনা দুর্গার সম্মানে তাঁর নির্মিত মন্দিরটিকে আখ্যায়িত করেন। যদিও আইন-ই-আকবরী-তে ঢাকার কথা উল্লিখিত হয় নি, তথাপি স্থানীয়দের বক্তব্য অনুসারে এ শহরটি মুঘল বিজয়ের পূর্বেই বেশ বিস্তৃত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। জনশ্রুতি এই যে, এ শহরে প্রথমে “৫২টি বাড়ার ও ৫৩টি সভক” ছিল। এবং এ অবস্থা থেকে শহরটি একটি দীর্ঘ ও কিছুটা অসুবিধাজনক নাম “বায়ান্ন বাজার তেগ্নান্ন গলি” রূপে অভিহিত হয়। এগুলোর একটি ‘বাংলা বাজার’ নামে অভিহিত এবং এখানে তা বিদ্যমান; এবং আমার বিশ্বাস এটি বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রাচীনতম কেন্দ্ররূপে সারা দেশব্যাপী পরিচিত। এটা উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র বোড়শ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে ‘বাংলা শহর’ নামে একটি শহর ছিল বলে প্রায়শই ইউরোপীয় পর্যটকগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে দৃশ্যত ঢাকার অবস্থান স্থান পেয়েছে। রেনেল সাহেব এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “কিছুসংখ্যক পুস্তক ও ম্যাপে আমরা ‘বাঙালা’ নামে অভিহিত যে একটি বড় ধরনের শহরের সাক্ষ্য লাভ করি, বর্তমানে তার কোনো চিহ্ন বিদ্যমান নেই। এটি গঙ্গার পূর্বদিকস্থ সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং আমার অনুমান এই যে, এর অবস্থান পরবর্তী সময়ে নদীতে গ্রাস করে ফেলেছে। সম্ভবত বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাঙালা শহরের অস্তিত্ব বজায় ছিল।” এটা অসম্ভব নয় যে, “বায়ান্ন বাজার, তেগ্নান্ন গলি” নামের যে শহরটি ছিল, তারই উল্লেখ এখানে পরোক্ষভাবে করা হয়েছে এবং যে ‘বাঙালা’ নামটি দ্বারা এ শহরের অসংখ্য বাজারের মধ্যে অন্তত একটি পরিচিত ছিল, সমগ্র শহরটিকে বোঝাতে ইউরোপীয়গণ সেটাকেই ব্যবহার করেছেন। এটা সম্ভবত তারা এ জন্য করেছেন যে, সারা শহরের মধ্যে উক্ত বাজারটি এমন একটি স্থানে অবস্থিত ছিল প্রধানত যেখান থেকে তৎকালে বিদেশীয়দের সঙ্গে সর্বকম ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হত। ঢাকা ও বাঙালার অভিন্নতা ধারণা করার পক্ষে যা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, তা হল এই যে, একই পর্যটক কর্তৃক এগুলোর একটি নামেরই বরাবর উল্লেখ। বাংলার প্রধান প্রধান শহর নিরূপণ করতে গিয়ে, মেতোড দৃষ্টান্তরূপ রাজমহল ও বাঙালার উল্লেখ করেন এবং এগুলোকে “পরীর শহর” বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে পরিভ্রমণরত হার্বাট ও মনডেলসো ঢাকা ও রাজমহলের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন, কিন্তু বাঙালা শহরের কোনো উল্লেখ করেন নি।

এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ শহরটি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার কথাও এদেশের কোনো কিংবদন্তি বা জনশ্রুতিতে পাওয়া যায় না। স্থানীয়রা, যারা এ জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্থানগুলোর অবস্থান, এবং নদীর ভাঙনের ফলে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে সুপরিচিত, তারা এভাবে শ্রীপুর ও কাটাশুর নামে দুটি শহরের উল্লেখ করে থাকেন, কিন্তু বাঙালা শহরের অস্তিত্বের কথা, তারা কখনো শোনে নি। এ অবস্থা থেকে অনুমান হয়

যে, “বায়ান্ন বাজার, তেগ্নান্ন গলি” বা ঢাকার পরিবর্তে বিদেশী বণিকগণ কর্তৃক প্রথমে ঐ নামটি ব্যবহৃত হত, যার পরবর্তী নাম সম্ভবত ঢাকেশ্বরীর সন্নিকটে শহরের পশ্চিমাংশের প্রতিই শুধু প্রযোজ্য ছিল।

ভার্খমা কর্তৃক বাংলার বর্ণনা

১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে ভার্খমা কর্তৃক বাংলা এমন একটি স্থান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যা উর্বরতা ও সকল প্রকার প্রাচুর্যে পৃথিবীর যে কোনো শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। তিনি আরো বলেন, “এলাকাটি সমস্ত রকম জিনিসপত্রে এত প্রাচুর্যমণ্ডিত যে, সেখানে মানুষের নিত্যব্যবহার্য বা বিলাস ব্যসনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্যেরই অভাব নেই; কেননা, সেখানে একই রকমভাবে সর্বপ্রকার পশুপাখি, বলকারক ফলমূল, এবং প্রচুর শস্যপাতি ও সকল রকম মসলা দ্রব্য অত্যন্ত সুলভ। অনুরূপভাবে সুতি, মিশ্রিত পশমি ও রেশমি বস্ত্রাদির প্রাচুর্য এত ব্যাপক যে, আমার মনে হয় এ সমস্ত জিনিসের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর সমকক্ষ অন্য কোনো দেশ নাই।”

আটিয়া পরগনার অন্তর্গত শ্রীপুরে আফগানদেরকে পরাজিত করার পর রাজা মানসিংহ ঢাকেশ্বরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ শহরের সেই অংশে ঢাকায় তাঁবু স্থাপন করেন, এবং কিছুকাল এখান থেকে সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করেন বলে জানা যায়; উক্ত স্থান উর্দু নামে পরিচিত। ১৬০৮ এবং ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় না-আসা পর্যন্ত ঢাকা কোনোরূপ রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে পরিগণিত হয় নি। এ সময়ের পূর্বে, সোনারগঞ্জ ছিল মুঘলদের প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার কেন্দ্র, কিন্তু আফগান ও মগদের আক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্যে সুবাদার ইসলাম খান রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন। তিনি এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং আকবরের আমলে স্থাপিত নওয়ারাহ বা নৌবহর ও গোলন্দাজ সেনাদলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন; এবং দিল্লীশ্বরের সম্মানার্থে স্থানের নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর^১ নামকরণ করেন। উল্লিখিত দুর্গটি বর্তমান জেলখানা এবং পার্শ্ববর্তী হাসপাতাল ও এর মধ্যকার দেয়ালবেষ্টিত অংশ, নবাবের প্রাসাদ ও উদ্যানরাজি, বিচারালয় ও টাকশাল প্রভৃতি এলাকাসমূহের উপর স্থাপিত ছিল। বর্তমানে এর কোনো চিহ্নই বিদ্যমান নেই। পরবর্তী শাসনকর্তাগণ কর্তৃক নির্মিত এবং বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান প্রধান জনহিতকর দালানকোঠা হচ্ছে বড় কাটরা ও লালবাগ প্রাসাদ। পূর্বোক্তটি ১৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মহাম্মদ সুজার আদেশে নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি চকের সম্মুখভাগে লালবাগের প্রায় অর্ধমাইল পূর্বদিকে অবস্থিত, এবং চক ও বুড়িগঙ্গার মধ্যবর্তী বেশ কিছু পরিমাণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বুড়িগঙ্গার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্গের বিস্তীর্ণ সম্মুখভাগ রয়েছে; এতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশপথসহ একটি বিরাট কেন্দ্রীয় দরজা বিদ্যমান, এবং মূল অট্টালিকার উপরে বেশ কিছুটা উঁচু দুটি অষ্টভুজ বুরুজ আছে। পূর্বে কাটরার সম্মুখভাগে অত্যন্ত বৃহৎ দুটি কামান ছিল; এ দুটি কামান মীরজুমলার আমলে তৈরি হয়েছিল এবং উক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল বলে কথিত হয়। এ দুটির একটি (দুটির মধ্যে বড়টি) নদীর মধ্যস্থলে ছোট দ্বীপের ওপর রাখা হয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে এটি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। অন্যটি যা সোয়ারীঘাটে, বা নবাবের অবতরণ স্থানে অবস্থিত ছিল, তা ১৮২৮ সালে চকের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ এর

১ গ্রাডউইনের মতে, একে জাহাঙ্গীরাবাদ বলা হত। গ্রাডউইনকৃত লাইফ অব জাহাঙ্গীর দ্রষ্টব্য।

বর্তমান স্থানে টেনে আনা হয়। কামানটি পেটা লোহায় নির্মিত, এবং এর ওজন ৬৪.৮১৪ পাউন্ড।

লালবাগ

লালবাগস্থ প্রাসাদটির নির্মাণকার্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহাম্মদ আজিম ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে শুরু করেন, এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় তদীয় স্থলাভিষিক্ত শাসনকর্তা আমীর-আল-ওমরাহ্ শায়েস্তা খানের নিকট রেখে যান। এটি চতুর্ভুজকৃতি (চতুষ্কোণী) করে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং কয়েক বিঘা পরিমাণ জায়গা বেষ্টন করেছিল। অট্টালিকাটি প্রথমে বুড়িগঙ্গার পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে নদী ও এর মাঝে একটি মধ্যবর্তী জায়গা পরিলক্ষিত হয়, যা কুঁড়েঘর ও বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, এবং এ অংশ থেকে অট্টালিকার দৃশ্য অবলোকনে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেয়ালগুলো এবং নদীর দিকস্থ উচ্চ সমতল ছাদ ও গুলি চালনার জন্য অট্টালিকার উপরিভাগে নির্মিত বিরাট বিরাট ফোকর বেশ সুস্পষ্ট; নদীর দিক থেকে এর একটি অধিপত্যসূচক গাঙ্গীর্ষ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কয়েকটি প্রবেশদ্বারসহ বর্তমানে দুর্গের এ সর্বত্র বহির্প্রতিরোধ ব্যবস্থা, দরবার কক্ষ এবং হাম্মামখানা ইত্যাদিই কেবল প্রাসাদের একমাত্র দৃশ্যযোগ্য অবশিষ্টাংশ।

যদিও অট্টালিকাটি অধুনা শোচনীয় জীর্ণাবস্থায় পতিত, এবং দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তথাপি এখনো এসব অবশিষ্টাংশ থেকে প্রতীয়মান হয়, কত ব্যাপক ও বিপুল জাঁকজমকে সঙ্গে প্রথমে এ রাজকীয় আবাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সম্ভবত শায়েস্তা খান এ সৌধের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন নি। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে টাভার্নিয়ার যখন ঢাকা পরিভ্রমণে আসেন, তখন তিনি নবাবকে উক্ত অট্টালিকার প্রাক্কনস্থিত অস্থায়ী একটি কাঠের দালানে বসবাস করতে দেখেন। শায়েস্তা খান পরবর্তীকালে প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগে সুলতান মহাম্মদ আজিমের স্ত্রী ও তদীয় কন্যা বিবি পরীর স্বরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এ সৌধের অভ্যন্তরভাগের সমাধি স্থানটি মার্বেল ও চুনাপাথরের তৈরি, এবং একটি চমৎকার গম্বুজ দ্বারা অলংকৃত; এর চতুষ্পার্শ্বস্থ পথটি রঙিন পাথরের কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত ও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। ফোয়ারায় পানি সরবরাহকারী পাকা নালাসহ এর অধিকাংশ সাজসজ্জাসমূহ অবশ্য বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা হচ্ছে ছোট কাটরা, পোস্তুগোলা ভবন ও শহরের বিভিন্ন অংশে নির্মিত কয়েকটি মসজিদ। এর প্রথমটি ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত হয়, এবং এখনো এটি তাঁর বংশধরগণের সম্পত্তি। পোস্তুগোলা ভবনের বেশিরভাগ অংশ বিগত বিশ বছরে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে, এবং বর্তমানে এর সামান্য একটি অংশ মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। এটা সম্ভবত যুবরাজ আজিম-উস-শান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং তিনি এখানে বসবাস করতেন; উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজিম-উস-শানের এখানে বসবাসকালে মুর্শিদকুলি খান যখন তাঁর দর্শনার্থী হয়ে পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন আবদুল ওয়াহিদ কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। শেষ শাসনকর্তা ও শেষ মুঘল যুবরাজ ছিলেন ফররুখশিয়ার। তিনি ছিলেন একমাত্র মুঘল যুবরাজ; যিনি শেষবারের মতো ঢাকায় আগমন করেছিলেন এবং উক্ত প্রাসাদে বসবাস করেছিলেন। তিনি এরই সন্নিকটে ও লালবাগের দেয়ালের পার্শ্বে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন, যার একমাত্র দেয়ালগুলোই এখন কালের সাক্ষী হয়ে বিরাজ করছে। শায়েস্তা খান ও মুর্শিদকুলি খানের নির্মিত অন্য কয়েকটি বড় বড় মসজিদ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায়। নদীর অপর তীরে,

দুর্গপরিখাবেষ্টিত একটি পুরোনো অটালিকা রয়েছে; এটি নবাব ইব্রাহীম খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে কথিত হয়। শহরের চতুর্দিক অঞ্চলে কয়েকটি সেতু, গোপন হাফাযখানা ও কূপ ইত্যাদির সন্ধান মেলে। সেতুগুলোর মধ্যে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত হাজীগঞ্জের দুর্গ ও ব্রহ্মপুত্রের দিকে যাবার পথে পুরোনো সামরিক সড়কগুলোর উপর নির্মিত—গাঙ্গা পুল ও টঙ্গি সেতুই প্রধান। বিশেষত এর প্রথমটি যথেষ্ট বিষয়াবিস্তৃতিতে দেখা হয়। এটা বর্তমানে ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয়েছে।

ইংলিশ ফ্যাক্টরি

সম্ভবত বিলেতে ভারতীয় মসলিনের প্রথম আমদানি হওয়ার প্রাকালে, ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এখানে ইংলিশ ফ্যাক্টরি নির্মাণ করা হয়েছিল। টাভার্নিশার একসময়ে পরোক্ষভাবে উক্ত কারখানার কথা বলেন, এবং এর অধ্যক্ষের নামোল্লেখ করেন। এ অটালিকার কেন্দ্রস্থল কিছুকালের জন্য কাছারিরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু ধ্বংসাবশ্যে পতিত হওয়ায়, এটি প্রায় দশ বছর পূর্বে ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমানে উক্ত অটালিকার ধ্বংসাবশেষরূপে একমাত্র বহির্দেয়ালটি বিদ্যমান আছে।

ফরাসি ফ্যাক্টরি

ফরাসি ফ্যাক্টরি ছিল নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিরাট অটালিকা। সম্প্রতি এর সংরক্ষণ-সাধন করে একে একটি আবাসগৃহে পরিণত করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে একজন স্থানীয় ভদ্রলোক বসবাস করছেন। ভিটি বা একটি উচ্চ সমতল স্থান ছাড়া অন্যত্র কারখানার কোনো অস্তিত্বই এখন আর বিদ্যমান নেই।

মুঘল সরকারের আমলে পুলিশ-ব্যবস্থা

মুঘল সরকারের আমলে শহরটি একজন কৌজদার ও ছ'জন আমিনের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এসব কর্মচারীসহ ৮০ জন মিয়ন ও পাইক, ৫০ জন অশ্বারোহী ও বরকন্দাজ নিয়োজিত ছিল। ৫২টি ছাকুয়া বা ছাপড়া (এর কয়েকটি বর্তমানে খালি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) তাদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল এবং প্রধানত চুমি-মসলীন (জায়গীর) মাধ্যমে এদেরকে বেতন দেওয়া হত। আদালত ও কৌজদারি কোর্ট ছাড়াও, 'ইন্তিসাব' নামে অভিহিত একজন রাজকর্মচারী ছিলেন। শহরে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ব্রিটেনের কোনো কোনো অংশে প্রচলিত 'ডীন অব্ ট্রিড' বা সমাজ-অধ্যক্ষের ন্যায় তিনি ওজন ও পরিমাপ ইত্যাদির তদারক করতেন। বিভিন্ন বাজার এলাকায় সংঘটিত বিবাদের মীমাংসা করতেন, এবং জরিমানা ইত্যাদি ধার্য করতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অপরাধীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করতেন। নবাব এবং দেওয়ান ছাড়াও অন্যান্য রাজকর্মচারী ছিলেন কাজী, কাননগৌ ও ওয়াকানগর; শেখোক্ত অর্থাৎ ওয়াকানগরের পারিভূ ছিল নায়েবাতের (Neabut) সরকারি বিভাগসমূহে যা কিছু ঘটছে সে সম্বন্ধে প্রত্যাহ সম্মানের নিকট খবরাখবর প্রদান করা, এবং রাজধানীতে সরকারি সংবাদপত্র প্রেরণ ও চিঠিপত্র আদান-প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা।

सर्वकारि सहायन विज्ञानमन्दिर

সরকারি সংস্থার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এই নীতিগুলি প্রণীত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত কর্মসূচি অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। এই নীতিগুলি প্রণীত করার সময় সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমেই এই নীতিগুলি প্রণীত করা হয়েছে।

माहितीकरण

[illegible]

বিক্রমপুর

বিক্রমপুর পরগনা শহরের প্রায় বার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্বে ইছামতী ও মেঘনা, পশ্চিম দিকে গঙ্গা, দক্ষিণে কীর্তিনাশা এং উত্তরে পরগনা জামালপুর—এর সীমা নির্দেশ করে। এটি জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্বরা ভূভাগ। এখানে ধান-চাউল, চিনি, তুলা, জাফরান, পান-সুপারি, নারকেল, লেবু ও নানা ধরনের ফলমূল এবং শাকসবজি প্রচুর জন্মে। এসব দ্রব্য প্রধানত শহরের বাজারগুলোতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পূর্বদিকে, এ ভূভাগের বৃহত্তর অংশ কৃত্রিমভাবে উঁচু করা ভূমি নিয়ে গঠিত ও নিবিড় ঘন উদ্যানরাজিতে আচ্ছাদিত এবং সংকীর্ণ খাল-নালা ও পুকুর ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। অপরপক্ষে, এর পশ্চিম দিকটিতে ভূমিভাগ নিম্ন। এখানে প্রায় ১৫ মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটি জলাভূমি রয়েছে; এটি নলখাগড়ায় পরিপূর্ণ এবং সারা বছরব্যাপী আংশিকভাবে জলমগ্ন থাকে। এ এলাকা খুবই জনবহুল, এবং প্রায়শই হিন্দু অধিবাসী অধ্যুষিত; এদের আবার অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। বঙ্গজ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী এবং বাংলার রাজন্যবর্গের বসবাসের স্থান হিসেবে বিক্রমপুর, বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে মুসলমানগণ কর্তৃক তাদের উচ্ছেদ সাধন কাল পর্যন্ত খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। যে স্থানটিতে হিন্দু রাজারা বসবাস করতেন, হিন্দু অধিবাসীগণ এখনো সে স্থানটি দেখিয়ে দেয়। উক্ত স্থানটি রামপাল নামে পরিচিত এবং ইছামতী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে ও ফিরিঙ্গি বাজারের কিছুটা পশ্চিমে অবস্থিত। বল্লাল বাড়ির অবস্থান (বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ) স্থানে চতুষ্কোণাকৃতি একটি মাটির টিপি পরিলক্ষিত হয়। এর আয়তন প্রায় ৩,০০০ বর্গফুট, এবং এর পূর্বদিকে প্রধান ভূমির সঙ্গে সংযোগ সাধনকারী একটি রাস্তা বা বাঁধসহ প্রায় ২০০ ফুট প্রশস্ত দুর্গ-পরিখা দ্বারা এর চতুর্দিক পরিবেষ্টিত।^১ এই বেটন করা জায়গার কোথাও অটালিকার কোনো চিহ্নই বিদ্যমান নেই, কিন্তু এর সন্নিহিত অঞ্চলে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামাঞ্চলের বহু মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অসংখ্য ইটের পাজা বা টিপি এবং উপরিভাগের নিম্নে মাটির অনেক গভীরে দেয়ালসমূহের ভিত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সকল স্থান দূর অতীতে অটালিকা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য উপকরণাদি সরবরাহ করত। বল্লাল বাড়ির সন্নিহিতে ‘অগ্নিকুণ্ড’ নামে অভিহিত বিরাট একটি গহ্বর পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে যে, বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা এবং তদীয় পরিবারবর্গ মুসলমানদের আগমন সংবাদে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। কিংবদন্তি এই যে, রাজা তাঁর রাজ্য-আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করার জন্য বের হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে একটি সংবাদবাহক কবুতর সঙ্গে করে নিয়ে যান। রাজপ্রাসাদে পরিবারের লোকজনদের নিকট কবুতরটির ফিরে আসার অর্থ ছিল রাজার পরাজয়ের দুঃসংবাদ, সুতরাং আত্মহত্যা করার সংকেত। সম্ভবত রাজা জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি যখন সারা দিনের যুদ্ধের ক্লান্তি শেষে নদী থেকে জলপান করার জন্য ঝুঁকে পড়েন, তখন তাঁর পোশাকের গোপন স্থান থেকে পাখিটি পলায়ন করে এবং তার নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে উড়ে যায়। রাজা দ্রুত গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু তখন এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিণতি এড়াবার পক্ষে খুব বিলম্ব ঘটে গেছে। পরিবারবর্গের জ্বলন্ত চিতার অগ্নি-ধূম তখনো নির্গত হচ্ছিল; রাজা তাতে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। এভাবে ভারতবর্ষের এ অংশে হিন্দু রাজাদের শেষবংশের রাজত্বের অবসান হয়ে যায়।

১ কয়েক বছর পূর্বে এখানে একজন রায়ত হাল চাষের সময় ৭০,০০০ (৭০০০ পাউন্ড) টাকা মূল্যের একটি হীরকখণ্ড পেয়েছিল : পরে এ নিয়ে প্রাদেশিক আপিলকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

রাজনগর

উর্বরতা শক্তি ও লোকসংখ্যার দিক থেকে বিক্রমপুরের পরেই এ পরগনার স্থান। এটি মেঘনা ও গঙ্গার মূল শাখার মধ্যবর্তী স্থানে ও কীর্তিনাশার দক্ষিণে অবস্থিত। বিক্রমপুরের পূর্বাংশ অপেক্ষা এই অঞ্চল অধিক নিম্নসমতল ভূমির পর্যায়ভুক্ত এবং বিগত ষাট বছরে বহুবার কীর্তিনাশার প্রবল ভাঙনের মুখে পড়ে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর নদীগর্ভে কয়েকটি বিস্তীর্ণ পলল ভূভাগ বা চর জেগে উঠেছে, যা বর্তমান সরকারের দখলে আছে। এখানকার প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাল, সুপারি, নারকেল, চিনি, নীল, তিল, তিসি, সরিষা বীজ, খেসারি ও মুগডাল ইত্যাদি। এই অঞ্চল বর্ষার সাধারণ মৌসুমের সময় এখানকার নদীনালাগুলো থেকে অধিক অভ্যন্তরস্থ ভূমিভাগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গভীর পানিতে প্রাবিত হয়ে থাকে। এ অঞ্চল সাধারণত দক্ষিণা প্রবল বায়ুপ্রবাহের ফলে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা মে ও জুন মাসের মাঝারি ধরনের ঝড়-বৃষ্টির দ্বারা জলমগ্ন হয়ে পড়ে; এবং সমস্ত শস্যপাতি, বিশেষত নীলের চারা একরূপভাবে প্রায়শই বর্ষাকালের প্রারম্ভে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দেশের এ অংশ ১৭৮৭ সালের বিরাট প্রাবনের সময় ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। রাজনগরে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান বসবাস করে এবং এর হিন্দু অধিবাসীদের অধিকাংশই বৈদ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের দেওয়ান নায়েব নওয়াজিস্‌ খানের সহকারী রাজা রাজবল্লভের বিস্তীর্ণ ও মূল্যবান জমিদারির একটা অংশ ছিল এ পরগনা। উক্ত জমিদারি প্রথমে ৪০০ তালুক নিয়ে গঠিত ছিল, এবং ১৭৯০ সালে প্রায় তিন লাখ টাকার মতো খাজনা সরকারকে প্রদান করত। এর দুই-তৃতীয়াংশ আসত তালুকগুলো থেকে, এবং বাদবাকি তৃতীয়াংশ আসত জমিদারের দখলীভূত 'নিজ' সম্পত্তি থেকে। জমিদারিটি পরবর্তী সময়ে রাজা রাজবল্লভের পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় ও একটি পারিবারিক আত্মকলহের সূত্রপাত ঘটায়। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত জেলার রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের নিকট একটি বিরাট দুর্ভোগের উৎসরূপে পরিগণিত ছিল। রাজা রাজবল্লভের বংশধরগণের বসতিস্থান রাজনগর গ্রামটি ঐ নামের একটি ছোট নদীর তীরে, মলফংগঞ্জ থানার অদূরে অবস্থিত। এখানে উচ্চ চূড়াসমেত অত্যন্ত চমৎকার দুটি মঠ আছে এবং কয়েকটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে রাজার বাসস্থান ছিল। প্রধান মঠটি রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং অন্যটি তৈরি হয় তদীয় জনৈক পুত্র কর্তৃক ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।

কার্তিকপুর

এ স্থান রাজনগরের দক্ষিণে অবস্থিত বাকেরগঞ্জ জেলার পার্শ্ববর্তী একটি পরগনা। এর গঠনবৈচিত্র্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের দিক থেকে এটি রাজনগরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে এর বর্ণনাদানের প্রয়োজন নেই।

সোনারগঞ্জ

জেলার উত্তরাংশে শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বেশ বড় আকারের একটি পরগনা। এর কৃষিজাত দ্রব্যগুলো হচ্ছে চাল, তুলা, হলুদ, আদা, সুপারি ও পান। এ অঞ্চলের পানের বেশ খ্যাতি আছে। পাইনাম, লাক্সলবন্দ, বাকুধী, কাদুয়া ও মোড়াপাড়া এখানকার প্রধান প্রধান গ্রাম। দেশের এ অংশের প্রথম দিককার মুসলমান শাসনকর্তাদের শাসিত

হাবিলী সোনারগঞ্জের প্রাচীন শহর পাইনাম। ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী থেকে প্রায় দুই মাইল অভ্যন্তরে এ স্থানটি অবস্থিত। গুবাক তরুণ সারি, তেঁতুল গাছ, আম্রতৃষ্ণ ও অনা বহু বৃক্ষলতা এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য ঘনসন্নিবেশিত বাঁশবন ইত্যাদি গ্রামটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলেছে। এর অভ্যন্তর সন্নিবন্ধে অর্থাৎ কয়েক গজের মধ্যে না আসা পর্যন্ত গ্রামের অভ্যন্তরভাগের কোনো কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বরষার দিনে অঁকবাঁক সংকীর্ণ পায়ে চলা পথে এ নিভৃত পল্লীতে গমন করা চলে, কিন্তু বর্ষার দিনে এটা আংশিকভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তখন ছোট ছোট নৌকা কিংবা হাতি অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়া ছাড়া এখানে প্রবেশ করা প্রায় সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য। বর্ষার দিনে পাইনাম গ্রাম অসংখ্য বদ্ধ খাল-নালা ও পুকুর-পুষ্করিণীতে পরিবেষ্টিত থাকে এবং প্রচুর বর্ধনশীল ঘাস ও অন্যান্য লতাপাতায় দারুণভাবে ছেয়ে যায়। এখানকার অসংখ্য বৃক্ষবৃদ্ধির নিবিড় পত্রপল্লবগুলি সূর্যালোক ঠেকিয়ে রাখে; এ সময়ে গ্রামটি সবচেয়ে বিষণ্ণরূপ ধারণ করে; এর অধিবাসীগণের রুগ্ন কৃশ চেহারা তাদের পরিবেশের প্রতিফলন পবিত্রকৃত হয়ে থাকে। ফলে, জেলার সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলোর মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এ গ্রামটি খড়ের ঘর ও ইটের তৈরি দু'তিন তলা উঁচু কোঠার দুটো সারি বা গলি নিয়ে গঠিত। এর চতুর্দিশে গভীর কর্দমাক্ত ও বদ্ধ খাল-নালা বিদ্যমান, যা পূর্বে এর প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গ-পরিখা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এই গহবরের একটি পুরোনো সেতুর উপর নগরের তোরণদ্বারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তৎকালে যখন বর্তমান সময় অপেক্ষা সেখানে অধিক ধনসম্পদ ছিল, তখন রাত্রিবেলা উক্ত প্রবেশদ্বারটি বন্ধ রাখা হত, এবং পরের দিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই শহরে প্রবেশ করতে কিংবা শহর হতে বের হতে দেওয়া হত না। পাইনামের অতি সন্নিবন্ধে কয়েকটি মসজিদ ও অট্টালিকা ধ্বংসাবস্থায় পড়ে রয়েছে। এগুলো সম্ভবত প্রথম দিককার মুসলমান শাসনকর্তাগণের বাসস্থান ছিল। পাইনাম থেকে একাধিক মাইল দূরবর্তী না হলেও বাঘ ও নেকড়ে বাঘে পরিপূর্ণ গভীর বনজঙ্গল থাকায় এ স্থানটি প্রায় দুর্গম, এবং হস্তীপৃষ্ঠে ছাড়া এসব স্থানে গমন করা কারো পক্ষে নিরাপদ নয়। আমার ওখানে যাওয়ার কোনো সুযোগ হয় নি, তথাপি আমি নিঃসন্দেহ যে, সেখানে ঐতিহাসিক অট্টালিকা বা তার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ড. বি. হ্যামিলটন যখন কয়েক বছর পূর্বে দেশের এ অংশে পরিভ্রমণে যান, তখন সেখানকার লোকেরা তাকে জানায় যে, প্রাচীন সোনারগঞ্জ কবেই নদীতে ভেঙে নিয়ে গেছে, অধিকন্তু এ স্থানটি মেঘনা নদীর অপর তীরে অবস্থিত ছিল। এটা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। সোনারগঞ্জের চতুর্দিশে কখনো নদীর কোনো তটন দেখা দেয় নি, বরং অপরপক্ষে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী ভরাট হয়ে গিয়ে ভূমিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রথমে ঐ নদীর প্রধান শাখারূপে বিদ্যমান ছিল। মেঘনা নদীর অপর তীরে অবস্থিত ছিল শ্রীপুর, সোনারগঞ্জ নয়। উক্ত শ্রীপুর শহর বিক্রমপুরের অধীন ছিল, এবং কালে তা কীর্তিনাশা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থানরূপে কিংবা বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রধান শহর হিসেবে পূর্বে সোনারগঞ্জের যে গুরুত্বই থাকুক না কেন, ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কিচ কর্তৃক এর সমস্তে প্রদত্ত বর্ণনা থেকে কখনো প্রতীয়মান হয় না যে, স্থাপত্য বিষয়ক ঐশ্বর্যের জন্য এর কোনোরূপ মিথ্যা দাবি ছিল; বরং এটাই হতে পারে যে, এমনকি, সামান্য ইটের বাড়িঘর, বা পাইনামের বুকে দাঁড়িয়ে আছে, তাও হয়তো কোম্পানি কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য পড়ে তোলার পরবর্তী কোনো এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল। উক্ত পৃষ্ঠিক বলেন, “সোনারগাঁও শহরটি শ্রীপুর থেকে ছ'লীগ দূরবর্তী; ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি এখানে তৈরি হয়। ভারতের প্রায় অন্য সকল

অঞ্চলের ন্যায় এখানকার বাড়িগুলো অত্যন্ত ছোট ছোট এবং খড়ের ছাওয়া; বাঘ ও খৈকশিয়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিছু মাদুর দিয়ে দেওয়াল ও দরজাগুলো চতুর্দিক আবদ্ধ করে রাখা হয়। লোকদের অনেকেই অত্যন্ত সম্পদশালী। এখানে তারা কোনোরূপ মাংস ভক্ষণ করে না কিংবা জীবজন্তু হত্যা করে না। এরা ভাত, দুধ ও ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। এদের হাতের কাছে রক্ষিত সামান্য কাপড়চোপড় নিয়েই এরা ঘরের বাইরে যায়, এবং শরীরের বাদবাকি অংশ নগ্ন থাকে।”

১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট বলবন প্রদেশের বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুঘরিলের পশ্চাদ্ধাবন করে সোনারগঞ্জে এসে হাজির হন। তুঘরিল ত্রিপুরায় পালিয়ে যান। এই সময়ে সোনারগঞ্জকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী করা হয়, এবং পরবর্তীকালে এটা বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতিগণের আবাসস্থানে পরিণত হয়। সুলতান সেকান্দর শাহ'র পুত্র গিয়াসউদ্দিন পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগঞ্জে পালিয়ে আসেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। জাফরগঞ্জের সন্নিকটস্থ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের নিকটে গোয়ালপাড়ায় তাঁদের যুদ্ধ হয়, এবং এই যুদ্ধে সুলতান সেকান্দর শাহ নিহত হন। খুব বেশি বছর হয় নি— তাঁর সমাধিস্তম্ভ ও কয়েকটি মসজিদ গোয়ালপাড়ায় দেখা যেত, কিন্তু তা সবই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সম্ভবত, বাংলার প্রথম আফগান রাজা বিখ্যাত শেরশাহও এখানে বসবাস করেছিলেন। তিনি এখানে বিশ্রামের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরাইখানা এবং এ স্থান থেকে সিন্ধুর একটি শাখানদী নীলাভ পর্যন্ত প্রতি দু'মাইল অন্তর অন্তর প্রায় তিন হাজার মাইল পথব্যাপী কূপ খনন করিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

লাঙ্গলবন্দের মেলা

লাঙ্গলবন্দ গ্রাম পাইনাম থেকে খুব দূরে নয়, এবং মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিরাট হিন্দু পূজা-উৎসবের জন্য এখানকার পঞ্চমী ঘাট প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষে এ স্থান ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু প্রতিবছর ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীতে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে একত্র হয়। এই বিরাট মেলায় ব্যবসায়ীরা বিক্রির জন্য তাদের পণ্যদ্রব্যাদি নিয়ে আসে। ইদ্রাকপুরের মেলার ন্যায়, এখানকার অনুষ্ঠিত মেলাও বেশ কয়েকদিন ধরে অব্যাহত থাকে। এই পরগনার জনসংখ্যা প্রায় সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান নিয়ে গঠিত। মসলিন বস্ত্র বয়নই এখানকার অধিবাসীগণের প্রধান পেশা, যার জন্য সোনারগঞ্জ আবুল ফজল ও ফিচের সময়কার সুখ্যাতি আজো অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাঁতিদের অধিকাংশই মুসলমান। এরা জামদানি বা বুটিদার মসলিন তৈরি করে থাকে; এবং প্রতিবছর এই ধরনের বেশ কিছু পরিমাণ বস্ত্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়ে থাকে।

ভাওয়াল

জেলার উত্তরাংশে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম দিকে এবং শহর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিরাট ভূভাগের নাম ভাওয়াল। এই পরগনায়, বিশেষ করে এর উত্তরাংশে বিরাট অকর্ষিত ভূমিভাগে বিস্তীর্ণ বনভূমি ও উঁচু নিচু স্থান পরিলক্ষিত হয়। এসব এলাকায় পূর্বে লোকের বসতি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শাইল ধান, সরিষা, তিল-তিসি, তুলা, কয়েক প্রকার ফলমূল ও শাকসব্জি এবং প্রচুর পরিমাণ আনারস, পেয়ারা এখানকার প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ভাওয়াল গ্রাম বা নগরী ঢাকা থেকে জলপথে প্রায়

একদিনের পথ। এখানে প্রায় ৫০০ বাড়ি-ঘর আছে; এবং এস্তেলার বেশিরভাগই পতুঞ্জি-বংশোদ্ভূত দেশীয় খ্রিস্টানদের দ্বারা অধ্যুষিত। এখানে একটি রোমান ক্যাথলিক গির্জা আছে; ভাওয়ালা ও এর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলো এর আওতাভুক্ত। এই সমুদয় এলাকাই একটি বিশাল ও মূল্যবান জমিদারি হিসেবে পরিগণিত। এখানে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৫,০০০। দেশের এই অঞ্চলের লোকসংখ্যার একটি অংশ ক্ষুদ্র-শ্রেণীর হিন্দু, যেমন চণ্ডাল ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। এখানকার কুঁড়েঘরের দুর্দশাশ্রম অবস্থাদৃষ্টে এদের অনেককেই নিদারুণ দরিদ্র ও নিষ্কম মনে হয়। এরা প্রধানত ছালানি কাঠ, কুঁড়েঘর ছাওয়ার খড় ও কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

টলেমির প্রাচীন এ্যান্টিবোল

টলেমি কর্তৃক উল্লিখিত 'এ্যান্টিবোল' শহরটি ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত; এবং 'এ্যান্টিবোল' নামের উৎপত্তি হয়তো ভাওয়ালা থেকে হয়েছে, অথবা খুব সম্ভবত এর পূর্বে 'আটিয়া' (পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নাম) শব্দটি বসিয়ে 'আট্রিবাওয়ালা' করা হয়েছে, যা ঐ প্রাচীন ভূগোলবেত্তা কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের অত্যন্ত কাছাকাছি। খুব সম্ভবত উক্ত স্থানটি 'অন্টিমেলা' নামেও পরিচিত ছিল এবং সেখানে খুঁটিতে রাজার হস্তী বাঁধা থাকত; তা থেকেই সংস্কৃতে 'হাস্তিমালা' বা 'হাস্তিবান্ধ' হয়েছে। উইলফোর্ডের ধারণা এ স্থানটির অবস্থান ফিরিজিবাজারে ছিল। কিন্তু এই স্থানটি ভাওয়ালের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলেই শুধু নয়, বরং সেখানে একটি স্থান আছে যা অদ্যাবধি 'হাস্তিবান্ধ' নামে পরিচিত এবং সেখানে পূর্বকালে রাজার হাতি রাখা হত বলে স্থানীয়রা উল্লেখ করে থাকে। আমি মনে করি যে, খুব সম্ভবত শীতলক্ষ্যা ও বানার নদীর সংযোগস্থলে একডালার এর অবস্থান ছিল। একডালার কাছাকাছি এলাকা ছোট ছোট, গভীর ও সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত পাহাড়শ্রেণীতে প্রবেশ করেছে; এস্তেলার চত্বরসমূহ ঝোপজঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানকার মৃ্ত্তিকা লাল কাঁকর মাটি ও নিম্নে কমবেশি পরিমাণে গলগলমিশ্রিত কর্দমস্তুর দিয়ে গঠিত। ভাওয়ালের অনুরূপ সাধারণ ফসলাদি ছাড়াও, নীলের চাষ ও কফির আবাদও হয়ে থাকে। একডালা দুর্গের নাম প্রায়শই বাংলার স্বাধীন রাজাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু এর অবস্থান কিংবা এখানকার সামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনো স্থানের ধ্বংসাবশেষের কোনো চিহ্নই আজ আর বর্তমান নেই। সুতরাং ঐ নামে অভিহিত দুর্গটি খুব সম্ভবত কাপাসিয়ার অন্তর্গত দরদরিয়া নামক স্থানে বানার নদীর পূর্বতীরে একডালার গ্রাম আট মাইল উপরে অবস্থিত।

কাপাসিয়া

কাপাসিয়া ভাওয়ালের একটি মহকুমা এবং বানার নদীতীরস্থ বেশ কিছু পরিমাণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত। 'কার্পাস' (তুলা) শব্দ থেকে কাপাসিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। দেশের এ অংশে কার্পাস তুলার ব্যাপক চাষাবাদ ছিল, এবং এখানে আগের দিনে অভ্যুৎকৃষ্ট মসৃণ বস্ত্রাদি বয়ন করা হত। স্বরণাতীত কাল থেকে এ অঞ্চল এর বর্তমান নামেই প্রসিদ্ধ ছিল; এবং দৃশ্যত দেশের এই এলাকায় সর্বাধিক প্রাচীন পুরাকীর্তির স্থানগুলো বিদ্যমান আছে। বর্তমানে দরদরিয়া নামে পরিচিত এবং একডালার গ্রাম আট মাইল উপরে বানার নদীর তীরে অবস্থিত একটি লোকালয়ে, প্রাচীন একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, এবং এর বিপরীত দিকে একটি শহরের

ভিত্তিভূমি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, উভয় কীর্তিরাজিই বানিয়া রাজাগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল এবং তাঁদের দখলে ছিল। নদীটি এখানে প্রায় ৩০০ গজ প্রশস্ত এবং কোনো কোনো স্থানে ৪০ ফুটেরও অধিক গভীর। এর তীরভূমি লাল মৃত্তিকায় গঠিত এবং পানির প্রস্রাব থেকে খাড়াভাবে প্রায় ৪০ ফুট উচু (নদীর পানি যখন সর্বাপেক্ষা নিম্নসমতলে অবস্থান করে); এ সময় এর খাড়া পাড়ের বহু স্থানের অবয়ব অনেকটা রাজমিস্ত্রির কাজ করা মজবুত প্রাচীরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দুর্গটি বাহ্যত অর্ধচন্দ্রাকারে নদীপার্শ্বে নির্মিত হয়েছিল। কাদামাটির সঙ্গে একত্রে সর্ষপিত লাল মৃত্তিকা দ্বারা এর বহির্দেয়াল গঠিত এবং বর্তমানে এর উচ্চতা ১২ কি ১৪ ফুটের অধিক নয়। এর বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ দু'মাইলেরও উর্ধ্বে এবং প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্তমানে এই পরিখা বহুল পরিমাণে প্রাচীর ও ভবনসমূহ মাটি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পাঁচটি তোরণদ্বার আছে, কিন্তু বর্তমানে ইটক বা প্রস্তরনির্মিত প্রবেশদ্বারের কোনো চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। কিছুটা দূরে—পাড়ের চারদিকের মাটির ঢিপির মধ্যে একইরকমভাবে তৈরি দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের সন্ধান পাওয়া যায়। আরো কিছুটা দূরে, আমরা ইটকনির্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন দেখতে পাই, যার পরিধি ও আকৃতি দীর্ঘ উচ্চভূমি ও খোলা ইট এবং প্রাচীরের ভিত্তিভূমির একটি অংশ দ্বারা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত। দুর্গের বহির্ভাগের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ন্যায়, নদীর সঙ্গে সংযুক্ত একটি গর্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বৃত্তের সীমানা পরিলক্ষিত হয়, যার শেষাংশ ধনুকের জ্যা-এর বাঁকা অংশের অনুরূপ এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০০ গজ। এই আশ্রয়ব্যূহের তিনটি গহ্বর ছিল বলে প্রতীয়মান হয় এবং এতে অট্টালিকার দুটো পার্শ্বই পরিব্যাপ্ত ছিল; এগুলো কিছুটা উচু ও নদীতীরের কাছাকাছি অবস্থিত। দক্ষিণ এলাকা ইটের একটি গোলাকার ঢিপি নিয়ে গঠিত এবং এটা খুব সম্ভব ঐ দুর্গেরই ভিত্তিভূমি ছিল। উহা দুর্গ প্রাচীরের চারটি অংশসহ একটি বিরাট দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার ভিত্তিভূমি এখনো লক্ষ করা যায়। উত্তর এলাকার গঠন প্রণালী ততটা সুস্পষ্ট নয়; এর দুটো চারকোণাকৃতি উচ্চস্থান আছে। এর বাইরে একটি পুকুর আছে এবং তা একটি খালের সঙ্গে যুক্ত এবং বেটনী প্রাচীরের বাইরের পরিখার সঙ্গে এটা এখনো দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রাচীরের মধ্যবর্তী ভূমির উপরিভাগ ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ফাঁকা জায়গাসহ মাটির ঢিপি ও ইটক ইত্যাদি দ্বারা আবৃত; সম্ভবত এ সকল স্থানে একদা জলাশয় বিদ্যমান ছিল। অসংখ্য খোলা ইটও ভূমির উপরিভাগে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে, এবং নদীর তীরবর্তী স্থানে এর বিরাট ভূপ দেখা যায়। সম্ভবত অট্টালিকাসমূহের বেশিরভাগই নদীতে প্রাস কবে কেলোছে; অথচ আগের দিনে পার্শ্ববর্তী নদীটি খুবই সংকীর্ণ ছিল বলে স্থানীয়রা উল্লেখ করে থাকে। নদীর অপর তীরে অবস্থিত শহরটি বর্তমানে অবশিষ্ট একমাত্র নিদর্শন হল মাটির ঢিপি ও সমতলের উপরিভাগে ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য খোলা ইট। উক্ত শহর বেশ কিছুটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিদ্যমান ছিল বলে প্রতীয়মান হয়; এর প্রায় দু'মাইল অভ্যন্তরে দুটো জলাশয় আছে। কথিত আছে যে, বানিয়া রাজাগণ এগুলো খনন করেছিলেন। জলাশয় দুটো বেশ গভীর এবং খুব সম্ভবত এতে স্বরনার মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট বা কাছারি এলাকা নদীর তীরে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়; এবং এখানেও একটি দরগাহ ও মসজিদের ভিটি পরিলক্ষিত হয়। এগুলো প্রধানত প্রস্তরনির্মিত ছিল। পরবর্তীতে শেখ আলার মসজিদ নামে পরিচিত; সম্ভবত সুলতান আলোউদ্দিন কর্তৃক তা নির্মিত হয়েছিল।

রানী বাড়ি

দেশের এ অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে দুর্গটি “রানী বাড়ি” নামে প্রসিদ্ধ, এবং তা রানী ভবানীর সম্পত্তি ছিল বলে কথিত হয়। ইনিই খুব সম্ভবত বানিয়া রাজাদের শেষ বংশধর ছিলেন, যিনি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের আক্রমণের সময়ে উক্ত দুর্গে এসবাস করছিলেন। নদী ও দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পবিখার গভীরতা থেকে অনুমিত হয় যে, এই দুর্গটি বেশ মজবুত ছিল। খুব সম্ভবত এ দুর্গেই বাংলার দ্বিতীয় স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শামসুদ্দিন ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ফিরোজ শাহ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। উল্লেখ আছে যে, অবরোধ চলাকালীন সময় ইলিয়াস শাহ ফকিরের ছদ্মবেশে রাজা বিয়াবানী নামে পরিচিত একজন প্রসিদ্ধ সাধু দরবেশের শেষকৃত্যে যোগদানের উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে বের হয়ে পড়েন। এরপর তিনি সম্রাটের তাঁবুতে গমন করেন এবং তাঁকে অভিবাদন জানান, কিন্তু পরিচয় গোপন থাকায় তিনি অক্ষত অবস্থায় দুর্গে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। রাজা, যার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তিনি খুব সম্ভবত রানী ভবানীর একজন বংশধর ছিলেন। ইলিয়াসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকান্দর শাহের রাজত্বকালে পুনরায় উক্ত দুর্গ অবরোধ করা হয়। কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারেও অবরোধ ব্যর্থ হওয়ায় সম্রাট তাঁর অবরোধ প্রত্যাহার করেন এবং বার্ষিক করদানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সন্ধি স্থাপন করে ফিরে যান।^১

১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন হসেন শাহ এই দুর্গটিকে তাঁর বাসস্থানে পরিণত করেন। এখান থেকে তিনি বছরে একবার বিখ্যাত দরবেশ মীর কুতুব-উল-আলমের মাজার জেয়ারত করতে পায়ে হেঁটে পাণ্ডুয়ায় তীর্থযাত্রা করতেন।

তকি এবং এর অবস্থান

কাপাসিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত তকি বানার নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত, যেখানে এই নদী ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। শিশুপালের রাজধানী থেকে এর দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। এই শেষোক্ত স্থানটি দেশের অভ্যন্তরভাগে জঙ্গলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং দরদরিয়ার শহরের মতোই নিকটে একটি চমৎকার জলাশয়সহ ইট ও মাটির টিপি বিদ্যমান আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস এই যে, এখানে এখনো মূল্যবান ধনসম্পদ সংরক্ষিত আছে, কিন্তু তারা বিষধর সর্প ইত্যাদির ভয়ে এর অনুসন্ধান কার্য থেকে বিরত থাকে। শিশুপালের বাড়ি বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদির বিচরণক্ষেত্র এবং গভীর ঘন জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। তকি, সম্ভবত টলেমির তাগমা, আল ইদ্রিসীর তাউক ও নবম শতকের মুসলমান পরিব্রাজকগণের ‘তাফেক’ ইত্যাদি নামে উল্লিখিত স্থান। উইলফোর্ড ‘তাগমা’কে এ্যাক্টিবালের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, এবং তা ফিরিঙ্গিবারে অবস্থিত ছিল বলে মতপ্রকাশ করেন, একথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে, ডি. আনভিল ‘তাগমা’কে পার্বত্য ত্রিপুরার অনুরূপ একটি পর্বতশ্রেণীর উত্তরে চিহ্নিত করেন। তকি বা তাগমা খুব সম্ভবত শিশুপালের দেশের বন্দর ছিল এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী এর সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য নিঃসন্দেহে পূর্বকালে একটি জমাট ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এর নিকটবর্তী অঞ্চলটি উচু, কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক পরিমাণে জঙ্গলাবৃত্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামটি বেশ বড়, এবং কাঠের ব্যবসাকেন্দ্র; এ সকল কাঠ পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল থেকে কাটা হয়, এবং বর্ষার মৌসুমে এ স্থান থেকে বানার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটি সাপ্তাহিক হাট বসে, এবং সেখানে কোচ ও রাজবংশীদের প্রচুর সমাগম হয়।

১ ইমার্টকৃত হিন্দি অব বেঙ্গল প্রটব্য।

ঘটে। এরা তুলা, হরিণের শিং এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য হাটে-বাজারে নিয়ে আসে। এখানে কড়ি তাম্রমুদ্রার স্থান পূর্ণ করে থাকে; দেশের এ অংশে অত্যাৱশ্যকীয় জিনিসপত্রের সস্তা দামের এটি একটি প্রমাণ।

সাভার ও ডেমরা

এ স্থান দুটোর একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল এবং ঢাকা শহরের পশ্চিম দিকে ও জেলার উত্তরভাগে এগুলো অবস্থিত। প্রথমোক্তটি বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত এবং বানিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী ছিল। কাপাসিয়া শিশুপালের, এবং মধুপুরে যশপালের আবাসগৃহের মতো তাঁর বাসস্থানকে কুঠিবাড়ি (Cote Baree) বলা হত। বর্তমানে এর ইট ও মাটির বিরাট স্তূপ জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। ডেমরা আরো উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং বংশী নদীর তীরে, ধলেশ্বরীর সঙ্গে এর সংযোগস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। সমগ্র জেলার মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎপাদনকারী গ্রাম। রেনেলের মানচিত্রে বেশ বড় আকারের স্থান হিসেবে গণকপাড়া, ঘড়ি ও ঘুরিয়াপাড়া বিশেষভাবে চিহ্নিত। দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত এসব জায়গা আফগানদের বাসস্থান ছিল; এরা মুঘলগণের নিকট তাঁদের পরাজয়বরণের পর দেশের এ অংশে সরে আসেন। কয়েক বছর পূর্বে শেষোক্ত স্থানের প্রাচীরগুলোর একটা অংশ কয়েকটি উঁচু তোরণদ্বার ও মসজিদসহ দেখা যেত; কিন্তু এখানকার নদীটি অধুনা দেশের এই অঞ্চলে এর গতিপথের ব্যাপক পরিবর্তন করেছে এবং ঐ সব প্রাচীন কীর্তি ভেঙে নিয়ে গেছে। বর্তমানে এর আর কোনো চিহ্ন বিদ্যমান নেই। জনশ্রুতি এই যে, ইসলাম খান যখন দেশের এই অঞ্চলে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করার মনস্থ করেন, তখন তিনি গণকপাড়াকে এর স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন। কিন্তু এর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল নিম্নভূমি বিধায় তিনি দুর্গ থেকে কামান বন্দুক ইত্যাদি সরিয়ে নেন এবং ঢাকাকে রাজধানী করেন। ডেমরার সন্নিকটে ‘পাঠানটুলি’ নামক একটি গ্রাম আছে, যেখানে এখনো আফগানদের বংশধরগণ বসবাস করছেন।

রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের উপায়

জেলার নির্মিত মাত্র দুটো সড়ক শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। একটি নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত, অন্যটি তেজগাঁও টঙ্গি সেতু পর্যন্ত প্রসারিত। প্রথমোক্তটি প্রায় আট মাইল এবং শেষোক্তটি চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ। পুরোনো সামরিক সড়কসমূহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে কম ভেঙেছে, সেটি এবং জেলার উত্তরাংশের মধ্য দিয়ে তকির সন্নিকটস্থ বারমাইয়া পর্যন্ত বিস্তৃত; শহর থেকে তকির দূরত্ব ৪৫ মাইল। সামান্য ব্যয়ে এবং জেলার কয়েদিদের দ্বারা এটাকে সারা বছরব্যাপী চলাচলের উপযোগী একটি সুন্দর রাস্তায় পরিণত করা যায়। বর্তমানে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও জামালপুরের মধ্যে যাতায়াত প্রায় অসাধ্য, গ্রীষ্মের দিন ব্রহ্মপুত্রের নিম্নাংশ শুকিয়ে যাওয়ার দরুন, একমাত্র বর্ষার সময় ছাড়া জলপথে ভ্রমণ অত্যন্ত ঘোরালো ও কষ্টকর ব্যাপার। এ রাস্তাটি মেরামত করা হলে এ সকল স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সারা বছর চালু থাকতে পারত, বিশেষত যখন তকি থেকে ময়মনসিংহ ও জামালপুর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাই ভালো অবস্থায় রয়েছে। এ পথে পূর্বোক্ত স্থান পর্যন্ত দূরত্ব হবে ৭০ মাইল এবং পরবর্তী স্থানের দূরত্ব ১০০ মাইল। পুরোনো সড়কের আর একটি শাখা বিক্রমপুর অতিক্রম করে

গঙ্গা থেকে ইছামতী পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং ফরিদপুরের বিন অঞ্চলের দক্ষিণে তানমা হয়ে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে, এটি তারই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই সড়ক সম্ভবত আলাউদ্দিন হুসেন শাহ নির্মাণ করেছিলেন, এবং একডালা ও সোনারগাঁও থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্গত খুলনায় তৎকর্তৃক নির্মিত দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জেলার অন্যান্য সামান্য যে কয়টি মাত্র রাস্তা আছে, যদি সেগুলোক আদৌ রাস্তা নামে অভিহিত করা যায়, তবে সেগুলো হল আবাদী জমির মধ্যবর্তী আঁকাবাঁকা আলপথ, যা দিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করা চলে। এগুলো জমির মধ্যবর্তী আলপথ, যদ্বারা পথচারী বা ভারবাহী পশুর সাহায্যে মালামাল আনা-নেওয়া করা যায়।

চক্রযান এ অঞ্চলে প্রায় অজ্ঞাত, এবং সম্ভবত শহরে গরু-মহিষাদিচালিত গাড়ির সংখ্যা বারর বেশি হবে না। কালেক্টর মি. ডগলাস ১৭৯০ সালে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা শহরে তৎকালে আগমনকারী একদল সৈনিকের দ্বারা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ির প্রবর্তন করা হয়। জেলার উত্তরভাগে, যেখানে ভূমি তুলনামূলকভাবে উঁচু, এবং অভ্যন্তরভাগের খাল-নালাগুলো শিগগিরই শুকিয়ে যায়, সেসব জায়গায় সাধারণত মালপত্র পরিবহনের কাজে গরুর গাড়ি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নিম্ন পলিঅঞ্চলে যেখানে গ্রাম এবং নদী কিংবা নাব্য খাল-নালা ইত্যাদির মধ্যকার দূরত্ব কদাচিৎ তিন বা চার মাইলের উর্ধ্বে নয়, সেসব জায়গায় প্রজাগণ তাদের কৃষিজাত দ্রব্য বহন করতে নৌকা ব্যবহার করে অথবা নিজেরাই বহন করে বাজারে নিয়ে যায়।

বিভিন্ন রকমের নৌকা

‘পলওয়ার’ নামের এক ধরনের নৌকা এ জেলার বৈশিষ্ট্য; এছাড়া, অন্য নানাবিধ নৌকা যেমন—বেতের বাঁধাই ‘ভাদু’, ‘দুরী’ এবং ‘সারিঙ্গা’ এই জেলায় এবং পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্ষার জলাধিক্যের সময়, প্রজারা তাদের ক্ষেতখামারে কিংবা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কলাগাছের তেলা, বা উপুড়-করা ও একত্রে বাঁধা মাটির কলসি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। গঙ্গা, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীতে ৪৬টি নৌকা ও ৯২ জন মাঝিমালাসহ বত্রিশটি সরকারি ফেরি আছে। শুকনোর দিনে হাটবাজারের নিকটবর্তী স্থানে জমিদারগণ অন্য সকল নদীনালায় ফেরির ব্যবস্থা করে থাকেন।

কলকাতার পথ

ডাক চলাচলের যানে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে সাধারণত নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত যাতায়াত সম্ভব। এই পথটি ফরিদপুর, যশোর, বারাসাত ও দমদম স্টেশন হয়ে চলে গেছে। এর দূরত্ব ১৯৯ মাইল; বিশ্রাম স্থানের সংখ্যা ২২ এবং ফেরির সংখ্যা ২০। চট্টগ্রাম পর্যন্ত সড়ক সারা বছরই চালু থাকে। দাউদকান্দি থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির চলাচলের উপযোগী ভালো রাস্তা আছে : কিন্তু এ স্থানের পর থেকে রাস্তাটি খারাপ, বিশেষত বর্ষাকালে। এই রাস্তার দূরত্ব ১৬৯ মাইল এবং বিশ্রাম স্থানের সংখ্যা ১৪টি। এ অঞ্চলের নিম্নতা ও বহু বিলঝিলের অবস্থিতির দরুন, স্থলপথে সিলেটে, কিংবা বাকেরগঞ্জে যাতায়াত কদাচিৎ করা হয়। সম্ভবত, বছরে মাত্র তিন মাসকাল এসব স্থানে গমনাগমন সম্ভব।

ময়মনসিংহে যাবার রাস্তা

ময়মনসিংহ যেতে সাধারণত রূপগঞ্জ পর্যন্ত (শীতলক্ষ্যার তীরবর্তী একটি শহর) স্থলপথে, এবং সেখান থেকে তকি পর্যন্ত জলপথে এবং বাকি পথটুকু ব্রহ্মপুত্রের তীর বরাবর পথ ধরে যাওয়া যায়। সারা বছর জলপথে ঢাকার সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের ন্যায় সকল অংশের অবাধ যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা যাবার পথেও পরিবর্তন ঘটে। নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত যাত্রীরা বুড়িগঙ্গা, ইছামতী ও মেঘনা নদীপথে রাজাপুর বা ক্ষতিজিঘাটা খাল পর্যন্ত গমন করে এবং শেষোক্ত নদী থেকে কীর্তিনাশায় চলে আসে; সেখান থেকে তারা নয়াভাঙ্গনী ও মূলাদি নদী দিয়ে ইদিলপুর হয়ে একটি নদীতে এসে পড়ে, যার তীরে বরিশাল শহর অবস্থিত। অবশিষ্ট পথটুকু সুন্দরবনের অন্তর্গত খুলনা হয়ে যেতে হয়। আর একটি পথ হল বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী হয়ে জাফরগঞ্জ ঘুরে গঙ্গায়, এবং সেখান থেকে চন্দরসি ও বড়সি নদী বেয়ে খুলনায় আসতে হয়। দুটোর যে কোনো একটি পথে ভ্রমণ সম্পূর্ণ করা সাধারণ আকারের বাউলী নৌকায় সহজেই দশ দিনে সম্ভব; কিন্তু এ দুটোর মধ্যে সাধারণত বরিশাল পথে ভ্রমণই বেছে নেওয়া হয়। বর্ষার দিনে ফরিদপুরের খাল দিয়ে সরাসরি পথ বেছে নিয়ে এ সকল পথ পরিত্যক্ত হয় এবং এ পথে বারাসিয়ার মধ্য দিয়ে মধুখালিতে আসা যায়। শীতলক্ষ্যা, বানার ও ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহে যাবার নদীপথ শুকনোর দিনে কয়েক মাস বন্ধ থাকে, এবং নৌকাসমূহ যমুনা দিয়ে ঘোরালো পথে যেতে বাধ্য হয়। চট্টগ্রামের সঙ্গে সকল সময়ে যাতায়াত অবাধে চলে; কিন্তু শুধু উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সময়, পানসী অথবা এই জেলার নৌকায় এই পথে যাবার চেষ্টা করা হয়। সিলেটের সঙ্গে মেঘনা নদী দিয়ে এবং পশ্চিম প্রদেশসমূহের সঙ্গে জাফরগঞ্জ হয়ে গঙ্গানদী পথে অবাধে যাতায়াত করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

[কৃষি—পশুপালন—ভূমির পরিমাপ—খাজনা ও রায়ত—তালুকদার—জমিদার]

কৃষি

এই জেলা সাধারণ উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতার দিক থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা ফরিদপুর ও ময়মনসিংহের তুলনায় নিম্নমানের বলে বিবেচিত। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এর আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি আবাদ করা হয়ে থাকে এবং এ আবাদী ভূমির অধিকাংশই দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

মৃত্তিকা

উত্তরাংশের উচ্চভূমির অধিকাংশেরই মাটি লাল কাঁকরযুক্ত এবং অনুর্বর; কিন্তু এই অঞ্চলের নিম্নভাগ অর্থাৎ শুকনো ছোট নদীগর্ভ এবং জলাভূমির প্রান্তভাগের মৃত্তিকা কিছুটা পলিযুক্ত উর্বর কাদামাটি দ্বারা গঠিত এবং এতে প্রচুর পরিমাণে ধান এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে সরিষা ও তিল উৎপন্ন হয়ে থাকে। মুঘল শাসনের প্রথমদিকে জেলার এতদঞ্চলের ভূমি কৃষক-প্রজাদেরকে লাখেরাজ হিসেবে দেওয়া হত এবং মুর্শিদাবাদ প্রদেশের রাজধানী না হওয়া পর্যন্ত ‘জঙ্গলবাড়ী স্বত্ব’ হিসেবে এর আবাদ চলছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ রাজধানী হওয়ার পর কতিপয় ‘উপ-নায়েবের’ অত্যাচার ও লুটতরাজের ফলে রায়তগণ দেশের অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। হাতি, শিকারি জন্তু এবং বন্যা ইত্যাদিও এর অধিকাংশের জনশূন্যতার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাজস্ব-সুপারভাইজার মি. কেলস্যালের ১৭৬৯ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে হাতি এসে যে ধ্বংস সাধন করত তাতে পূর্ববর্তী ১২ বছর যাবৎ ভাওয়াল এস্টেটের বার্ষিক রাজস্ব হ্রাস পেয়ে ৫৩,৮৯৯ টাকা থেকে ১৬,৭২০ টাকায় নেমে আসে এবং ঐ একই কারণে পরবর্তীকালেও এ এস্টেটেরই সংলগ্ন কাশিমপুর পরগনার সরকারি রাজস্ব-হ্রাসের কথা প্রায়শই উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় লোকদের মুখে শোনা কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা ও পরবর্তী দুর্ভিক্ষে বানার নদীর তীরবর্তী ‘দরদরিয়া’য় অবস্থিত নগরী জনশূন্য হয়ে যায় এবং ১৭৮৭ সালের সর্বজনবিদিত একই দুর্যোগ এতদঞ্চল ছাড়াও জেলার অন্যান্য এলাকায়ও একই রকম ধ্বংস সাধন করেছে। এই শেষোক্ত বন্যার ফলে এ জেলার বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়, বিশেষত দক্ষিণাংশের পরগনাগুলো এবং বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরে অবস্থিত ভূ-অঞ্চলের গবাদিপশুর প্রাণনাশ এবং

বায়তনের মৃত্তা ও গ্রাম ভাগের ফলে এ অঞ্চল শিগগিরই জললাবৃত হয়ে ওঠে এবং তা বিংশ বায়াদির আবাসভূমিতে পরিণত হয়। ফলে এ অঞ্চল আবাদ করা অত্যন্ত কষ্টকর ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এতৎসত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং এ বিভাগেও সাধারণভাবে জেলার সর্বত্র যে পরিমাণ ভূমি বর্তমানে আবাদ করা হয়েছে তার পরিমাণ নিঃসন্দেহে কোম্পানির শাসনপ্রাপ্তি আমলের তুলনায় অনেক বেশি।

কৃষিজাত দ্রব্য

এ জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য হচ্ছে ধান, জোয়ার, তৈলবীজ, ডাল, তুলা, কুমড়া, নীল, সরিষা, ইক্ষু, মরিচ, আদা, পাট, হলুদ ও তামাক। এ ছাড়া, বাগান ও বাড়ির আঙিনায় বা নিকটবর্তী মাঠে পান, কুমড়া, শসা, আপেল, মরিচ, বিভিন্ন প্রকারের কচু, আনারস, কলা, আম, লেবু ও নারকেল উৎপন্ন হয়ে থাকে।

এখানে মাটির উর্বরতা প্রধানত বার্ষিক প্রাবনের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু, এ বন্যা কর্ষণযোগ্য ভূমির এলাকা এবং বীজবপন ও শস্য কাটার সময়ও কিছুটা নির্ণয় করে থাকে। এর দ্বারা দক্ষিণ বিভাগের কর্ষণযোগ্য ভূমি স্বাভাবিকভাবে যে সকল অংশে বিভক্ত হয়ে থাকে তা দেশের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এ সব অংশকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত নামে বর্ণনা করা যায় : (১) ভিটা বা কৃত্রিম উচ্চভূমি অর্থাৎ ঘরবাড়ি ও বাগানের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি—যেখানে ফলের গাছ ও নানাবিধ তরিতরকারি উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। (২) বন্যা-সীমারেখার উর্ধ্বে অথবা কেবল আংশিক প্রাবিত হয়ে থাকে এমন উচ্চভূমি। এখানে তুলা, আখ ইত্যাদি জন্মে। (৩) বন্যা-প্রাবিত ভূমি—এখানে ধান, নীল ও ডাল ইত্যাদি উৎপন্ন করা হয়।

পাঁচ প্রকারের ধান

পাঁচ প্রকারের ধান এখানে উৎপন্ন করা হয় যেমন, বোনা আমন, চোইনা বা দীর্ঘ, আউশ, বোরো ও শাইল। কিন্তু প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার ধানই প্রধান এবং জেলার মোট উৎপন্ন শস্যের তিন-চতুর্থাংশই এ থেকে পাওয়া যায়। আমন ধানের (বুনা বা শীতকালীন শস্য) জন্য সবচেয়ে কম কর্ষণযোগ্য জমি নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

এ ধানের জন্য বার থেকে ষোলটি চাষের প্রয়োজন হয় এবং ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে জমি তৈরি করতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে অথবা প্রথম বৃষ্টি হওয়ার পর বীজ বপন করতে হয়। তবে দারুণ খরার মৌসুমে কখনো কখনো এসব কাজ মে মাসের পূর্বে শেষ হয় না। এক বিঘা জমির জন্য গড়ে ৩২ সের বীজ প্রয়োজন হয় এবং গড়ে ১৬ মন শেষ হয় না। এক বিঘা জমির জন্য গড়ে ৩২ সের বীজ প্রয়োজন হয় এবং গড়ে ১৬ মন বা ৬৪০ সের ধান এতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। অধিক বৃষ্টিপাতেও আমন ধান নষ্ট হয় না। তবে পাঁচ-ছ দিন মাঠে পানি জমে থাকলে এ ধান সহজেই পচে যায়। সব রকমের ধানের মধ্যে আমন ধান সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং পানি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এসব ধানগাছ দ্রুত বেড়ে ২৪ ঘণ্টায় ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং কয়েক মাসের মধ্যে ১৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বন্যা-মৌসুমে নদীর পানি হঠাৎ বেশি বৃদ্ধি পেয়ে মাথার উপরে উঠে গেলে এ ধান সবচেয়ে বেশি বিপদে পতিত হয়। তখন ভাসমান বিচ্ছিন্ন জড়পিও বা আগাছার ভেলা একে সহজেই পানির নিচে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আমন ধানই এ জেলায় ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়ে থাকে এবং এর ৫০ প্রকার বিভিন্ন ধান রয়েছে। এ ধান নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়।

ছোটনা বা দীঘাধান নোনা আমনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জমিতে আবাদ করা হয়ে থাকে। এটা এপ্রিল ও মে মাসে বপন করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে কাটা হয়। এর উৎপাদন আমন অপেক্ষা এক-অষ্টমাংশ কম এবং এ ধানের মাত্র ৩০টি শেণী রয়েছে।

আউশ ধান উচ্চভূমিতে উৎপন্ন করা হয়। এটা ফেব্রুয়ারি মাসে বপন করা হয়ে থাকে এবং বর্ষার প্রারম্ভে ও মে-জুন মাসে কাটা হয়।

বোরো বা রোপা ধান প্রধানত জেলার উত্তর বিভাগে চাষ করা হয় এবং ধান চাষের মোট ভূমির এক-তৃতীয়াংশে এর আবাদ করা হয়ে থাকে। এ ধান মধ্যমভূমিতেও গ্রহণ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

চাষ প্রণালী

চাষ প্রণালী মদী-মালা ও জলাভূমির প্রান্ত ভাগে অবস্থিত নিম্ন জমি—যেখানে সেতুর জন্য অতি সহজেই পানি পাওয়া যায় তা এই ধান চাষের জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। অক্টোবর মাসে অল্প পরিমাণ জমি লাঙ্গল দ্বারা বা পা দিয়ে মাড়িয়ে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, তা ২½ ফুট গভীর কর্দমাক্ত জমিতে পরিণত করা হয় এবং একপ হিসেব করা হয় যে, এসব জমি যেন চৌদ্দ দিন পর্যন্ত আর্দ্রতা (ক্ষুদ্র জলকণা) ধরে রাখতে পারে। এভাবে বীজতলা প্রস্তুত করার সময়ের মধ্যে কৃষকের বাড়িতে বীজধান হতে অঙ্কুর বের হয়ে থাকে। কৃষ্টিতে বীজধান ভরে নিকটস্থ কর্দমাক্ত খিল বা জলাশয়ে তা ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরে ঐ অবস্থায় একে দুদিন ধরে শুকাতে দিতে হয়। পরে একটি মাদুরে ছড়িয়ে কৌশ্লে নিতে হয় এবং মাঝে মাঝে পানি ছিটাতে হয়। প্রথম দিনে দেখা যায় যে, ধান কুলে অঙ্কুর বের হবার সময় হয়েছে এবং এ সময় তা বপনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বীজতলা ‘মই’ দ্বারা মসৃণ করা হয় এবং অঙ্কুরিত ধান এর উপরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বীজ মাটিতে ভালোভাবে শিকড় না গাড়া পর্যন্ত পাখির হাত থেকে বীজধান রক্ষা করার জন্য ৪/৫ দিন ধরে বীজতলা পাহারা দিতে হয়।

অক্টোবর ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে চারাগাছ প্রায় এক ফুট লম্বা হলে তা বীজতলা থেকে তুলে নিতে হয় এবং গাছে বেশি পাতা থাকলে সেসবের মাথা ছেঁটে পানির সঞ্চিত ও আগলে থেকে তৈরি করা মাঠে উক্ত চারা রোপণ করা হয়। এখানে দু’মাস পর্যন্ত পানি সেচ ও আগাছা দূরীকরণের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। এরপর কেবল পানি ও শূকরের হাত থেকে ধান রক্ষা করার জন্য যত্ন নিতে হয়। মে ও জুন মাসে এই ধান কসি পড়ে। এর ফলন ও চালের গুণ আউশ ও আমন অপেক্ষা ভালো। চীনদেশেও প্রায় একই ধরনের চাষ প্রণালী অবলম্বিত হয়ে থাকে। ইহুদিদের মধ্যে একটি উপদেশ প্রচলিত আছে যে, “তোমার কুটি (খাদ্য) পানির উপরে ছড়িয়ে দাও, কারণ অনেক দিন পরে ভূমি আবার তা কিরে পাবে” (Cast thy bread upon the waters for thou shalt find it again after many days)। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, জর্ডন নদীর তীরে ইহুদিরা এ ধরনের চাষাবাদ করত।

শাইল ধান আউশ ধানের মতোই চাষ করতে হয়। তবে একমাত্র পার্থক্য এই যে, এ ধান জুন ও জুলাই মাসে অতিরিক্ত কাদাবূদ্ধ মাটিতে রোপণ করতে হয় এবং জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে কাটতে হয়। উত্তর বিভাগে এই ধরনের চাষ বর্তমানে করা হয়ে থাকে। এখানে কাদামাটিতে ধান গাছ ভালো জন্মে এবং ফল বর্ধা শুধুতে এর সর্বোচ্চ ফলন

দেখা দেয়। এই ধানের সাতটি শ্রেণী আছে এবং এ জেলায় উৎপন্ন ধানের মধ্যে এটি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। এক বর্গহাত জমিতে গড়ে প্রায় ২০টি বোরো বা শাইল ধানের গাছ থাকে।

উড়ি বা ঝরা ধান বা দেশীয় ধান উত্তর বিভাগের নিচু জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ধান পাকলে তা শীষ থেকে এত সহজে পৃথক করা যায় যে, সাধারণত একটি ঝড়ির উপরে গাছ বেখে হাত দিয়ে নাড়িয়ে ধান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে গরিব চাষীরা এভাবে সংগৃহীত ধান বিক্রয়ের জন্যে বাজারে নিয়ে আসে এবং উৎকৃষ্ট দানার জন্য তা অন্য যে কোনো প্রকার চাল অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়ে যায়।

জোয়ার

‘জোয়ারের’ যে সকল জাত এখানে চাষ করা হয়ে থাকে সেগুলো হল চীনা (Panicum Miliacum) এবং খাগিনী (Panicum Italicum)। বর্ষাশেষে এগুলো দক্ষিণ বিভাগের নিচু জামতে বপন করা হয় এবং মার্চ ও এপ্রিলে কাটা হয়। কাফ্রিকর্নও (Panicum Sorghum) দেশের এ অংশে ভালো জন্মে। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার অন্তরীপ হতে সামান্য পরিমাণ শস্য আমদানি করা হয়েছিল এবং তা থেকে প্রচুর ফসল পাওয়া গেছে। এ জাতটি চীনা বা খাগিনী অপেক্ষা বেশ বড় জাতের বলে রায়তরা এর বেশি অনুসন্ধান করে থাকে। এর চাষাবাদ বিশেষভাবে এই জেলার উত্তর বিভাগে ব্যাপকভাবে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৈলবীজ

সরিষা (Sinapis Dichotoma), তিল (Sesamum Oriental) ও তিসি (Linum Ussitatissimum) হচ্ছে এখানকার তৈলবীজ। প্রথমোক্তটি প্রধানত উত্তর বিভাগে এবং যে সকল স্থানের মাটি ভিজা থাকে সেখানে জন্মে। এর জন্য মাটি পূর্ব থেকে তৈরি করে রাখার প্রয়োজন হয় না। তবে উঁচু জমি হলে চাষ করে নিতে হয়। সরিষা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বোনা হয় এবং জানুয়ারিতে কাটা হয়। দু রকমের সরিষা এখানে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর দানার রঙের পার্থক্যই প্রধান। হরিণ ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে।

তিল

লক্ষ্মা নদীর তীরে ব্যাপকভাবে তিলের চাষাবাদ করা হয়। এটা আমন ধানের সঙ্গে প্রায়ই একত্রে বোনা হয় এবং একত্রে এসব শস্যের নাম বলা হয় “তিল বাওয়াই চচা”। এটা মে ও জুন মাসে কাটা হয়। এই উভয় প্রকার শস্য ও অন্যান্য তৈলবীজের চাষাবাদ এ জেলা অপেক্ষা ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে আরো ব্যাপকভাবে করা হয়ে থাকে।

ডাল

খেসারি (Lathyrus Sativus), মসুরী (Cicer Leus), কেওড়া মটর, মুগ (Phaseolus Trilobus), সাধারণ মটর (Pisum Sativum), কলাই (Dolichos Polissus), প্রভৃতি ডাল জাতীয় শস্য এখানে উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে একমাত্র মুগ ব্যতীত বাকি সবই ছোটনা ধানক্ষেতে জন্মে থাকে। মুগ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ জেলায় উৎপাদিত মোট ডাল জেলার চাহিদা মেটাতে পারে না। কাজেই, পাটনা প্রভৃতি স্থান থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ডাল আমদানি করতে হয়।

অন্যান্য শস্য

অন্যান্য শস্যের মধ্যে রয়েছে মেথি (Trigonella foeniculum), কানিজিরা (Nigella Sativa), ছোপ (Anethum foeniculum), ছলফা (Anethum Sowa) এবং ধনে (Coriander Sativum)। এগুলো পূর্বোক্ত শস্যাদির তুলনায় কম পরিমাণে চাষ করা হয় এবং সাধারণত একই মাঠে জন্মে থাকে। এগুলো ডিসেম্বরে বোনা হয় এবং এপ্রিলে তোলা হয়। বার্লি (Hordeum Hexastichon), মকাই বা ভুট্টা (Zea Mays) এবং রোয়াস (Vicia Faba) এ জেলায় অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

তুলা

ঢাকার ‘সূক্ষ্ম মসলিন’ বস্ত্র যে তুলা থেকে তৈরি হয়ে থাকে তা এ জেলায় উৎপন্ন হয়। এটা এক-বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। রক্সবার্গ একে (Gossipium Herbaceum) শ্রেণীভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

বাংলার সাধারণ তুলা গাছ থেকে এটা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, যেমন “(১) এর শাখা অপেক্ষাকৃত খাড়া ও সংখ্যায় কম এবং পাতার অধভাগ সরু হয়ে থাকে। (২) সমস্ত গাছটি, এমনকি পত্রবৃত্ত পর্যন্ত রক্তাভ রঙে রঞ্জিত এবং পাতার শিরায় পত্র রোম অপেক্ষাকৃত কম থাকে। (৩) পুষ্প-বৃত্ত অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং ফুলের পাপড়ির বহিঃপ্রান্ত লাল রঙে রঞ্জিত। (৪) আঁশ লম্বা, সূক্ষ্ম ও নরম।”

এটাই এ জেলার দেশী তুলা। স্বরণাভীতকাল থেকে উদ্ভব বিভাগে এর চাষ-আবাদ হয়ে আসছে। বর্তমান সময় অপেক্ষা পূর্বে এ তুলা যখন ব্যাপকভাবে চাষ করা হত, তখন এর আঁশের মধ্যে বিভিন্ন গুণ পরিলক্ষিত হত। বর্তমানে আঁশের মধ্যে এই বিভিন্ন গুণ হয় স্বতন্ত্র করা যায় না, নতুবা এগুলো অপজাত হয়ে নিম্নমানে পরিণত হয়েছে। এগুলো ফুটি, নরমাহ ও বৈরতি নামে পরিচিত ছিল।

স্থানীয় লোকদের মতে, বর্তমানের তুলা পূর্বকার তুলার চেয়ে নিম্নমানের। এ ফসল এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় না বলেও জানা গেছে। বর্তমান তুলার আঁশ পূর্বকার আঁশের ন্যায় বাহ্যত একই রকম সূক্ষ্ম ও নরম হলেও তা আকারে খাটো হয়ে থাকে এবং বীজের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। পূর্বে এরূপ হত না।

এর গুণের অবনতির কথা যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও ঢাকার তুলা এখনো বাংলার অন্যান্য স্থান এবং এমনকি, পশ্চিম প্রদেশগুলোতে উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। সাম্প্রতিক কালে এ তুলা অল্প পরিমাণে মাঝে মাঝে কলকাতার বাজারে চালান দেওয়া হয়ে থাকে। এখানেও এটা দেশের অন্যান্য স্থান হাতে আমদানিকৃত তুলা অপেক্ষা চড়া দামে বিক্রয় হয়ে থাকে।

দু শ্রেণীর তুলা এ জেলায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। এটা এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রথমোক্তটি থেকে উৎকৃষ্ট তুলা পাওয়া যায় এবং এটা কম খরচে চাষাবাদ করা চলে।

চাষ প্রণালী

বপনের নিমিত্ত তুলার বীজ যত্নসহকারে সংগ্রহ করতে হয় এবং রোদে শুকানোর পর তেল বা ঘি রাখা হয়েছিল এমন একটা মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। পাত্রের মুখ এমনভাবে

বন্ধ রাখতে হয় যাতে বাইরের বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এ অবস্থায় ঘরের একপাশে স্থানে ছাদ থেকে এটা ঝুলিয়ে রাখতে হয় যেখানে সাধারণত আগুন জ্বালানো হয়ে থাকে। এই ফসলের জন্য উঁচু জমি নির্বাচন করতে হয় এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর পর্যন্ত আট হতে বারটি চাষ দিয়ে জমিতে বীজ বপন করতে হয়। বীজ সমান্তরাল সারিতে বপন করা হয় এবং এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব থাকে প্রায় এক হাত। বীজ মাটিতে ছড়ানোর পূর্বে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও গুঁয়োপোকা তুলাগাছের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করে থাকে।

তুলা জমির উর্বরতা শক্তি খর্ব করে এবং একই মাঠে পর পর দুবারের বেশি ফসল উৎপন্ন করলে ভালো তুলা পাওয়া যায় না। পূর্বে যে জমিতে তুলা চাষ করা হত তা প্রত্যেক চতুর্থ বছরে পতিত রাখা হত। বর্তমানে উপরি-উক্ত পদ্ধতি অনুসরণে অবহেলা করা হয় বলে এখনকার তুলা পূর্বকার তুলার চেয়ে নিম্নমানের হয়ে থাকে। ফসল ভালো হলে বিঘা প্রতি ৮ মন তুলা উৎপন্ন হয়। বীজ ও আঁশের গড় অনুপাত $\frac{2}{8}$ বা একমন অর্থাৎ ৪০ সের অপরিষ্কার তুলার মধ্যে ৩২ সের আঁশ থাকে।

এ জেলার উত্তর বিভাগে, বিশেষত এর যে অংশ মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে সোনারগঞ্জ, কাপাসিয়া, টোকী ও জঙ্গলবাড়ী এলাকায় অবস্থিত সেখানে সর্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। পূর্বে এই এলাকায় প্রধানত তুলাই চাষ করা হত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকার ভালো জাতের তুলার জমির মাটিতে যে বিভিন্ন উপাদান থাকা বিশেষ প্রয়োজন বলে বিবেচিত, এখানের মাটিতেও সেই সকল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই ঢাকার তুলা বাংলার অন্যান্য স্থানের তুলার চেয়ে উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী।

তুলার উপযুক্ত মৃত্তিকা সম্পর্কে বেইনস্-এর বক্তব্য হল, “সিলিকা ও আর্জিলেসাস মৃত্তিকার সংমিশ্রণ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে প্রথমটির আধিক্য থাকবে।” আরো পরে জানা গেছে যে, চুনও এর এক বিশেষ উপাদান।^১ এই জাতীয় বিভিন্ন উপাদান এখানকার মৃত্তিকায় রয়েছে। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা পরিবাহিত সিলিকার জন্য জেলার এ অংশের মাটি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা শুকনো থাকে।

যে মানদণ্ড দিয়ে তাঁতিরা তুলার গুণ বিচার করে থাকে

উত্তর বিভাগের তুলা দেশের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা স্ফীত হয় কম। রিচিং প্রক্রিয়ায় আঁশের এরূপ স্ফীত হওয়ার প্রবণতাকে তাঁতিরা এর গুণ বিচারের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু এ প্রবণতা তুলার সহজাত কোনো গুণের উপর নির্ভর করে, না রিচিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পানির জন্য এরূপ হয়—তা জানা যায় নি। তবে শেষোক্তটির জন্যই যে প্রধানত এরূপ হয়ে থাকে, তা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে। বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রতিনিধি মি. বিব জানিয়েছেন যে, ধামরাইতে প্রস্তুত তুলা বেশি স্ফীত হয়ে থাকে এবং এটা খুব ভালো জাতের তুলা বলে তাঁতিরা জানিয়েছে। কিন্তু রিচিং প্রক্রিয়ায় ঢাকার পানি ব্যবহার করা হলে ঐ তুলা কম স্ফীত হত এবং ধামরাইর পানি ব্যবহার করে এর বিপরীত অবস্থা লক্ষ করা গেছে বলেও মি. বিব বর্ণনা করেছেন।

^১ বেইনস্‌কৃত “History of the Cotton Manufactures of Britain” Piddington Journal of the Asiatic Society.

জাফরান

গঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে জাফরান (Carthamus Tinctorius) চাষ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রধানত ধলেশ্বরীর তীরে 'পাটেরগোটার' আশপাশের এলাকায় সর্বোৎকৃষ্ট ফুল উৎপন্ন হয়। এর চাষের আর একটি প্রধান স্থান হচ্ছে বেলিসপুর। উর্বর মিশ্র মৃত্তিকা বা কাদামাটি এর জন্য উপযুক্ত। ৭,০০০ বর্গহাতবিশিষ্ট এক বিঘা জমির জন্য প্রায় ছ'সের বীজের প্রয়োজন হয় এবং ভালো জমি হলে এবং মৌসুম অনুকূলে থাকলে এর থেকে দশ-এগার.সের ফুল পাওয়া যেতে পারে।

জাফরান বপন ও সংগ্রহ করার সময়

অক্টোবর ও নভেম্বরে বীজ বোনা হয় এবং পাপড়ি গাঢ় কমলা রঙের হলে পর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে ফুল সংগ্রহ করা হয়।

পিষ্টক তৈরি করার পদ্ধতি

দিনের বেলায় যে ফুল সংগ্রহ করা হয়, রাত্রিতে তা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। অতঃপর পরের দিন ভোরে তা মাড়ানো হয়ে থাকে। সাদা পানি বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এ পদ্ধতি চার-পাঁচ দিন ধরে চলতে থাকে। এবং এ সময় ফুল সর্বরকম ময়লা থেকে মুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। পরে সমস্ত পিণ্ডটিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এগুলোকে চ্যাপ্টা পিষ্টকাকারে পরিণত করে রোদে শুকানো হয়ে থাকে।

বাজার দর

জাফরান সাধারণত ষোল হতে পঁচিশ টাকা মন দরে বিক্রয় হয়ে থাকে। চাষ করতে খরচ সাত টাকার উর্ধ্বে হয় না। হিসেব করে দেখা গেছে যে, প্রতি বিঘা জমিতে গড়ে লাভ হয় $৩\frac{১}{২}$ টাকা।

জাফরানের বীজ থেকে এক প্রকার তেল বের করা হয়। এটা জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাজারে এ তেল সরিষার তেলের অর্ধেক দামে বিক্রয় হয়ে থাকে। রায়তরা এর বীজের সঙ্গে চিনি ও দুধ মিশিয়ে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তারা এর পাতা ও কাণ্ড পুড়িয়ে এর ছাই ধৌত করার জন্য সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করে। কারণ এতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ থাকে।

১৭৮৯ সনে জেলায় উৎপন্ন সমুদয় জাফরানই নগরীর বস্ত্র-রঞ্জন ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেছিল। কালেক্টর মি. ডগলাসের মতে, ঐ বছর জাফরান খুব কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছিল এবং এর হলুদ রঙের জন্য সবটুকুই ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮০০ সালের দিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এই দ্রব্য রপ্তানি করা হয়েছিল এবং ১৮১০ সালে জেলার মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ২,০০০ মন।

সর্বাপেক্ষা অধিক জাফরান রপ্তানি করা হয়েছিল ১৮২৪-২৫ সালে। এক হিসাব অনুসারে, কলকাতার কাস্টম অফিস থেকে মোট, ৮,৪৪৮ মন রপ্তানি করা হয়েছিল এবং এর মূল্য ছিল ২,৯০,৬৫৫ টাকা ৮ আনা ৬ পয়সা। এসব ফসলের দু-তৃতীয়াংশই ঢাকার সন্নিকটস্থ এলাকায় উৎপন্ন হয়েছিল।

জাফরানের মতো রংবিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থ দিয়ে স্থানীয় লোকেরা এতে প্রায়শই ভেজাল দিয়ে থাকে; ফলে এতে এক ধরনের পোকার জন্ম হয় এবং এর ফলে জাফরান ইংল্যান্ডে পৌঁছবার মধ্যেই অনেক সময় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

ভেজাল মিশ্রণ সত্ত্বেও, ঢাকার জাফরান ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন জাফরানের তুলনায় ভালো এবং লন্ডনের বাজারে চীনা জাফরানের পরেই এর স্থান। উল্লেখযোগ্য যে, জাফরান থেকে দু'ধরনের রঙের পদার্থ পাওয়া যায়—একটি হলুদ, অন্যটি লাল। প্রথমোক্তটি ঠাণ্ডা পানিতে দ্রবণীয় এবং বারবার ধৌত করে অপসারণ করা হয়। অবশিষ্টাংশ পটাশিয়াম কার্বোনেটের ঠাণ্ডা দ্রবণে জীর্ণ করে লাল রং পাওয়া যায়। এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ সাইট্রিক অ্যাসিড দিলে সেটাকে 'তলানি' হিসেবে পাওয়া যাবে। লাল রংকে কোনো কোনো রসায়নবিদ 'কারথ্যামিক এসিড' নামে অভিহিত করে থাকেন। এটা লাক্ষার রঙের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু এর দ্বারা কাপড় রঙিন করা হলে তা সাবানের ক্রিয়া এবং রোদে শুকাতে দিলে তার প্রভাব বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। এটা ফরাসিদের উজ্জ্বল রঙের পশমি বস্ত্রের ন্যায় বস্ত্র অনুকরণ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং অত্রের গুঁড়ার সাথে এটা মিশ্রিত করলে ঠোটে মাথার সাধারণ রুজ তৈরি হয়।

নীল

নীল গাছ (*Indigofera tinctoria*) প্রধানত নতুন চর এলাকায় এবং আউশ ও ছোটনা ধান ক্ষেতে চাষ করা হয়। দক্ষিণ বিভাগে অধিকাংশ গাছ অক্টোবর থেকে বপন শুরু হয়। জেলার এ অংশে নীল রং তৈয়ার করার কাজ শুরু হয়। সাধারণত ২৫শে মের দিকে এবং জুলাইর প্রথম দিকে শেষ হয়। উত্তর বিভাগের জমি উঁচু বলে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বীজ বপন করা হয় এবং নীল তৈয়ার করার কাজ জুনের শেষের দিকে প্রায় শুরু হয়ে যায়।

এই জেলায় উৎপন্ন নীল যশোরের নীলের তুলনায় নিম্নমানের। কারখানায় নীল তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ব্যবহার করা হয় বলে নীলের মধ্যে সূক্ষ্ম বালুকাকণা মিশ্রিত হয়; এজন্য নীল শক্ত হয় এবং ভেঙে গেলে ঝকঝক রং দেখা যায়।

১৮০১ সালে এ জেলায় মাত্র ছোট ছোট দুটো নীল তৈরির কারখানা ছিল। বর্তমানে এ জেলাতেই এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩-এ। নীল চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ হচ্ছে ১,০০,০০০ বিঘা। এতে বছরে নীল উৎপন্ন হয় ২,৫০০ মন। রায়ত ও কারখানায় নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য এ থেকে অর্থ আসে গড়ে বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা বা ৩০,০০০ পাউন্ড।

শণ

শণ (*Crotolaria Jumcea*)—জেলার উভয় বিভাগের পলিমাটিতে চাষ করা হয়ে থাকে। কিন্তু গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ও লক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে সোনারগঞ্জ এলাকায় এটা খুব ভালো জন্মে।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এর বীজ বপন করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলে শিকড়সহ গাছ তুলে নিয়ে আঁটি বেঁধে নিকটস্থ ঝিল বা নদীতে ভিজিয়ে রাখা হয়, যতক্ষণ না বাকল গাছ হতে আলাগা হয় এবং পানিতে নেড়ে দুটোকে সহজেই পৃথক করা যায়। বাকল বা আঁশযুক্ত অংশ হতেই শণ পাওয়া যায়। পানি ঢেলে দিয়ে ও একটি ছোট কাষ্ঠখণ্ডের

উপর आंशु आंशु पिटिये (যেভাবে এদেশে কাপড়চোপড় ধোয়া হয়) বাকলের আঠালো পদার্থ দূরীভূত করে নিতে হয়, অথবা একটি মোটা কাঠের চিকুনি দিয়ে আঁচড়িয়েও এরূপ করা চলে।

এক বিঘা ভালো জমিতে তিন মন পরিষ্কার শণ উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং প্রতি মন শণের সর্বোচ্চ মূল্য হল দু টাকা।

চাষ করার খরচ

শণ চাষের জমি প্রস্তুত করতে বার হতে ষোলটি চাষ দিতে হয় এবং এজন্য শ্রমিকদের খরচ, জমির খাজনা, বীজ ইত্যাদিসহ মোট খরচ হিসেব করা হয়েছে প্রতি বিঘার জন্য ২ টাকা ৮ আনা। ১৮০৬ সনে ঢাকা জেলায় ১০,০০০ মন শণ উৎপন্ন হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিনিধি এ জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে এ বছরেই ৫৫,০০০ মন শণ ব্রিটিশ নৌ-সেনাদের জন্য ক্রয় করেন।

বর্তমানে এটি কম উৎপন্ন করা হয় এবং প্রধানত মাছ ধরার জাল তৈরির জন্য এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাট ও মেস্তা পাট

পাট (*Corchorus Olitorius*) ও মেস্তা পাট (*Hibiscus Cannabinus*) শণের তুলনায় ব্যাপক হারে চাষ করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে এর বীজ বপন করতে হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে গাছ তুলতে হয়। এগুলোর প্রস্তুতপ্রণালী শণের মতোই। পাট ও মেস্তা পাটের আঁশ দড়ি, কাগজ ও বিক্রমপুরের চট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। কলকাতায় বেশ কিছু পরিমাণে এসব দ্রব্য রপ্তানিও করা হয়ে থাকে।

ইক্ষু

আখ (*Saccharum Officinale*) এ জেলা অপেক্ষা ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জে বেশি চাষ করা হয়ে থাকে। ফরিদপুর জেলায় গঙ্গা নদীর তীর জুড়ে অনেক মাইল বিস্তৃত এলাকায় আখের চাষ করা হয়ে থাকে। দেশের এ অংশের আখ পূর্বাংশের যে-কোনো জেলার আখের তুলনায় উৎকৃষ্ট।

চাষের পরিমাণ

মি. ডগলাসের হিসেব মতে, ১৭৯২ সনে এ জেলায় চাষের পরিমাণ ছিল ৫০ গজ বর্গের ১০০০ বিঘা। সম্ভবত বর্তমানে আখ চাষের পরিমাণ উক্ত জমির দ্বিগুণের অধিক হবে না। গুড় বা নিকৃষ্টমানের ঝোলা গুড় সম্পূর্ণটাই মিষ্টান্ন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। শহরে লোকদের ব্যবহারের জন্য চিনি যে দ্রব্য থেকে তৈরি করা হয় তা অন্যান্য জেলা থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে এবং এ থেকে তিন প্রকারের চিনি পাওয়া যায়। এক মন চিনির মধ্যে এ তিনের অনুপাত হল ১৬, ১৮ এবং ২০ সের। এ তিন প্রকারের মোট ব্যবহারের পরিমাণ ৫০ মনের উর্ধ্বে নয়।

মরিচ

লঙ্কা মরিচ (*Capsicum Frutescens*) ও ধান মরিচ (*Capsicum Minimum*) এই উভয় প্রকার মরিচই এ জেলায় প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হয়। বিশেষ করে প্রথমোক্তটি ব্যাপক পরিমাণে কলকাতায় রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

হলুদ ও আদা

হলুদি বা হলুদ (*Curcuma Longa and Gardneria Ovata*) ও আদ্রক বা আদা (*Zinziber Officinalis*) এ জেলার উঁচু জমিতে চাষ করা হয়। বিশেষ করে সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর এলাকায় এর চাষ অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু এই জেলায় যা উৎপন্ন হয় তা সম্পূর্ণ এখানকার লোকদের চাহিদা মিটাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই উভয় প্রকার ফসলই এখানকার তুলনায় ফরিদপুরে বেশি চাষ করা হয়ে থাকে।

তামাক

তামাকের (*Nicotiana Tabacum*) চাষ দেশে রায়তদের ব্যবহারের জন্যে হয়ে থাকে। এ ছাড়া, কিছু পরিমাণ তামাক রংপুর, কুচবিহার ও অন্যান্য স্থান থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে।

যে সকল গাছ গ্রামবাসীরা তাদের বাড়িঘরের আশপাশে চাষ করে থাকে

গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ির আশপাশের মাঠে ও বাগানে যে সকল গাছ রোপণ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত গাছগুলোর নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

পান

তিন প্রকারের পান (*Piper Betel*) এখানে জন্মে। এতগুলোর মধ্যে এক প্রকার জেলার সর্বত্র সাধারণভাবে উৎপন্ন হয়। এলাচি ও কর্পুরি নামে অপর দু প্রকার (এগুলোর উৎকৃষ্ট সুগন্ধির জন্যই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে) পান কেবল সোনারগঞ্জেই চাষ করা হয়।

কুমড়া

কুমড়ার (*Cucurbita Pepo*) মধ্যে চারটি শ্রেণী আছে যেমন—কুমড়া, মিষ্টি গিমি, কুম্ভাও ও চাল কুম্ভাও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার কুমড়া প্রধানত বিক্রমপুরে চাষ করা হয়। এ দুয়ের মধ্যে শেষোক্তটি অর্থাৎ গিমি কুমড়া এ স্থানের ও বাকেরগঞ্জ জেলার বৈশিষ্ট্য। ওখান থেকে কলকাতায় ও দেশের বিভিন্নাংশে বহু কুমড়া প্রেরিত হয়। কথিত আছে যে, যে স্থানে প্রত্যহ আগুন জ্বালানো হয় সেস্থানে ঝুলিয়ে রাখলে গিমি কুম্ভাও দু বছর পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে। চতুর্থ প্রকার কুমড়া তরকারি ও মোরশ্বা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দুর্গাপূজার সময় হিন্দুদের মধ্যে এর চাহিদা খুব বেশি হয়ে থাকে। এ-ছাড়া নিম্নোক্ত তরিতরকারি এখানে উৎপন্ন হয়।

(১) কদু (*Cucurbita Lagenaria*), (২) শরকারু কুন্দা (*Convolvus Batatas*), (৩) উচ্ছে (*Mourodica Mixta*), (৪) করলা (*Cleome Pentophylla*), (৫) বেগুন (*Solanum Melongina*), (৬) খেঁড়ো (*Cucumis Sativus*), (৭) ফুটি (*Cucumis Momordica*),

(৮) তরই (Luffa Acutangula), (৯) কচু (Arum Colo Casia), (১০) মানকচু (Arum Indicum), (১১) মূলা (Raphanus Sativus) ও (১২) ডাঁটা শাক (Amarnathus Gangeticus)।

কদু

মাঠে এবং ঘরের চালার উপরে উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরকার কুন্দা ও করলা কেবল উত্তর বিভাগে জন্মে। করলা বাঁশের তৈরি চাঁচের বেড়া বা জাফরির উপরে জন্মে।

কলা ও আনারস

এ জেলা কলা ও আনারসের জন্য প্রসিদ্ধ। আট প্রকার কলার (Musa Paradisisca) মধ্যে মর্তমান ও চম্পা কলা—এই দু প্রকার কলা খুবই বিখ্যাত। প্রথমোক্তটি কেবল বিক্রমপুরেই চাষ করা হয় এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু কলা বলে বিবেচিত। কলাগাছ প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে নতুন করে রোপণ করতে হয় এবং এতে খাত বা নর্দমার পার্শ্বের মাটি দ্বারা সার দিতে হয়।

ঢাকার উত্তরে, প্রধানত ভাওয়াল ও তেজগাঁও গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আনারস (Bromelia Ananas) জন্মে। এখানকার উৎপন্ন আনারস ‘ঢাকার আনারস’ নামে পরিচিত। বিদেশী কারখানায় নিযুক্ত পর্তুগিজ মিশনারি ও ইউরোপীয়দের সকলেরই শেখোক্ত স্থানে আনারসের বাগান ছিল এবং তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসৃত পরিচর্যার জন্যই সম্ভবত এতদঞ্চলের আনারস উৎকৃষ্ট।

লেবু

বিক্রমপুরে প্রচুর পরিমাণে লেবু (Citrus Medica) উৎপন্ন হয়। এ দ্রব্য প্রধানত ‘মসলিন’কে সাদা করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছ’রকমের লেবু এখানে জন্মে। এগুলোর মধ্যে কলম্বো ও বাতাসি সর্ববৃহৎ এবং এ দুটো জাত ‘মসলিনে’ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এলাচি ও কাগজি নামে লেবুর অপরদুটো শ্রেণী আছে। এগুলোর একরূপ ধরনের নামকরণের কারণ এই যে, প্রথমটি থেকে সুঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়টির ছিলকা কাগজ অপেক্ষা মোটা নয়। এসব লেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ‘শরবতী’ কমলার আকার ধারণ করে এবং এ থেকে মোরছা তৈরি হয় ও এ লেবু শরবতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ‘কাতজমারি’ আর এক শ্রেণীর লেবু। গ্ৰীহা বড় হলে এটা খেতে দেওয়া হয়।

সুপারি

সুপারি (Areca Catechu) জেলার দক্ষিণাংশে প্রচুর জন্মে। এ ফসল জমির মালিকদের জন্যে যথেষ্ট অর্থের যোগান দেয়। ত্রিপুরা জেলায় মেঘনার পূর্বতীরেও এর যথেষ্ট আবাদ হয়ে থাকে। শেখোক্ত এলাকায় প্রতি বিঘা জমিতে ৭০০ গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই জেলায় গাছ রোপণ করা হয় বাড়ির অথবা বাগানের চতুর্দিকে ঘিরে। আট বছর বয়স হতেই গাছ ফল দিতে শুরু করে। এবং একটানা ষোল বছর পর্যন্ত এতে ভালো ফলন দিতে থাকে।

তারপর ফলন হ্রাস পায়। বয়সানুসারে গাছের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে গড়ে একটি গাছের মূল্য হবে প্রায় আট আনা। নভেম্বর মাসে লোক দ্বারা গাছ থেকে সুপারি পাড়া হয়। মাটিতে না নেমেই এক গাছ থেকে অন্য গাছে গিয়ে সুপারির ছড়া ছিড়ে নেওয়া হয়। এইসব সুপারি পরে রোদে কয়েক বার শুকাতে হয়। অতঃপর মাটিতে বসানো একখণ্ড বাঁশের উপরে রেখে সুপারির খোসা ছাড়ানো হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে চাকুর ন্যায় তীক্ষ্ণ বাঁশের প্রান্তভাগের উপর দিয়ে সুপারি টেনে নিতে হয়। এ কাজ দক্ষ লোকে সাধারণত দু হাতে অথবা একই সময়ে একরূপ দুটো বংশ-যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করতে পারে এবং একদিনে সে প্রায় ৩৬০০টি সুপারির খোসা ছাড়তে পারে।

সুপারি রপ্তানি

রংপুর, আসাম ও আরাকানে সুপারি রপ্তানি করা হয়। এ সকল স্থানে খোসাসহ সুপারি পাঠানো হয়ে থাকে।

নারকেল গাছ

নারকেল গাছ (Cocos Nucifera) দক্ষিণাংশে বিশেষ করে রাজনগরে প্রচুর জন্মে। সপ্তম বছরে এ গাছে ফল ধরে এবং প্রত্যেকটি গাছ গড়ে ৭০টি ফল দিয়ে থাকে। এবং তা সাধারণত এক টাকায় বিক্রি হয়। ভাওয়ালে ‘সুনবুনিয়া’ নামে এক জাতের নারকেল গাছ আছে, যা তৃতীয় বছরেই ফল ধারণ করে থাকে। এর খোল খুব সুরু এবং শক্ত হয় বলে দেশীয় ইঁকা তৈরির জন্যে এসব নারকেলের চাহিদা খুব বেশি। অন্যান্য গাছের মধ্যে আম, কাঁঠাল, তেঁতুল ইত্যাদি সাধারণত চাষ করা হয়।

কশাদা গাছের চাষ

দুপ্রাপ্যতার মৌসুমে খাদ্যের যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৭৯২ সনে সরকারের অনুমোদনক্রমে এই জেলায় কশাদা গাছের (Jatropha Manihot) চাষের প্রচলন হয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এটা কখনো প্রচলিত হয় নি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়।

কফি ও আনাড়ু

কফি ও আনাড়ু (Bixa Orillana) জেলার উত্তরাংশে প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হত। কিন্তু এ দুটোর কোনোটাই ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক পণ্য ছিল না।

ইউরোপীয় শাকসবজি

ইউরোপীয় শাকসবজিগুলোর অধিকাংশই এখানে ভালো জন্মে। কিন্তু কর্মস্থলে বসবাসকারী কতিপয় ইউরোপীয় লোকদের বাগানেই এগুলোর চাষ সীমাবদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা এ সবের কোনোটাই উৎপন্ন করে না এবং এগুলো বাজারেও বিক্রয় হয় না। কলকাতার অবস্থাও অনুরূপ। দেশের এই অংশে উদ্যানতত্ত্ব অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কর্নেল স্টাসি ঢাকার সর্বসাধারণের নিমিত্ত পরীক্ষামূলকভাবে বাগান তৈরি করতে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন

সাহায্য করবে।

কৃষিক্ষেত্র

গ্রাম হতে কিছু দূরে অবস্থিত ক্ষেত্রের সীমানা জমির আল দ্বারা চিহ্নিত হয়। এ সব আল পথ সাধারণত উচ্চতায় দু থেকে তিন ফুট এবং প্রস্থে প্রায় এক হাত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য এগুলোই একমাত্র পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মূল্যবান ফসল উৎপন্ন করা হয়—এমন উচ্চভূমিতে অবস্থিত ক্ষেত্র ও বাগান নর্দমা বা পরিখা খনন করে পরস্পর পৃথক করা হয় এবং বাঁশের খুঁটি অথবা এরড তেলের গাছ (Ricinus Communis) বা বেতের (Calamus Retang) তৈরি বেড়া কিছুদূর অন্তর অন্তর রোপণ করে চারদিক ঘেরাও করা হয় এবং দু খুঁটির মধ্যবর্তী স্থান কতিপয় কাঁটা-ভালের শুকনো ডালপালা পুঁতে পূর্ণ করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলের দ্বারের চারদিকে গাছের বেড়া হিসেবে পারিজাত (Erythrina fulgens) মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় এবং এ একই উদ্দেশ্যে ডেরঙ (Jatropha Curecas) ও চিতা (Plumbago Zeylanica) শহরে প্রায়শই রোপণ করা হয়।

জমিতে সার প্রয়োগ

জমিতে সার প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সোনারগঞ্জ ও কক্সবাজারের বাগানে বেকনে মূল্যবান কস্যাদি উৎপন্ন করা হয়, কেবল সে সকল স্থানেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রথমোক্ত স্থানে পানের বাগানে সরিষার খৈল প্রয়োগ করা হয় এবং শেষোক্ত স্থানে কলাগাছের বাগানে গোবর সার ও নর্দমা বা কূপের পার্শ্বস্থ পলিমাটি ও উদ্ভিচ্ছ-জাত মিশ্রসার ব্যবহার করা হয়। পিনা (Pistia stratiotes) নামক আগাছা জলাভূমির উপর প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এগুলো সুপারি ও নারকেল গাছের গোড়ায় সার হিসেবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

পানি সেচ

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বৃষ্টির অভাব হলে বোরো ও রোয়া খন চাষের জন্যই কেবল পানি-সেচ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। একটা লম্বা গাছকে মাঝামাঝি স্থানে কেটে তার অর্ধেকের মধ্য থেকে গাছ খুঁড়ে নৌকা প্রস্তুত করা হয়। অভঃপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত দুটো বংশদণ্ডের নির্ভরবিন্দু হতে সেটাকে ওঠানামা করিয়ে পানি সেচ করা হয়ে থাকে।

কৃষি-যন্ত্রপাতি

প্রচলিত কৃষি-যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে রয়েছে লাঙল ও মই। দুই বা তিন ঝণ্ড বাঁশের মধ্য দিয়ে আড়াআড়িভাবে কতগুলো দণ্ড স্থাপন করে মই তৈয়ার করা হয়। জমি মসৃণ করতে ও বপনের পূর্বে ভূমি প্রস্তুত করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

বিদ্ধা বা বিদে মই বাঁশের তৈরি এবং এ একই উপকরণে তৈরি কতগুলো দাঁত-এর সঙ্গে লাগানো থাকে। একজোড়া বলদ দিয়ে এটা টানা হয়। আউশের ক্ষেতে চরলাগাছ খুব

ঘন হলে তা পাতলা করার জন্য এবং আগাছা দূরীকরণার্থে এটি ব্যবহৃত হয়। মুগুর একটা ভারী কাঠ দ্বারা তৈরি; চাষ দেওয়ার পর জমির উপরের বড় বড় শক্ত মাটির তাল বা ঢেলা ভাঙবার জন্য এর ব্যবহার চলে। অন্যান্য যন্ত্র হচ্ছে 'ছেনি' (এটা আগাছা দূর করার জন্য ব্যবহৃত লোহার তৈরি যন্ত্রবিশেষ), কাঁচি, কোদাল, কুড়াল, খন্টা ও দা ইত্যাদি। এগুলো দেশের অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত একই শ্রেণীর যন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।^১

গবাদিপশু

এ জেলার কৃষিকাজে ব্যবহৃত গবাদিপশু নিম্ন জাতোদ্ভব, দুর্বল ও ক্ষুদ্র এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহের গবাদিপশু অপেক্ষা খর্বাকৃতির। সূর্য ওঠার সময় থেকে চাষের কাজ শুরু হয় এবং দুপুরে শেষ হয়। এ সময়ের মধ্যে দু জোড়া বলদ পালা বদল করে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। সুসলমান কৃষক মাঝে মধ্যে গাই-গরু দিয়েও চাষের কাজ চালিয়ে থাকে; কিন্তু ষাঁড়ের তুলনায় এর দ্বারা অর্ধেক সময়ের বেশি কখনো কাজ করানো হয় না। চিনি ও তেলের কলে এবং জিনিসপত্র বহনে সাধারণত উত্তর প্রদেশ বা পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বলদের নিয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

ধান কাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ

ধান গাছের শীষ হতে প্রায় তিন ফুট নিচে থেকে কেটে আঁটি বাঁধা হয় এবং প্রত্যেকটি আঁটির পরিধি প্রায় আধহাত। এসব ধানের আঁটি জলপথে, নৌকায় এবং স্থলপথে জাফরিবিশিষ্ট গরুর গাড়িতে করে রায়তদের বাড়ি নেওয়া হয়। শীষ থেকে ধান পৃথক না করা পর্যন্ত তা গাদা মেরে বা পালা বানিয়ে রাখা হয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মতো, এখানেও বলদ দিয়ে মাড়িয়ে গাদা থেকে ধান পৃথক করা হয়ে থাকে। ধান খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বলদের মুখে মুখোশ পরাবার পদ্ধতি পুরাকালে 'জুডো'র মতোই লক্ষ করা যায়। 'ধান কা কেন্নায়' একত্রে যে কয়টি বলদ জোড়া হয় তার সংখ্যা একটি অগ্রবর্তী বলদসহ তিন থেকে পনেরটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। শেষোক্ত সংখ্যার গরু দ্বারা ৩০ মন ধান মাড়ানো যেতে পারে।

ধান মাড়ানোর কাজ শেষ হলে তা রোদে শুকাতে দেওয়া হয়; অতঃপর মাদুর ও বাঁশ দিয়ে তৈরি কয়েক ফুট উঁচু মোড়া রায়তদের ঘরে পেতে তাতে ধান গুদামজাত করা হয়।

ডাল, সরিষা ও অন্যান্য অল্প পরিমাণ শস্য লাঠি দ্বারা পিটিয়ে বের করে নেওয়া হয় যেভাবে ইহদিরা প্রাচীনকালে ডুমুর ও জিরা পিটিয়ে নিত।^২ ধানছাঁটা সাধারণত গ্রামে 'উকলি' বা গাছের তৈরি মুষল ও উদূখলের সাহায্যে হাত দিয়েই করা হয় এবং শহরাঞ্চলে টেকির সাহায্যে করা হয়ে থাকে। রায়তগণ এ যন্ত্র এরগু তেল ও জাফরানের বীজ গুঁড়ো করার জন্যও ব্যবহার করে। পরে এ গুঁড়ো গরম পানিতে ফেলে উপর থেকে তেল ছেঁকে নেওয়া হয়।

১ এ সকল যন্ত্র দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

২ ঈশাই ২৮-শ অধ্যায়, ২৭ স্তবক।

দুগ্ধবতী গাভী

এ জেলার দুগ্ধবতী গাই-গরু বাংলাদেশের সেরা। ‘দেশালী’ জাতের গাই-গরু শহরে পালন কর হয়। এবং এগুলোকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা আছে। উত্তর বিভাগের দিল থেকে দাস এনে এসব গাই-গরুকে খাওয়ানো হয়। মোষের দুধ সবটাই দই ও ছি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পনির

এ স্থানে এবং ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে প্রচুর পরিমাণে পনির প্রস্তুত করা হয় এবং তা দেশের বিভিন্নাংশে এবং বিদেশে জেদ্দা, বসরা প্রভৃতি জায়গায় রপ্তানি হয়।

মেঘ, ছাগল ইত্যাদি

মেঘ, ছাগল, পাঁতিহাস, কুকুট, কবুতর ইত্যাদি বিক্রয়ার্থে পালিত হয়। এগুলো এখানে প্রচুর। প্রথমোক্তটি দশ আনায় এবং কুকুট ও পাঁতিহাস এক-একটি ছ পয়সায় কেনা যায়।

কম্বল

শহরের সন্নিগটে কম্বল তৈরির কাজে দু-তিন জন তাঁতি নিয়োজিত আছে। এরা মেঘের পশম ক্রয় করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পশম নিম্নমানের বলে রায়তরা এসব পশম ফেলে দেয়।

ভূমির মাপ

জেলার ভূমির মাপ হচ্ছে দরুন, খাদ্দা ও বিঘা; কিন্তু প্রথম দুটো যথাক্রমে কানি ও পাখিরই নিম্নমানের সংজ্ঞা হিসেবে পরিচিত এবং এগুলোই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। পাখি সাধারণত উত্তর বিভাগের উচ্চভূমির মাপ, অন্যদিকে নিম্ন ও কৃত্রিম উচ্চভূমির জন্য জেলার সর্বত্র ‘কানি’র মাপ অনুসরণ করা হয়।

মাপের পদ্ধতি

হাত হচ্ছে মাপের একক এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি দণ্ড বা নল দিয়ে জমির পরিমাপ করার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। সচরাচর জমি মাপার জন্য ৭ ½ হাতের ‘নল’ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটাকেই এই জেলার রৈখিক মাপের ‘আদর্শ’ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু ছ থেকে পনের পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসরের অন্যান্য দৈর্ঘ্যের ‘নল’ও প্রচলিত আছে এবং এজন্য কাঁচা ও পাকা এ দুটো মনগড়া পার্থক্য দেখা দিয়েছে। উপরের সংজ্ঞার সঙ্গে এগুলোর প্রয়োগে নতুন সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে যেমন, কাঁচা কানি ও কাঁচা পাখি এবং পাকা কানি ও পাকা পাখি ইত্যাদি। জমিদারগণ তাদের প্রজাদের সঙ্গে চুক্তিপত্র করার কাজে এবং রাজস্ব অফিসারদের সাথে ভূমির বন্দোবস্ত করতে প্রথমোক্ত মাপ ব্যবহার করে থাকে; এবং শেষোক্ত মাপ জমি বিক্রয় করার জন্য সর্বদা ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ব্যবহৃত ‘নল’ অনুসারে দরুন ও খাদ্দার কালি হবে নিম্নরূপ।

নলের দৈর্ঘ্য		কালি			
	একর	রোদ	পার্চ	বর্গফুট	
দরুন	৯	হাত	= ৩২	০	২১
	৮	"	= ২৫	১	১০
	$৭\frac{১}{২}$	"	= ২২	১	১৩
খাদা	$৭\frac{১}{২}$	"	= ৫	২	১৩
	$৬\frac{১}{২}$	"	= ৪	০	৩০
	$৭\frac{১}{২} = ১$ নল		↑ $৭\frac{১}{২}$ হাত = ১ নল		
১২ নল দৈর্ঘ্যে	= ১ কানি		৬ নল দৈর্ঘ্যে = ১ পাখি		
১০ " প্রস্থে			৫ " প্রস্থে		

বিঘার মাপ

বিঘার মাপ সাধারণত নীল ও জাফরান ক্ষেতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে দু প্রকার বিঘার ব্যবহার প্রচলিত আছে; যেমন, একটি হল ১০০ হাত বর্গের এক বিঘা; এটা ২ রোদ, ২ পার্চ ও $১৭৯\frac{1}{2}$ ফুটের সমান। অন্যটি হচ্ছে ১০০ × ৮০ হাতের এক বিঘা। এটা ১ রোদ, ২৬ পার্চ ও $৩১\frac{1}{2}$ ফুটের সমান।

খাজনা ও রায়তগণ

জমির স্বাভাবিক গুণ, উচা-নিচা, বছরে কটি ফসল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনুসারে ভূমির খাজনার মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। জঙ্গল ও নতুন গঠিত চর এলাকার জমি প্রথম বছরে বিনা খাজনায় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বছরে অল্প খাজনা ধরা হয়ে থাকে এবং তা চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় পূর্ণ খাজনা ধার্য করা হয়।

চর এলাকার জমি রায়তদের সাধারণত চর এলাকার জমি চাষ করতে অনুরাগী হতে দেখা যায়। ভিটি বা কৃত্রিম উচ্চভূমির মূল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার অবস্থান, উচা পুরোনো না নতুন তৈরি এবং তাতে কী পরিমাণ গাছ বিদ্যমান রয়েছে তার ওপর। বিক্রমপুরে এই মূল্য কানি প্রতি পাঁচ থেকে তিরিশ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, জেলার পশ্চিমাংশে প্রতি পাখির মূল্য হবে গড়ে চার টাকা। কোনো রায়ত নতুন 'ভিটি' তৈয়ার করলে তার জন্য তার কাছে তিন বছর যাবৎ কর ধার্য করা হয় না।

আখ, তুলা, জাফরান ও নীল চাষের নিমিত্ত যে জমি দেওয়া হয়—সেসব জমির খাজনার হারের মধ্যে দেশের বিভিন্নাংশের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই ফসলগুলোর প্রথমটি যে জমিতে চাষ করা হয় তার খাজনা সাধারণত ধানী জমির খাজনা অপেক্ষা শতকরা ২৫ অথবা ৩০ ভাগ বেশি। জেলার পশ্চিমাংশে নীলের জমির খাজনা বিঘা প্রতি ৬ আনা ধার্য করা হয়। কিন্তু চর এলাকায় যেখানে চাষাবাদ চলে সে স্থানের জন্য ধানী জমি অপেক্ষা কম খাজনা দিতে হয়। ধানী জমির মধ্যে বোরো বা রোপা ধানের জমি সর্বাপেক্ষা অধিক হারে এবং আউশের জমি সর্বাপেক্ষা কম হারে দেওয়া হয়। যে জমিতে দুটো ফসল; যেমন, চোটনা ধানের ক্ষেতে ডাল ও ক্ষুদ্র শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে সে জমির খাজনা এক-ফসলী

জমির খাজনা থেকে এক-পঞ্চমাংশ বেশি নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় শস্য যদি খুব মূল্যবান হয়; যেমন, তুঙ্গো ও জাফরান, তা হলে এই হার হবে এক-তৃতীয়াংশ বেশি। নদী দ্বারা জমির পরিবর্তন সাধিত হলে তুলনামূলকভাবে এর মূল্যও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে জেলার কোনো কোনো অংশের জমির মূল্য শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা আবার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাজনা সাধারণত নগদ অর্থে প্রদান করা হয়। এটা প্রতি মাসে অথবা ৪ বা ৬ মাস অন্তর আদায় করা হয়ে থাকে। বার্ষিক খাজনা প্রদান কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

বর্গা পাট্টা প্রদান

কখনো কখনো তালুকদার বা ইজারাদারগণ তাদের জমি বর্গা পাট্টা দিয়ে থাকে। এই প্রথা ইউরোপ মহাদেশের খামারের 'মেটায়ার' (Metayer) সম্পত্তি ভোগের অনুরূপ। এ প্রথায় তালুকদার বা ইজারাদার তার সম্পত্তি রায়তকে করমুক্ত হিসেবে দেয় এবং প্রয়োজনীয় বীজের অর্ধেক প্রদান করে, রায়ত বাকি অর্ধেক বীজের যোগান দেয়, জমি চাষ করে, শস্য কাটে এবং উৎপন্ন ফসল দুজনের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে নেয়। রায়ত যদি খুব দরিদ্র হয় এবং তার বীজ ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকে, তা হলে সে বীজ-বিক্রেতার সাথে বীজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে সে এই অঙ্গীকার করে যে, তার জমিতে উৎপন্ন ফসলের একাংশ সে বীজ-বিক্রেতাকে প্রদান করবে। আবার যদি তার হালের গরু নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে সে প্রতিবেশীর দ্বারা জমি চাষ করিয়ে নেয়। এবং এর জন্য তাকে সাধারণত টাকা প্রদান করতে হয়। গঙ্গার এপারে রায়ত বা জোতদারগণের মধ্যে যাদের জমির উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'কায়েমী স্বত্ব' রয়েছে তারা ব্যতিরেকে অন্য সকলেই মনে করে যে, যে জমি তারা চাষ করে তার উপর তাদের মালিকানা বা জোত হস্তান্তরের কোনো অধিকার নেই। অতএব, বর্গা ব্যতীত তারা জমি পুনঃ ইজারা দিতে পারে না।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে ফরিদপুর জেলায় এর বিপরীত ব্যবস্থা সাধারণভাবে চালু রয়েছে। সেখানে জোতদার তার সম্পত্তি দর-ইজারা দেওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে এবং জমিদার তার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না। কোনো রায়তকে তার নিজস্ব এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় বা অন্য জেলায় গিয়ে বাস করতে কমই দেখা যায়। তবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার কর্তৃক লাভজনক কোনো প্রস্তাব দেওয়া হলে সে প্ররোচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে তার সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা ও পুনরায় ঘর তোলার খরচপত্র জমিদারই বহন করেন। এ ছাড়া, তার খামারের গবাদি পশুসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে যাতে সে সক্ষম হয় তার জন্য সুদমুক্ত অর্থও এক বছরের জন্য তাকে অগ্রিম প্রদান করে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রথা রায়তদের জন্য কিছুটা সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এটা পরোক্ষভাবে তাদেরকেই উৎসাহিত করে, যাদের জমির খাজনা অনেক বাকি পড়েছে এবং জোত জমি ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে তাদেরকে সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং এই জেলায় এ নিয়ে প্রায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তা গুরুতর বিবাদে পরিণত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে করনির্ধারণের পদ্ধতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে কর নির্ধারণে জমিদাররা যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তা হল— ফসল কাটার প্রারম্ভে রায়তদের জমির পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক উভয়ের সম্মতিক্রমে জমির

উৎপাদন নিরূপণ করে কর ধার্য করা। কৃষকদের কাছ থেকে কোনো কর আদায় করা হয় না, কিন্তু যারা নতুন জমি আবাদ করে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করে সম্ভবত ঐ চাহিদা পূরণ করা হয়ে থাকে। কর নির্ধারণের মাপকাঠি যাই হোক না কেন, তা কখনো জমিদার কর্তৃক নির্ধারিত হয় না। সুতরাং, পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হলেও তা রায়তদের কোনো উপকারে আসে না। এ জন্যই জীবন ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি তারা চাষ করতে কখনো উৎসাহ পায় না। এ ধরনের উৎপীড়নের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, রায়তরা পুরোনো প্রতিষ্ঠিত রীতির যে কোনো রদবদলের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করত এবং যখন পাট্টা বা ইজারা প্রথা প্রথম প্রচলিত হয় তখন তারা গ্রাম পরিত্যাগ করার হুমকি প্রদান করে। এজন্য লিখিত কোনো চুক্তি প্রবর্তিত করাতে বা বর্তমান প্রথানুযায়ী ‘কবুলিয়াত’ মঞ্জুর করিয়ে তার পরিবর্তে কোনো দলিল পেতে তাদের বেশ সময় লেগেছিল।

রাজস্বের অন্যান্য উৎস

কর্ষণযোগ্য ভূমি থেকে যে কর আসত, তা ছাড়াও অন্য অনেক উৎস থেকে জমির মালিকরা রাজস্ব লাভ করত। নানকর, বনকর ও জলকর আঞ্চলিক অর্থে রুটি, বন ও জল ইত্যাদি যে বিরাট তিনটি কর প্রদান থেকে মুঘল শাসনামলে জমিদারগণকে অব্যাহতি দেওয়া হত—তার মধ্যে শেষোক্ত দুটো থেকে কোনো কোনো তালুকের বেশ লাভ হত। সেই সমস্ত লোককে পতিত জমি খামার তৈরির জন্য খাজনায় বিলি করা হত—যারা ঘাস, নল খাগড়া ও ঝোপজঙ্গল কেটে গবাদি পশুর ঘাস, গৃহের ছাউনি ও জ্বালানি সংগ্রহ করত। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘বনকরের’ অধিকার ভোগ করত এমনসব লোক—যারা ভূমির মালিক নয়।

জলকর

অসংখ্য নদনদী ও জলাভূমিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এবং জলকর অর্থাৎ এ সকল উৎস থেকে যেসব রাজস্ব আসত তার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল। ঝিলগুলোর আয়তনানুসারে এগুলো থেকে ৫ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত হারে বন্দোবস্ত দেওয়া হত। জেলেদেরকে ‘জিরাতি’ রায়ত বলা হত। তারা নদীর উপর নৌকায় কতজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কর আদায় হত। আবার কোনো কোনো জায়গায় ভিটি জমি ও মাছ ধরার অধিকার বাবদ একটি নির্দিষ্ট কর প্রদান করতে হত। বর্ষাকালে প্রাবনাবস্থায় নদীতে মাছ ধরার নির্দিষ্ট স্থানগুলোর মূল্য অনেক হ্রাস পায়। তখন জিরাতি রায়তগণ অল্পকর প্রদান করে থাকে। সেসব জেলে এ ঋতুতে দেশের অন্যান্য স্থানে গিয়ে মাছ ধরে, সেখানে পূর্বে তাদেরকে জলকর দিতে হত না। এদেরকে “ভাসাতনিয়া রায়ত” নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদেরকে ‘জিরাতি রায়ত’দের সমান কর দিতে হয়। প্রাবিত ভূমিতে মাছ ধরার অধিকারকে ‘কালাপানি’ নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং নদীতে সব সময় মাছ ধরা থেকে এটা ছিল স্বতন্ত্র। ‘বনকরের’ ন্যায় এইসব ভূমিও এমন সব লোকদের অধিকারে থাকে যারা প্রকৃতপক্ষে এর মালিক নয়।

জেলেদের নিকট মাছ ক্রয় করে যারা শহরের বাজারগুলোতে সরবরাহ করে তাদেরকেও ‘জিরাতি রায়ত’দের ন্যায় সমান কর জমিদারদেরকে দিতে হয়।

খেয়াঘাট ও হাট

খেয়াঘাট, হাট বা সাপ্তাহিক বাজার ইত্যাদি থেকেও জমির মালিকরা প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে।

জমিদারদের রাজস্বের অন্যান্য উৎস হল চিনির কল ও পানের বাগানের উপর আরোপিত কর এবং ‘পূর্ণিয়া’ বা বার্ষিক জমি বন্দোবস্তের দিন, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে উপঢৌকন বা নজর লাভ এবং ঝগড়া-কলহের নিষ্পত্তির জন্য জমিদারদের শরণাপন্ন হলে তার নির্মিত ধার্যকৃত জরিমানা ইত্যাদি।

তালুকদারগণ

সীমান্ত অঞ্চলের জেলাগুলোর ন্যায় ঢাকা জেলাও বহি আক্রমণের শিকার ছিল। মুঘল যুগের প্রথম দিকে এটাকে কতকগুলো ছোট ছোট তালুকে বিভক্ত করা হয়। এবং বহিআক্রমণ থেকে প্রদেশ রক্ষার্থে যে সমস্ত লোককে নিয়োগ করা হত, সাধারণত তাদের নামেই এসব তালুক নবাবগণ কর্তৃক মঞ্জুরি প্রদান করা হত।

তালুকগুলোর মধ্যে অধিকাংশেরই নৌবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্ধারিত ছিল এবং এগুলো ‘আম্লে নওয়ারাহ’ নামক জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জেলার দলিল দস্তাবেজে ‘তাকসিম-ই তালুকদারের’ নামোল্লেখ রয়েছে। ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তেওড়মলের তৈরি “তুমার-ই জমা” বা খাজনার তালিকায় যাদের জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তাদেরকেই এ নামে অভিহিত করা হত। তারা শুধু জমির মালিকই ছিলেন না, পরবর্তী কালে তাদেরকে স্বাধীনও করে দেওয়া হয়েছিল। রাজস্ব সহজে আদায় করার জন্য পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট তালুকের দায়িত্ব গোড়াতেই বড় বড় তালুকদারের কাছে অর্পণ করা হত। তিনি ঐ সকল তালুকের খাজনা আদায় করতেন এবং নিজস্ব তালুকের খাজনাসহ সরকারের নিকট প্রদান করতেন।

জমিদার শব্দের উৎপত্তি

উপরি-উক্ত কাজের প্রেক্ষিতে তাঁকে জিম্মাদার বা জমিদার (জিম্মা বা দায়িত্ব থেকে) বলা হয়। যে সকল তালুকের রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন—সেগুলো থেকে তাঁর মূলসম্পত্তি পৃথক করে বুঝাবার জন্য “নিজ বা নিজস্ব” কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং তাঁর জিম্মাদারী হস্তান্তর করার সময় তিনি নিজস্ব সম্পত্তিও হস্তান্তর করতে পারেন অথবা ক্রেতা এর জন্য দাবিও করতে পারেন।

হাওলাদার (যে ব্যক্তি তালুকদারকে খাজনা প্রদান করে থাকেন) ছাড়া তালুকদার মূলত চার শ্রেণীর ছিল।

জঙ্গলবাড়ি তালুকদার

দেশটা তন্নয় বিভক্ত হওয়ার পূর্বে যে সকল লোক জঙ্গল পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করত তাদেরকে এ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাকসিম বন্দী হওয়ার পর নতুন আবাদী জমিকে

তালুক বিবেচনা করা হত। এবং তা নিকটস্থ জমিদারের খাজনা তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সরকার কর্তৃক জমিদারের অংশের বৃদ্ধি বা হ্রাস মঞ্জুর করা হলে তার আনুপাতিক ভাগ তালুকদারের অংশেও পড়ত। এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ দখল করা যেত, কিন্তু কোনো সন্তান-সন্ততি না রেখে কোনো তালুকদার মারা গেলে সরকারের পক্ষে জমিদার ঐ তালুকের ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হতেন।

জোর-খরিদ তালুকদার

এই শ্রেণীর তালুকদারদের জমিদারের অনুমতি ব্যতিরেকেই তাদের তালুক বিক্রয় করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু কোনো তালুকদারের উত্তরাধিকারী না থাকলে জমিদার তার সম্পত্তি দখল করে নিজ অধিকারে রাখতে বা বিক্রয় করতে পারতেন। জমিদারির বৃদ্ধি বা কমতির আনুপাতিক হারে তালুকদারগণ তালুকের বৃদ্ধি বা কমতির অধিকারী ছিলেন এবং তদানুসারে কবও নির্ধারিত হত।

পাট্টা তালুকদার

জমিদার ও চৌধুরীগণ তাদের অধিকারভুক্ত কোনো আবাদী বা অনাবাদী সম্পত্তির তালুকদারি-পাট্টা যে কোনো লোককে অনুমোদন দিতে পারতেন এবং এতে একরূপ চুক্তি করা হত যে, তালুকদারগণ চুক্তির আওতাভুক্ত সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হবেন এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ চিরদিনের জন্য এ-সবের ভোগ দখল তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। কিন্তু তালুকদার কিংবা জমিদার কেউই তা ক্রয় করতে পারবেন না; তবে কোনো তালুকদারের উত্তরাধিকারী কেউ না থাকলে ঐ তালুক জমিদারের অধিকারে চলে যাবে। জমিদারের রাজস্বানুসারে পাট্টা তালুকের রাজস্বেরও বৃদ্ধি বা কমতি অনুমোদিত হত।

ওয়াসাত তালুকদার

জোর-খরিদ তালুকদার ও জমিদারের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, ওয়াসাত তালুকদার ও অন্যান্য তালুকদারের মধ্যেও সেই একই রকম সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

হাওলাদার বা করদাতা

বিক্রমপুর এবং জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত তালুকের কোনো অংশের ক্ষেতাকে ঐ অংশের হাওলাদার নামে আখ্যায়িত করা হত। সে তার কর তালুকদারকে প্রদান করত। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো কলহ-কোন্দল দেখা দিলে এ সম্পর্ক ছিল হয়ে যেত এবং তার সম্পত্তি অন্য কোনো তালুকদারির অধীনে সংযুক্ত করে দেওয়া হত। এই সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে অর্জন ও হস্তান্তর করা যেত এবং অন্যান্য করদাতার ম্যায় এর মালিকও রাজস্বের বৃদ্ধি বা কমতির অধিকারী ছিল। এ জেলার অধিকাংশ তালুকই ক্ষুদ্র খণ্ডভূমিতে বিভক্ত এবং অনেকগুলো পরগনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৮৩৬-৩৭ সনে অত্র কালেক্টরিটে মোট তালুকের সংখ্যা ছিল ৭১৫৪; এগুলোর মধ্যে ৭০২টি তালুক ঢাকা কাছারিতে এবং ১৪৯টি তালুক ফরিদপুরের কাছারিতে রাজস্ব জমা দিত।

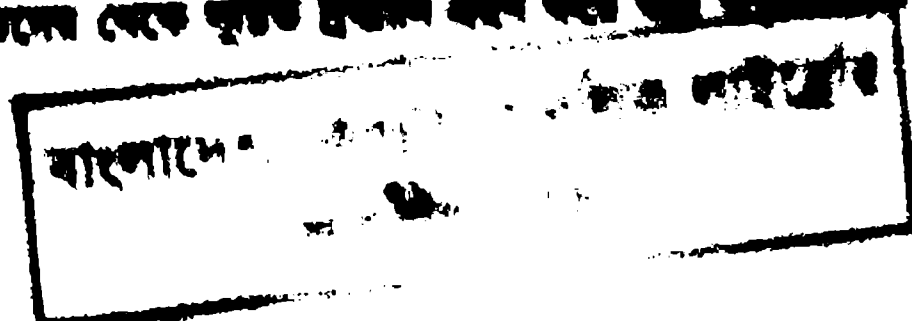
ঢাকা কাছারির সঙ্গে সমুদ্র ডাকু-কল্লোর বাণিজ্যের বিভিন্ন দাবি নিয়েও তালিকার সেখানে
হয়েছে।

ছোট ৭০২৫

100-44361-1

ভালুকদারদের খুলনার জমিদারদের সংখ্যা ৬ জনের কম। অন্যদিকে জমি কল্যাণকরতার দ্বারা এই প্রদেশের অনেক জমিদার অত্র জেলায় ১ হুট জমিদার হালিক ছিলেন না। অল্পকাল মধ্যে জমিদার বহু লাভি করেছিলেন এবং প্রচলিত হাঙ্গুলে তাঁদের অকৃতজ্ঞতায় কল্যাণকরতার দ্বারা ক্ষয় করা হয়েছিল।

এ জেলার জমিদারগণ মূলত অহিনিসম্মান ছিলেন। যুবক সরকারের সমান অনুভবের উপর
ম্যাজিস্ট্রেটের বা স্যার বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাঁদের নিজ নিজ এসেবস
কোনো সম্পত্তি হুমি হয়ে গেলে তার মূল্য বা অতিশূন্য সেওয়ার জন্য তারা দায়ী করতেন।
কোম্পানি কর্তৃক তাঁদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও এই সমস্ত তাঁদের অকোমলতার
জন্য এ জেলা যথেষ্ট পরিমাণে দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিল। জেলার প্রবাসীদের সমস্তা বৃদ্ধি
শেষেছিল এবং তারা এত দুর্ভিক্ষ ছিল যে, কারো পক্ষে পছন্দের কাঁচের ভাঙা ছোট্টই বিক্রয়
ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, জমিদারগণ সিংহেরই প্রকলভদের সঙ্গে জড়িত
ছিলেন। ঐরা ভাঙাভদের থেকে মুক্তি প্রদান এবং অন্য অন্য প্রকলভদের হিন্দুকে বন্ড
করতেন।



মগদের প্রতিরোধকল্পে নৌকা ও লোক সরবরাহের শর্তে অনেক ভূমির কর দেওয়া হত না

অনেক জমিদারকে প্রায়শ্বেই নিজের ভূমি মঞ্জুর করা হয়েছিল এই শর্তে যে, তাঁরা এ জেলায় মগদের অক্রমণ প্রতিরোধ করে নৌকা ও লোক সরবরাহ করবেন এবং এভাবে যে ভূমি তাদের দখলে ছিল তাকে 'নওয়ানাহ' বলা হত।

যাঁরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে অভিযানে অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদেরকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত

যে সকল জমিদার নিজেরাই এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের এই ব্যক্তিগত কার্যের বিবেচনায় তাঁদেরকে আরো বেশি ভূমির মঞ্জুরি প্রদান করা হত। এসব ভূমি সাধারণভাবে 'নওয়ানাহ'—এর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও একে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য "হিসসা জেতে" নাম অথবা নদী বা দেশের যতটুকু অংশ তাঁরা পাহারা দিতেন তা বুঝাবার জন্য অন্য কোনো নামে অভিহিত করা হত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারদের উন্নতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের বর্তমান অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হয়েছে বলে মনে হয়। কালেক্টর মি. ডে-এর মতে, "১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তাদের মধ্যে কোনো লোক ধনী কিংবা সমৃদ্ধ ছিলেন না।" তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এই জেলায় তাঁর ১৫ বছরব্যাপী বসবাস কালের মধ্যে তিনি এমন কোনো জমিদার বা করদাতার নাম কখনো শোনেন নি, যিনি ভূমি বন্ধক দেওয়া ব্যতীত, শহরের কোনো বণিকের ন্যায় সম্মান বজায় রেখে চলতে পারতেন।

এর মূল কারণ

জমিদারদের এই সংকটের কারণ ছিল এই যে, তাঁরা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাপনা নায়েবদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যারা অর্থ আত্মসাৎ করতে গিয়ে সবরকম পন্থাই অবলম্বন করত। এবং এর মনিবদের অর্থে নিজেরদেরকে বিস্তারিত করে তুলেছিল।

টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি

টাকা সংগ্রহের তখন সাধারণ পদ্ধতি ছিল ঋণ। ঋণের টাকার দুই বা তিনগুণ বেশি মূল্যে শরফদের (শরীফ) কাছে তাদের তালুক বন্ধক দেওয়া হত এই চুক্তিতে যে, "জমির ফসল শুধু কর টাকার সুদ হিসেবে গণ্য হবে এবং কেবল আসল টাকা প্রদান সাপেক্ষে জমি ফেরৎ পাওয়া যাবে।"

জমিদারদের বর্তমান অবস্থা

এখানে জমিদারগণের অবস্থা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তাঁদের অবস্থা তিন্তর। এদের অধিকাংশই বর্তমানে বিস্তারিত ও শহরের বাসিন্দা। তালুক থেকে প্রাপ্ত আয়ের সাহায্যে তারা এখন প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে সক্ষম।

বর্তমান আর্থিক সংকটের কারণ

অল্প সংখ্যক জমিদার যে বর্তমানে অর্থ কষ্টের মধ্যে এখন নিপতিত রয়েছেন তার জন্য তাঁদের নিজেদের মধ্যকার কণড়-কলহই প্রধান নহে। এই সব কলহের মোকাবিলা করবার জন্য তাঁদের বহু অর্থ ব্যয়ে অনেক লোক পুষতে হয়, ব্যয়বহুল নান্দ-মোকাবিলা পরিচালনা করতে হয় এবং রাষ্ট্রতাদের স্থানান্তরিত করতে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

তালুকের অংশীদারদের মধ্যে কলহ

তালুকের অংশীদারদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে সৃষ্টি হয় পটপটবিহীন দল-কলহের। এটা তাঁদের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। উদ্ভিদবিদ অংশীদারদের পটপটবিহীন মতানৈক্য ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মতানৈক্যের কারণে দলভুক্ত জমিদার করতে গিয়ে সম্পত্তি বিক্রয় করতে হয়।

নদীর গতি পরিবর্তন—জমিদারদের কখনো উপকার করে, কখনো ক্ষতিসাধন করে

নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে যে সমূহ ক্ষতি সাধিত হয় তা সহজে নিরূপণ করা সম্ভব নয় তবে এর ফলে কোনো কোনো তালুক ক্ষতির কবলে পড়ে, অপর কোন কোন তালুক নতুন ভূমি বৃদ্ধি পাওয়ার উপকৃত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমির ক্ষয় হয় এবং কিছু অন্যস্থানে হয়তো ছোট ছোট নানা ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে ভূমি বৃদ্ধি পায়। জমিদারদের নিজেদের মধ্যে টাকা ঝগড়া করার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ভূমি “ইজারা প্রদান” অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিজমা বালোকস্ত রাখা। কিন্তু এ জাতীয় ভূমি বালোকস্তের মোট পরিমাণ এই জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় খুব কম ছিল।

১০০০ টাকার উর্ধ্ব রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারদের সংখ্যা

যে সকল জমিদার ১০০০ টাকার উর্ধ্ব রাজস্ব প্রদান করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ১৮৩৬-৩৭ সালে কালেক্টরেটের রেকর্ডে রেজিস্ট্রিকৃত সংখ্যানুসারে ৬৫ জনের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন হিন্দু, ২০ জন মুসলমান এবং ৩ জন খ্রিস্টান। হিন্দুদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ৮ জন বৈদ্য, ১৪ জন কায়স্থ এবং ৭ জন শূদ্র।

জমিদারি রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী

কোনো জমিদারের কর আদায় ও হিসাব সম্বন্ধে নিযুক্ত কতজন কর্মচারী প্রয়োজন তা নির্ভর করে তাঁর জমিদারির আয়তন, অবস্থান ও অংশীদারদের সংখ্যার উপর। কোনো কোনো পরগনা বা তালুকে কতকগুলো গ্রাম একত্র করে রাজস্ব আদায় করা হয়; একে বলা হয় তাম্রা। অন্যান্য তালুককে বলা হয় ‘জোড়’।

মণ্ডল ও তার কর্তব্য

প্রত্যেকটি মৌজা বা গ্রামে একজন কর্মচারী থাকে; তাকে বলা হয় মণ্ডল।^১ তার কাজ হল জমির তত্ত্বাবধান করা ও রাষ্ট্রতদের মধ্যে তাদের নিজেদের তত্ত্ব কোনো বিষয় নিয়ে কলহ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করে দেওয়া।

১ ছানদার, হালদার বা শায় নামেও পরিচিত।

পাটোয়ারী ও তার কর্তব্য

দু-তিনটি গ্রাম বা একটি তপ্পার উপরে রয়েছে পাটোয়ারী।^২ তার কাজ হল হিসাব রাখা, রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং তার নিকট জমি বণ্টনের ব্যাপারে কোনো বিভিন্তার বিষয় উল্লেখ করা হলে তার সংশোধন করে দেওয়া।

আরো উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ

জমিদারি বড় আকারে হলে আরো উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। একে বলা হয় 'চাকলাদার' বা তহসিলদার। ইনি পাটোয়ারীর উপরে প্রভুত্ব করে থাকেন। আবার পাটোয়ারী খবরদারি করেন মণ্ডলের উপর। সমস্ত হিসাব প্রস্তুত করে তা জমিদার বা তাঁর নায়েবের নিকটে দেওয়া হয়। সে তা কর-নির্ধারণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী মোহরার বা 'তিত্নবীস' নামক লেখকের কাছে হস্তান্তর করে, তার কাছে থেকে তা আদায় ও খরচের হিসাব রাখার জন্য 'অতপারনবীস' নামক অন্য একজন লোকের নিকট প্রেরণ করে। এবং এ দুজন কর্মচারী তাদের নিজ নিজ বিভাগের বিভিন্ন প্রকারের হিসাব ঠিক করে তার একটি সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করে; এটাকে বলা হয় 'এহ্সাব-হিসাব'। এই দুটো অফিসে আরো কয়েকজন অন্যান্য কর্মচারী রয়েছে; যেমন, খাজাঞ্চী, পোদার বা টাকা আদান-প্রদানকারী, পত্র লেখক প্রভৃতি।

কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে জমিদার বছরে অন্তত একবার তাঁর জমিদারি পরিদর্শনে বের হন, অথবা একজন বিশ্বস্ত আমীন নিযুক্ত করে প্রয়োজনবোধে জমির মাপ ও ভূমির জরিপ কার্য করিয়ে নেন।

প্রধান প্রধান জমিদারের দেওয়ান ও উকিল

উপরি-উক্ত কর্মচারী ছাড়াও প্রধান প্রধান জমিদারের একজন করে দেওয়ান থাকে এবং জেলা কোর্টে কার্যাদি পরিচালনা করার জন্য একজন উকিল ও এটর্নি নিযুক্ত থাকে। জমিদারি কাছারি পাহারা দেওয়া, বিপদসঙ্কুল গ্রামগুলোতে কর আদায়কারীদেরকে সাহায্য করা এবং পরগনা থেকে টাকা-পয়সা জমিদারদের বাসভবনে বা সদরদপ্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য থাকে একজন জমাদার ও কয়েকজন বরকন্দাজ বা পাইক।

ছোট ছোট তালুকদার

ছোট ছোট তালুকদার সাধারণত একজন মণ্ডল নিযুক্ত করে এবং পাটোয়ারীর সাহায্য ছাড়াই নিজেরা রাজস্ব আদায় করে থাকে; অথবা তিন-চারজন তালুকদার একত্রে একজন পাটোয়ারী নিযুক্ত করে। কতিপয় জমিদারি ও তালুকে মণ্ডল ও পাটোয়ারীরা টাকায় বেতন গ্রহণ করে। অন্যান্য স্থানে জমি ও টাকা উভয় রকমেই পারিশ্রমিক লাভ করে থাকে। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা একই সময় অন্য পেশাও অবলম্বন করে। বছরে একজন মণ্ডলের বেতনের হার হচ্ছে $২\frac{১}{২}$ টাকা থেকে ৩ টাকা। একজন পাটোয়ারী বেতন পায় ৩ টাকা থেকে ১০ টাকা। জেলার যেসব অংশ পানিতে প্রাবিত হয়, সেসব স্থানে তাঁদের জন্য জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত নৌকা ভাড়া প্রদান করা হয়ে থাকে।

১ ইত মামদার, সিকদার, ছবরাইদার বা তপ্পাদার নামেও অভিহিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[বয়ন শিল্প—সীবন শিল্প—ধৌতকরণ—স্বর্ণ ও রৌপ্য কর্ম—শঙ্খবলয় ইত্যাদি
তৈরি—শহরে পেশা, ব্যবসায় ও কর্মসংস্থানের তালিকা—বাণিজ্য—বাণিজ্যের
অবনতি]

এই জেলায় ও শহরে প্রচলিত কয়েকটি শিল্পকর্মের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বয়ন শিল্প, সূচীশিল্প, ধৌতকরণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য কর্ম এবং শঙ্খবলয় তৈরি ইত্যাদি।

বয়ন শিল্প

ঢাকা বহুকাল পর্যন্ত মসলিন বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। খ্রিস্টীয় অব্দের প্রথম শতক থেকেই ইউরোপে এই মসলিন বস্ত্র পরিচিত ছিল। কিছুসংখ্যক লোকের মতে, তারা সেরীয় ভেস্টিজ (Serioe Vestes) তৈরি করত, যা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের বিলাসিতা ও উৎকর্ষের দিনে সেখানকার মহিলাগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমাদৃত হত।^১ প্লিনি মিসর ও আরব দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলার মসলিনের কথা উল্লেখ করেন এবং Circumnavigation of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থের লেখক^২ এসব বস্ত্রের সূক্ষ্মতা, অত্যুৎকৃষ্টতা ও সচ্ছলতার^৩ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ দেন। উক্ত গ্রন্থ আরিয়ান নামীয় জনৈক মিসরীয় গ্রিক কর্তৃক লিখিত হয়েছিল এবং এতে কয়েক প্রকার ভারতীয় মসলিন বস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যা এতদেশীয় বাণিজ্যিক নামে পরিচিত ছিল।^৪ উৎকৃষ্ট বাংলা মসলিনের নামকরণ করতে ব্যবহৃত শব্দ “কার্পাসাস” নিঃসন্দেহে সংস্কৃত “কার্পাস” কিংবা হিন্দু

১ সালমাসিয়াস কৃত Exercitationes Plinianioe এবং ডঃ উরে কৃত Cotton Manufacture of Great Britain, ১৮৩৬।

২ পরিপ্লাস মরিস ইরিথ্রিয়ো।

৩ এই সেরীয় ভেস্টিজ (Serioe Vestes) এত সূক্ষ্ম যে, এর মধ্য দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যেত—প্লিনি।

৪ মলোচিনা বা মোটা মসলিন।

মোনাচি—সূক্ষ্ম রকমের প্রশস্ত মসলিন বস্ত্র।

জুদাইন, মোটা বস্ত্রাদি—ড. ভিশেন্টকৃত পেনপ্লাসের অনুবাদ (Periplus Maris Erythrioe)।

“কাপস” তুলা থেকে উদ্ভূত। সুতরাং, তৎকালে সুতি, শণ কিংবা ‘এসভেস্টাজের’ তৈরি সকল প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র বোঝাতে প্লিনীর^১ সময়ে “কাপাসিয়াম” বা ‘কার্পাসিয়ান’ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। শব্দটি অবশ্য এরিয়ান ও মিসরীয় বণিকরা যেভাবে ব্যবহার করতেন, তার উৎপত্তি হয়েছিল খুব সম্ভবত “কাপাসিয়া” নামক স্থান থেকে, যে স্থান থেকে এ সকল মসলিন বস্ত্রাদি রপ্তানি করা হত।

ঢাকাই মসলিন

প্রাচীনকালে এ স্থান ছিল মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।^২ “নবম শতকে দু’জন মুসলমান পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ ও চীনের বিবরণে”^৩ ভারতীয় সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের উল্লেখ আছে। এদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কিছু পরিবেশের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এ কথা পরিষ্কার মনে হয় যে, তাঁরা ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। দেশের রাজার অধীনে বহুসংখ্যক হস্তী ও প্রচুর ধন-সম্পদের কথা উল্লেখ করে পর্যটকদ্বয় বলেন, “এ দেশে তারা এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সুতি বস্ত্রাদি তৈরি করে যে অন্য কোথাও এ ধরনের বস্ত্র পরিলক্ষিত হয় না। এ সকল পোশাক-পরিচ্ছদ বেশিরভাগই গোলাকার এবং এরূপ সূক্ষ্মভাবে বুনা যে, তা মাঝারি ধরনের একটি আঁঠির ভিতর দিয়ে টেনে বের করা যায়। স্বর্ণ-রৌপ্য, আগরকাঠ^৪ ও ভোঁদড়ের^৫ চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তারা ঘোড়ার জিন ও বাড়িঘরের আসবাবপত্র তৈরি করে এবং এ সমস্ত দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও কমমূল্যের মুদ্রা হিসেবে এদেশে কড়ির^৬ প্রচলন আছে। এই একই দেশে বিখ্যাত ‘করকাদর’ বা অশ্বের ন্যায় দেহবিশিষ্ট একশিংওয়ালা জন্তু^৭ দেখা যায়।” শুকিয়ে যাওয়া অনেকগুলো বড় বড় দিঘি ইত্যাদি থেকে অতীতে এই স্থানে একটি সমৃদ্ধিশালী ও কর্মবহুল জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।^৮

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ব্যাপকভাবে দেশের শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনের কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাই মসলিন খ্যাতি অর্জন করে। এই সময় এ সকল বিলাস বস্ত্র হিন্দুস্থান-সম্রাট এবং তদীয় রাজ-প্রতিনিধিবর্গের রাজদরবারে আমীর-ওমরাহগণের শৌখিন পোশাকরূপে পরিগণিত হয়; অন্যদিকে উৎকৃষ্ট মসলিন এমনই চমৎকাররূপে সূক্ষ্ম ও হালকা যে তা প্রাচ্যের রূপক ভাষায় “হাওয়ার ইন্দ্রজাল” “আবরোয়া” বা প্রবহমান জলধারা,

১ প্লিনীর ‘লিনাম কার্পাসিয়াম’ ছিল স্পেনের উৎকৃষ্ট শণভস্ম।

২ জেলার এই অংশ বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ।

৩ আগর কাঠ।

৪ ভোঁদড় বা উদ্‌বিড়ালের চামড়া।

৫ কড়ি ইত্যাদি।

৬ গণ্ডার; পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদ থেকে তা প্রতীয়মান হয়।

৭ আবে ফ্রোয়জার্ত কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থ Accounts of India and China by two Mohammedan Travellers।

অথবা “শবনম” বা ভোরের শিশির^১ ইত্যাদি নানান নামে বর্ণিত হয়েছে এবং একান্তভাবে অন্তঃপুরবাসিনী সুন্দরীদের সুসজ্জিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সকল সময়ে ঢাকাই মসলিন তার বিরাট সুনাম রক্ষা করে এসেছে এবং এমনকি, বর্তমানকালে বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের চরমোৎকর্ষ সত্ত্বেও এসকল মসলিন বস্ত্র এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বুনোনির স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতায় মসলিন কাপড় পৃথিবীর যে কোনো অংশে তাঁতের তৈরি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টমানের বস্ত্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ১৮৩৬ সালে ড. উরে লিখেছেন, “ঢাকায় মসলিন বস্ত্র এবং সুতো এখনো তৈরি হচ্ছে, যার নিকট ইউরোপের উদ্ভাবনী শক্তিও হার মানে এবং এই দক্ষতা এমনই যে, একজন সুবিজ্ঞ বিচারকও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এটা তাঁর ধারণার বাইরে—কীভাবে বিলাতের তৈরি সূক্ষ্মতম বস্ত্র অপেক্ষাও বহুগুণে সূক্ষ্মতর মসলিন সুতা মাকুতে তৈরি করা যায় এবং পরে তা বুনানে সম্ভব হয়।^২

মির্জাপুরের তুলা

সকল উৎকৃষ্ট মসলিনই এ জেলায় উৎপন্ন দেশী সুতায় তৈরি। মির্জাপুর থেকে আমদানি করা তুলা থেকে নিম্নমানের বাগ্গা, হাম্মাম ও অন্যান্য পাঁচমিশালী বস্ত্রের সুতা কাটা হয়ে থাকে। মির্জাপুরের তুলার পরেই আরাকানী তুলার স্থান। এ তুলা সামান্য পরিমাণে আমদানি করা হয়, কিন্তু কার্যত উৎকৃষ্ট মসলিন উৎপাদনের জন্য তা কখনো ব্যবহৃত হয় না। গারো ও পার্বত্য ত্রিপুরার ভোগা তুলা শুধু সবচেয়ে মোটা ধরনের কাপড়চোপড় তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জেলায় ইংল্যান্ডের পাকানো সুতা আসার সময় থেকে অবশ্য এ সকল বিভিন্ন প্রকার তুলা আমদানি ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানের পরিমাণ সম্ভবত ১৭৮৭ সালে আমদানিকৃত তুলার পরিমাণের এক-ষষ্ঠাংশও হবে না। মেয়েরা তুলা পরিষ্কার করে এবং তারাই সুতা কাটে। পশম থেকে বীজ ছড়ানোর জন্য চরকি ও দলন কাঠি ব্যবহৃত হয়। চরকি হচ্ছে সাধারণ হস্তচালিত কারখানা (Common hand mill) বা একজোড়া দ্রুতচালিত কাঠিবিশেষ, যা সমগ্র দেশব্যাপী প্রচলিত রয়েছে এবং এখানে তা দ্বিতীয় মানের সুতার জন্য তুলা পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উৎকৃষ্টমানের সুতার জন্য সামান্য পরিমাণ উপকরণ পরিষ্কারের কাজে দলন কাঠির ব্যবহার হয়। একটি লোহার শলার মধ্যখানটি মোটা ও দুই দিক সরু করে দলন কাঠি তৈরি করা হয়ে থাকে। একটি কাঠের বোর্ডের উপরে তুলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার উপর দিয়ে হাতে বা পায়ে দলন কাঠিটাকে গড়ানো হয়। কাঠির দু প্রান্ত হাত বা পা দিয়ে ধরার জন্য বোর্ডের বাইরে একটু বেরিয়ে থাকে। মহারাষ্ট্র-যন্ত্রের ন্যায় একই পদ্ধতিতে দলন কাঠির কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এটা বস্ত্রের ড. লাশ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং এর একটি নকশা তুলা ইত্যাদির উপর কাগজে খোদাই করা আছে যা সম্প্রতি ‘কোর্ট অব ডিরেক্টরস’ কর্তৃক প্রকাশিতও হয়েছে। এ দুটো যন্ত্রের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল—মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রচলিত প্রস্তরনির্মিত বোর্ডের পরিবর্তে এখানে কাঠের বোর্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঢাকায় ব্যবহৃত দলন কাঠি আকারে কিছুটা ছোট এবং তা হাত দ্বারা চালানো হয়। কিন্তু ময়মনসিংহে যে দলন কাঠির ব্যবহার হয়, তা পা দিয়ে চালানো হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্রের মতো এখানেও কাঠের নির্মিত পদতল বা পাদানি দ্বারা পা দুটো নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা আছে। দলন কাঠিতে সুতা কাটার যন্ত্র অপেক্ষা সুতা কম ভাঙে বলে জানা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে

১ এভাবে নামকরণের হেতু এই যে, সিন্ধু অবস্থায় শিশির ও মসলিন বস্ত্র আলাদাভাবে চেনা যায় না।

২ ড. উরে প্রণীত Cotton Manufactures of Britain।

হল তুলা ধুনা বা খোসা ইত্যাদির বাদবাকি অংশ থেকে তুলাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। ধুনকরদের ব্যবহৃত বাঁশ ও মুগা রেশমের তৈরি ধনুকের ন্যায় যন্ত্র দিয়ে তুলা ধুনতে হয়। শহরে কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা তুলা ধুনার জন্য ধনুক তৈরি করে থাকে, এটা তাদের একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা। কিন্তু এ যন্ত্র কখনো সুতা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। মুসলমানদের জন্য শুধু শীত ঋতুর উপযোগী কাপড়চোপড় ও লেপকাঁথা তৈরির কাজে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উৎকৃষ্ট মানের সুতা তৈরির জন্য যে তুলা ব্যবহৃত হয়, তা ধুনা বা ধনুকে ব্যবহার করার পূর্বে চিরুনিতে আঁচড়ানো হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে যে যন্ত্রের ব্যবহার হয়, তা হল বোয়াল মাছের শুকনো চোয়ালের কাঁটা (Silurus Boalis)। অর্থাৎ ভালো সুতা উৎপাদনের জন্য ধুনার পূর্বে বোয়াল মাছের চোয়ালের কাঁটা দিয়ে চিরুনির সাহায্যে আঁচড়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। উক্ত হাড় প্রায় দু ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা ও অর্ধচন্দ্রের ন্যায় বাঁকা এবং এর অভ্যন্তর ভাঁজের উপর অনেকগুলো চিকন চিকন বাঁকানো দাঁত থাকে। এটি দিয়ে আঁচড়ানোর ফলে শুধু তুলোর সূক্ষ্ম আঁশগুলো এসব দাঁতের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসে। তুলা ধুনার পরেও আবার সূক্ষ্ম সুতা তৈরির প্রয়োজনে তুলাগুলোকে শুকনো চিতল মাছ কিংবা কুচিয়ার মসৃণ চামড়ার উপর যন্ত্রের সঙ্গে বিছিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর একটি গোলাকৃতি নলের ‘কেসের’ ভেতর পুরে নিয়ে, তা হাতে রেখে সুতা কাটা হয়ে থাকে।

সব রকম সুতা সাধারণত মেয়েরাই কাটে। এরা সাধারণত অবসর সময়টায় এ কাজে নিয়োজিত থাকে। ৩০ নম্বর ব্রিটিশ-পাকানো সুতার চেয়ে নিম্নমানের অপেক্ষাকৃত মোটা সুতা চরকা দিয়ে কাটা হয়। কিন্তু ঐ নম্বরের উপরে সকল রকম সুতা উৎপাদনের নিমিত্ত টাকু ব্যবহৃত হয়। অত্যুৎকৃষ্ট মানের সুতা তৈরির কাজে ব্যবহৃত টাকু উত্তমরূপে ঘষামাজা ইস্পাত নির্মিত দশ ইঞ্চি লম্বা একটি বড় সুচবিশেষ। এর তলদেশ থেকে এক ইঞ্চি উপরে থাকে একটি গোলাকার কাদার পিণ্ড। সুতা কাটার সময় টাকু হেলানো অবস্থায় রেখে ঘোরানো হয় এবং এর নিম্নভাগ ভাঙা কড়ি বা কচ্ছপের ডিমের ভিতরে বসিয়ে ঘোরানো হয়। এভাবে হাতের অন্য আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যে রেখে ঘোরানো হলে, বাম হাতে ধরে রাখা তুলা ক্রমশ তা থেকে উঠে আসে এবং টেনে বের করে আনা সূক্ষ্মতত্ত্ব সুতায় পরিণত হয়। এই হল এখানকার সুতা কাটার পদ্ধতি। এক্ষেপে সুতা কাটায় পারদর্শী এক ব্যক্তি এক টাকার রৌপ্যমুদ্রা বা ১৮০ গ্রেন ওজনের তুলা থেকে ৪ মাইলেরও অধিক লম্বা সুতা তৈরি করতে পারে। [১ রতি প্রায় ২ গ্রেন]। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের হিন্দু মেয়েরা শ্রেষ্ঠ সুতা কাটনী। ৩০-এর পরে তাদের দক্ষতা হ্রাস পায় এবং ৪০-এর পরে তাদের দৃষ্টিশক্তি নিদারুণ দুর্বল হয়ে পড়ে; ফলে অতি সূক্ষ্ম সুতা কাটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

প্রভাত এবং অপরাহ্ন হচ্ছে সুতা কাটার বিশেষ সময়। এ সময় সূর্যের প্রথর রশ্মি হ্রাস পায় বলে চোখ ঝলসাতে পারে না, অপরদিকে বাতাসের আর্দ্রতা পুনঃ পুনঃ সুতা ছেঁড়া নিবারণ করে থাকে। ড. উরে লিখেছেন, “ভারতে প্রস্তুত মসলিন বস্ত্রের উৎকর্ষের কারণ খুঁজতে হবে প্রাচ্যের অধিবাসীদের চমৎকার সাংগঠনিক ক্ষমতার মধ্যে। শারীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের বিবরণে স্নায়বিক ব্যক্তির যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—এদের মেজাজ সর্বাংশে তারই অনুরূপ।” আমি আরো বলতে পারি যে, অবসাদগ্রস্ত মানসিকতা কার্যত হস্তকর্মকে প্রভাবিত করে; বিশেষ দক্ষ কাটনীও কোনো প্রকার পারিবারিক দুঃখকষ্ট কিংবা মানসিক অশান্তিতে ভুগলে তার পক্ষে এমনকি, দ্বিতীয় শ্রেণীর সুতা পর্যন্ত কাটাও অসম্ভব হয়। ইন্ডিয়া হাউজের মিউজিয়ামে ঢাকায় তৈরি সুতার নমুনা সংরক্ষিত আছে, যা বহু বছর পূর্বে স্যার চার্লস উইলকিনস্ কর্তৃক সেখানে রাখা হয়েছিল। এ সুতার সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যের জন্য তথায়

তা বহুল পরিমাণে প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তীকালে স্যার জোসেফ ব্যাংকস কর্তৃক এর ওজন ও পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাতে দেখা গিয়েছিল প্রতি পাউন্ড তুলায় ১১৫ মাইল ২ ফার্লং ৬০ গজ সুতা রয়েছে।^১ ইংল্যান্ডে অবশ্য ১ পাউন্ড ওজনের সুতা ১৬৭ মাইল পর্যন্ত হয়, কিন্তু ৩৫০ নম্বরের এই সুতা এত সূক্ষ্ম যে, এ থেকে মসলিন বস্ত্র তৈরি বা বোনা ব্রিটেনে সম্ভব নয়।

সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের সুতা হল ২৫০ নম্বর, যা দিয়ে সেখানে এযাবৎ মসলিন তৈরি হয়েছে এবং এর এক পাউন্ড তুলার সুতার দৈর্ঘ্য $১১৯\frac{১}{২}$ মাইল, যদিও কদাচিৎ ২২০ নম্বরের উর্ধ্বের সুতা ব্যবহৃত হয়। ঢাকায় ২৫০ নম্বর সুতা আমদানি করা হয়েছে এবং তা দিয়ে মসলিন তৈরিও হয়েছে। কিন্তু এদেশীয় উৎকৃষ্টমানের সুতার কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না। এক তোলা ওজনের সুতা ৭২০০ গজ তথা প্রতি পাউন্ডে ১৬০ মাইল দীর্ঘ সুতা সূক্ষ্মতায় যেমন অতুলনীয়, তেমনি টেকসই। ১৮৩৭ সালে তৈরি এই প্রকারের সুতার একটি নমুনা আমার নিকট ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এ সুতার ওজন ও পরিমাপ গ্রহণ করা হয় এবং তাতে এর ওজন ছিল ৫ গ্রেন ও দৈর্ঘ্য ছিল ২০০ গজ। ঢাকায় তৈরি সুতা সাধারণত ইংল্যান্ডে যন্ত্রেকাটা সুতার চেয়ে বেশ মোলায়েম এবং এটা সকলেরই জানা আছে যে, এই সুতায় তৈরি বস্ত্রাদি অনেক বেশি টেকসই; যদিও প্রায়শ ক্রটিপূর্ণ ধৌতকরণের ফলে তা ইংলিশ মসলিনের মতো সব সময় অতটা উত্তম মনে হয় না। এ সুতা অনিয়মিতভাবে পাকানো হয় বলে জানা যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এটি একটি নিকৃষ্টভাবে তৈরি চুলের ন্যায় দড়িবিশেষ যা থেকে অনেক আঁশ বেরিয়ে থাকে, অনেকটা এরূপ প্রতীয়মান হয়। এই সূক্ষ্ম তন্তুর ব্যাস এক ইঞ্চির $\frac{১}{১০০০}$ থেকে $\frac{১}{১৫০০}$ ভাগ পর্যন্ত হয় এবং সুতা কিছুটা চ্যাপ্টা ও ফিতার ন্যায়। আলাদা অবস্থায় উক্ত তন্তুর এই আকৃতির উপরই ঢাকাই মসলিনের স্বচ্ছতা নির্ভরশীল। শোনা যায় যে, যদি এ সুতা আরো ঘনভাবে পাকানো হয়, তা হলে তা ব্রিটেনের তৈরি সুতার ন্যায় অস্বচ্ছ তন্তুর আকার ধারণ করে। তুলার আঁশ যতই লম্বা নলাকৃতি পাকানো এবং স্থিতিস্থাপক হবে ততই তা যন্ত্র দ্বারা তৈরি করার উপযোগী, এবং হাতে তৈরি করার অনুপযোগী হয়ে থাকে। সে অনুসারে, আমেরিকান তুলা এ ধরনের কয়েকটি গুণের অধিকারী এবং ব্রিটিশ তাঁতের জন্য তা উপযোগী, কিন্তু এ তুলা থেকে এখানে উৎকৃষ্টমানের সুতা উৎপাদন করা যায় না। ১৮১১ সালে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত সি-আয়ল্যান্ডের সামান্য কিছু পরিমাণ তুলা পরীক্ষা করে দেখা হয়, এবং সুতা কাটনীরা এ থেকে কোনোরূপ ভালো সুতা তৈরি করতে অপারগ হওয়ায় তা ঢাকার কারখানায় উৎপাদনের অনুপযোগী ঘোষণা করা হয়। ফলে এর দ্বারা কোনো ফলোদয় হয় নি। পূর্বে সুতা কাটার কাজে সর্বশ্রেণীর অধিবাসীরা নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ লাভ করত। ১৮২৪ সালে ঢাকায় বিলেতি কলের তৈরি সুতা প্রবেশ করায় এ শিল্প শাখা ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং ১৮২৮ সালে তা দ্রুত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ঢাকাই বস্ত্র ৩০ নম্বর থেকে ২০০ নম্বরের বিলেতি সুতায় তৈরি হয়। প্রধানত ৬০, ৭০ এবং ৮০ নম্বর সুতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে দেশী এবং সাধারণত ঢাকায় আমদানিকৃত বিভিন্ন রকম বিলেতি সুতার মূল্যের একটি তুলনামূলক হার ও গুণাগুণের চিত্র প্রদত্ত হল—

১. বোইনস্কৃত হিন্দি অব কটন ম্যানুফেকচারস।

বিলেতি সূতার নম্বর	দেশী ও বিলেতি সূতার ওজনের একটি আনুপাতিক হার			এক মোড়ার $\frac{1}{8}$ ভাগ বা $1\frac{1}{8}$ হ্যাঙ্ক পরিমাণ বিলেতি সূতার মূল্য			এক মোড়ার $\frac{1}{8}$ ভাগ বা $1\frac{1}{8}$ হ্যাঙ্ক পরিমাণ দেশীয় সূতার মূল্য		
	সিক্কা	আনা	গণ্ডা	টাকা	আনা	গণ্ডা	টাকা	আনা	গণ্ডা
	[Siccās	As.	gds.]	[Rs.	As.	gds.]	[Rs.	As.	gds.]
২০০	১	০	০	০	৩	০	০	১৩	০
১৯০	১	০	১৮	০	২	১৫	০	১০	০
১৮০	১	১	১৫	০	২	১৫	০	৬	০
১৭০	১	২	১৬	০	২	১০	০	৫	০
১৬০	১	৪	০	০	২	১০	০	৪	০
১৫০	১	৫	৭	০	২	১০	০	৩	০
১৪০	১	৬	১৭	০	২	৫	০	৩	০
১৩০	১	৮	১২	০	২	৫	০	৩	০
১২০	১	১০	১৩	০	১	১৫	০	২	১৫
১১০	১	১৩	৫	০	১	১৫	০	২	০
১০০	২	০	০	০	১	৫	০	২	০
৯০	২	৩	১১	০	১	৫	০	১	১৫
৮০	২	৮	০	০	১	৫	০	০	১৫
৭০	২	১২	০	০	১	$1\frac{1}{8}$	০	১	১৫
৬০	৩	৫	৫	০	১	$2\frac{1}{2}$	০	২	০
৫০	৪	০	০	০	১	৫	০	২	০
৪০	৫	০	০	০	১	$9\frac{1}{2}$	০	২	০
৩০	৬	১০	০	০	১	১০	০	২	০

কলে তৈরি বিলেতি সূতা একদিকে যেমন সস্তা, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজনমতো পর্যাপ্ত পরিমাণ একই পর্যায়ে সূতা বাজারে পাওয়ার সুবিধা থাকায়, এ দেশীয় লোকেরা তা বেশ পছন্দ করে। অপরপক্ষে, একই নম্বরের দেশী সূতা অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করা খুব কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। উৎকৃষ্টমানের মসলিন সূতা যোগাড় করার জন্য জেলার বিভিন্ন হাটেবাজারে ঘোরাফেরা করতেই তাঁতিদের মসলিন বয়নের দুই-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

এ জেলায় প্রায় ৩৬ রকমের কাপড় তৈরি হয়ে থাকে এবং হিসাব করে দেখা গেছে যে, মোট তৈরি বস্ত্রের আট ভাগের ছ'ভাগ কাপড় ৩০ থেকে ১০০ নম্বরের বিলেতি সূতায় প্রস্তুত হয়। বাদবাকি কাপড় অর্থাৎ ৮ ভাগের $1\frac{1}{2}$ ভাগ ৩০ নম্বরের নিম্নের সূতায় এবং $\frac{1}{2}$ ভাগ ২০০ নম্বরের বিলেতি পাকানো সূতা অপেক্ষা বেশি নম্বরের দেশীয় উৎকৃষ্টমানের সূতায় তৈরি

হয়। শেষোক্তটির উর্ধ্ব সংখ্যার সূতা দ্বারা প্রেন মসলিন তৈরি হয়; সাধারণত এ বস্ত্র ক্রেতাদের ফরমায়েশে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে এবং “মলমল খাস” নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে দৈর্ঘ্যে পাঁচ গজ (১০ কিউবিট) ও প্রস্থ এক গজ এবং ৫ সিকা বা ৯০০ গ্রেন ওজনের একখানা ‘আবরোয়া’ মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা যেত, যার মূল্য ছিল ৪০০ টাকা। বর্তমানে ঐ একই পরিমাপের যে উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র তৈরি করা যায়, তার ওজন প্রায় ৯ সিকা বা ১৬০০ গ্রেন, এবং মূল্য ১০০ টাকা। ‘ফুলওয়ার’ কুটিনার, ডোরা কাটা ও ‘পলয়ার’ বা নানা বর্ণে চিত্রিত মসলিন বস্ত্র ব্যাপক পরিমাণে তৈরি হয়ে থাকে। উৎকৃষ্টমানের ফুলতোলা বা জামদানি মসলিন দেশীয় সূতায় তৈরি হয়, কিন্তু ২০০ নম্বর বিলেতি সূতা দিয়েও বেশ কিছু পরিমাণ মসলিন তৈরি হয়ে থাকে। এ সব বস্ত্র অযোধ্যা ও হিন্দুস্থানের দেশীয় বিভিন্ন রাজদরবারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এ ধরনের বার্ষিক মোট উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়। খুব সম্ভবত মুসলমানরাই জামদানি মসলিনের বুননের প্রচলন করেন এবং আজো তাদের হাতেই প্রধানত এর উৎপাদন একচেটিয়া। মুঘল সরকারের আমলে জামদানি মসলিনের তঁতিরা এক প্রকার শুদ্ধ প্রদান করত। নির্ধারিত মূল্যের উর্ধ্বে বিদেশীয় বণিকদের নিকট এসব বস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। বিলেতি সূতায় তৈরি অধিকাংশ বস্ত্রই হচ্ছে সাদা মসলিন। শহরে সূচীকর্মে দ্বারা এগুলোকে নানারকম কারুকার্যখচিত করা এবং প্রতি বছর পারস্য উপসাগর ও লেহিত সাগর এলাকায় রপ্তানি করা হয়ে থাকে। সুতি ও পশমি তসর এবং সাদা ও রঙিন সূতায় মিশ্রিত বস্ত্রাদিও তৈরি হয় এবং এভাবে প্রস্তুত বস্ত্রের পরিমাণ সমগ্র জেলায় উৎপাদিত কাপড়ের প্রায় আটভাগের এক ভাগ। এ সকল বিভিন্ন প্রকার কাপড় সূক্ষ্ম বুননি নমুনা, উৎপাদনের উৎস বা ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি নির্দেশক বিভিন্ন নামের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যেমন “আবরোয়া”—প্রবহমান জলধারা এবং “শবনম” বা ভোরের শিশির। শিশিরসিক্ত নূবাদলের সঙ্গে একে রাখলে একটা থেকে অন্যটাকে বেছে বেঁধে করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া আছে “ডুবিয়া” বা দ্বিগুণ সুতি, এবং “চার কোণ বা চারকোনা নকশাবিশিষ্ট”, “সরকার আলী বা নবাবের পারিবারিক” ইত্যাদি। দেশের অন্যান্য অংশে প্রচলিত রীতির ন্যায় ঠিক একই রকম বয়নপদ্ধতি এখানেও অনুসৃত হয়ে থাকে। এটা লক্ষ্যযোগ্য যে, ইউরোপীয় পর্যটকগণ যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, পদ্ধতিটা অনুরূপ সহজ না হলেও অনেকটা গ্রাম্য বা স্থূল। সাধারণ ধারণানুযায়ী তাঁতি তার তাঁত নিকটতম কোনো বৃক্ষের ছায়ায় স্থাপন করার পরিবর্তে সর্বদা নিজস্ব আবাসগৃহের চালার নিচে অথবা এ উদ্দেশ্যে তোলা ‘শেডের’ নিচে স্থাপন করে তার কাজ চালিয়ে থাকে। যথেষ্ট আলোবাতাস পাওয়ার জন্য কুঁড়েঘরের চতুর্দিক খোলা থাকে। যন্ত্রপাতির নিম্নাংশ এবং কাজে বসার সময় তাঁতির পদদ্বয় রাখার জন্য একটি গর্ত খোঁড়া হয়, এবং ধুলোবালি ও বৃষ্টির পানির হাত থেকে বুনট রক্ষার্থে চারটি বাঁশের উপর এক বা একাধিক মাদুর দিয়ে, সে তাঁতের উপরে একধরনের চাঁদোয়া তৈরি করে। কাঁচামাল থেকে সূতা তৈরি এবং তা থেকে উৎকৃষ্ট মসলিন বয়ন সম্পূর্ণ করতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মোট সংখ্যা ১২৬ বলে জানা যায়। এর সবগুলোই বাঁশের ছোট ছোট ঝুঁ বা নল-বাগড়ার তৈরি এবং পাতলা দড়ি বা সূতা দিয়ে বাঁধা থাকে। এ ছাড়া, এ সকল জিনিসপত্র নির্মাণের কারিগরি কৌশল এত গ্রাম্য ও সহজ যে, প্রায় প্রত্যেক তাঁতিই নিজে নিজে সবগুলো উপকরণ নির্মাণ করতে পারে। অবশ্য সময় ও ক্রেতাজনক অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্য তারা সাধারণত প্রস্তুত উপকরণাদি বাজার থেকে সংগ্রহ করে আনে। তাঁতের মাড় দিয়ে সূতা বিন্যস্ত করা হয়, এবং কিছু সময়ের জন্য রোদে ফেলে রাখার পর তা তাঁতির দু হাতে ধরে রাখা দুটো

ছোট চাকার উপর জুড়ে দিয়ে সুতা গুটানো হয়। চারটি বাঁশের খুঁটি মাটিতে পুঁতে শেষোক্ত কার্যটি সমাধা করা হয়। চিরুনির ন্যায় একটি যন্ত্র এই গুটানো সুতা পৃথক করার কাজে ব্যবহৃত হয়। একটি অন্তর একটি সুতার মধ্যে স্থাপিত যন্ত্রাংশে সংযুক্ত শিকলের ন্যায় সুতার একটি ছিদ্র থাকে। এই রকম দুটো ছিদ্রবিশিষ্ট শিকলাকৃতি সুতার এক একটি পায়ের নিচে স্থাপিত এক একটি যন্ত্রাংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এ যন্ত্রাংশের দ্বারা বিন্যস্ত সুতা উপরে উঠানো ও নিম্নে দাবানো হয়, যাতে এর মধ্য দিয়ে মাকু চলাচল করতে পারে। এই পরবর্তী যন্ত্রটির বা যন্ত্রাংশের অগ্রভাগ বিলেতি মাকুর ন্যায় ধারালো নয়। ভিতরে স্থিরভাবে স্থাপিত ববিনের পরিবর্তে বয়নের তন্তু লোহার শলাকা বা তারের উপর ঘূর্ণায়মান একটি ছোট নলে থাকানো হয়। উৎকৃষ্টমানের মসলিন বয়নের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল বর্ষাকাল; এ সময়ে আবহাওয়ার আর্দ্রতা মসলিনের সুতাকে ভাঙার হাত থেকে রক্ষা করে। শুষ্ক গরম আবহাওয়ায় উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র বয়নের প্রাক্কালে তাঁতের নিচে পাত্রভরা ভাসা-ভাসা পানি রাখার একান্ত প্রয়োজন হয়; কেননা, বাষ্পসিক্ত আবহাওয়া সুতা আর্দ্র রাখে। এর থেকেই সম্ভবত এই ধারণার উৎপত্তি^১ হয়েছিল যে, ঢাকাই মসলিন পানির নিচে রেখে বোনা হয়ে থাকে।

অধিকাংশ তাঁতিই হিন্দু। এরা ঢাকা, ডেমরা, তীতবন্ধি, জঙ্গলবাড়ি ও সোনারগাঁওয়ে প্লেন বা সাদা মসলিন তৈরি করে। সোনারগাঁওয়ে মুসলমান তাঁতিদের সংখ্যা অধিক। এরা জামদানি মসলিন বস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত। অপেক্ষাকৃত মোটা ধরনের কাপড়চোপড় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তৈরি করে থাকে। এদেরকে এই দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাক্রমে যোগী ও জোলা নামে অভিহিত করা হয়। বস্ত্র বয়নকালে কখনো দুই বা তিন গজের অধিক বুনট অনাবৃত থাকে না। শানান মসলিনের জন্য ব্যবহৃত মাড়ে সামান্য পরিমাণ প্রদীপের কালি মিশানো হয়ে থাকে; ফলে তাঁতির ব্যাখ্যানুযায়ী শাড়ির নাম “আধো-কালো” বা “ক্ষীণ আলোর-সন্ধ্যা” ইত্যাদি রাখা হয়েছে।

সূচীশিল্প

সুতা কাটা এবং বয়ন শিল্পের পরেই সূচীশিল্প এখানে অত্যন্ত ব্যাপক আকারে, বিশেষত মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত। মসলিন তৈরিতে হিন্দু তন্তুবায়গণ তাঁতে যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, মুসলমানগণও সুচ-সুতা দিয়ে পুরোপুরি একই রকম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ধৌত করার সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা ছিঁড়ে যাওয়া মসলিন বস্ত্রাদি মেরামত করা, ছাপমারা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্রে বস্ত্রের শিরোনাম তোলা ইত্যাদি কার্যে রিফুকারণ নিয়োজিত রয়েছে। একজন দক্ষ রিফুকারণ সূক্ষ্ম মসলিনের সমগ্র জমিন থেকে দীর্ঘ একটি সুতা বের করে, সেখানে নতুন করে একই মানের একটি সুতা নিখুঁতভাবে চালিয়ে দিতে পারে। এই শ্রেণীর প্রায় সকল কর্মীই আফিমখোর, এবং আফিম না খেয়ে এদের প্রায় সকলেই এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। মসলিন বস্ত্রাদিতে ফুল তোলার কাজ এক ধরনের

১ ভারতীয় তন্তুদৃষ্টে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অসংলগ্ন বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার দরুন, মসলিন বস্ত্র মাঝে মাঝে পানির নিচে রেখে বোনা হয়, এতে তন্তুটি অক্ষুণ্ণ থাকে। এটা এমনভাবে করা হয়—যেভাবে একজন শরীর-ব্যবচ্ছেদকারী একটি অতি সূক্ষ্ম দেহাংশ একই মাধ্যমে ভাসমান অবস্থা থেকে সেলাই করে থাকেন।—উরে কৃত “Cotton Manufacture of Hindustan”.

সূচীশিল্পীরা করে থাকে। এদেরকে ‘চিকনদাজী’ বলা হয়, এবং মসলিন, পশমি শাল ও রুমাল ইত্যাদি বস্ত্রের সোনা-রূপা ও রেশমি সুতার কাজকে বলা হয় ‘জরদজী’। শেমোক্ত শ্রেণীর কাজ অর্থাৎ এখানকার অন্যান্য সূচীকর্ম অপেক্ষা ‘জরদজী’ বা জড়াইয়ের কাজ ইউরোপে যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত। শাল, গলাবন্ধ প্রভৃতি বস্ত্র কলকাতা থেকে আমদানি করা হয় এবং প্রধানত বিলেতে পাঠাবার জন্য এখানে বুটিতোলা ইত্যাদি নানা কারুকার্য করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই বছর প্রায় এক হাজার কাপড়ে বুটি তোলা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস এর মধ্যে কয়েকখানা মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সূচীশিল্পের প্রধান শাখাটিই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজের সংস্থান করে দেয়; এত মুগা ও তসর সিল্কের সুতায় বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের গায়ে ফুল বা বুটি তোলা হয়। প্রধানত বিলেতি সুতায় তৈরি এসব বস্ত্রের নাম ‘কাসিদা’। বুটি তোলার আগে লাল রং দিয়ে কাপড়ের উপর নির্দিষ্ট নকশার নমুনা নিয়ে ছাপ মারা হয়। এ ধরনের কাজে নিয়োজিত লোকদেরকে বলা হয় ‘চীপিগর’। এদের থেকে এই সকল ছাপ মারা বস্ত্র ওস্তাগার ও ওস্তাগারনীগণ সংগ্রহ করে সূচীশিল্পীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। এরা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে টাকা ও সিল্ক সুতা নিয়ে শিল্পজীবীদেরকে অগ্রিম দানও দিয়ে থাকে। দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমান রমণীরাই কাসিদার কারুকার্য ইত্যাদি করে। এ ছাড়া, ধোপা সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরাও তাদের সাধারণ গৃহস্থালী কাজের বাইরে অবসর সময়ে নিজেদের ও পরিবারের জন্য এ কাজ করে কিছু বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে। সূচীশিল্পের কাজ সর্বশ্রেণী ও সর্ব অবস্থার মুসলমান রমণীদের মধ্যে খুব প্রিয় বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমান সময় অপেক্ষা পূর্বকালে যখন কাসিদার চাহিদা অনেক বেশি ছিল তখন এখানকার প্রথম শ্রেণীর পরিবারভূক্ত মেয়েরাও তাদের অবসর সময়ে বুটি তোলার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। আমার বিশ্বাস বর্তমান সময়েও এমনকি তুরস্কের সুলতানের হারেমসহ বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাগণ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব হাতে বুটি তোলা বস্ত্রাদি কনস্টান্টিনোপলের বিরিস্তিন বা বাজারে পাঠাতে সংকোচ বোধ করেন না। ঢাকায় প্রায় ২০,০০০ খণ্ড বুটিতোলা মসলিন কাসিদা তৈরি হয়, এবং পারস্য, মিসর ও তুরস্কে পাঠানো হয়ে থাকে। সে সব স্থানে এ সকল বস্ত্র প্রধানত শিরস্ত্রাণরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়েক বছর পূর্বে মোহাম্মদ আলী পাশা তাঁর দেশ মিসরে এই শিল্পদ্রব্যের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পরিমাণ তসর সিল্ক আমদানি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরীক্ষামূলক কার্য ব্যর্থ হওয়ার অল্প কালের মধ্যে এ সকল দ্রব্য ফেরত পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর তা কলকাতার বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

শুদ্ধকরণ বা ধৌতকরণ

মসলিন বস্ত্রাদির ধৌতকরণ কার্য জেলার উত্তরাংশেই সীমাবদ্ধ; সেখানকার ব্রহ্মপুত্রের শাখাগুলোর স্বচ্ছ নির্মল পানি এ কাজের বিশেষ উপযোগী। আবুল ফজল সোনারগাঁও পরগনার একটি বিখ্যাত জলাশয়ের উল্লেখ করেন; এর পানিতে ধৌত মসলিন অদ্ভুত রকম সাদা হয়ে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানকালেও এ অংশের কাঁকরমিশ্রিত ও কর্দমাক্ত মাটিতে খনন করা সকল কূপের পানিতেই এ একই রকম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায়। এখানে অবলম্বিত বস্ত্র-ধৌতকরণ পদ্ধতি হল সাবান ও পানির একটি পাত্রে বস্ত্রাদি উত্তমরূপে চুবিয়ে নিয়ে সেগুলো নিংড়ে নেওয়া, অতঃপর তা মসৃণ ঘাসের উপর মেলে দেওয়া। রৌদ্রে ফেলে শুকানোর পর জলাশয় থেকে আনা উত্তম পানিতে পূর্ণ একটি মাটির পাত্রে রাখা হয়। তারপর শুষ্ক হয় কাপড় সিল্ক করার কাজ। এ কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে

সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এরপর একরাত ফুটানো পানির পাড়েই কাপড়গুলো ফেলে রাখা হয় এবং পবের দিন এগুলো ধোবার পাটে বা তক্তার উপর আছড়ে নিয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে সিদ্ধ করা ও ধৌত করার এই পদ্ধতি চার-পাঁচবার চলতে থাকে এবং শেষবারের সময় এতে লেবুর রসমিশ্রিত পানি দেওয়া হয়ে থাকে। উক্ত দ্রব্য এখানকার মসলিন বস্ত্র ধৌত করার কাজে সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তা একই উদ্দেশ্যে ব্রোচে ব্যবহৃত হত বলে তাভার্নিয়ার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উক্ত স্থানে লেবু গাছের বিরাট বিরাট বাগান থাকায় বাংলার সুতি বস্ত্রাদি ধৌত করার জন্য সেখানে পাঠানো হত। আবে রায়নাল উল্লেখ করেন যে, ভারতের সুতি বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো যেখানে প্রস্তুত হয় সেস্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র কোথাও তা কখনো উত্তমরূপে ধৌত করা যায় না। মসলিন কাপড় শুষ্ক করে নেওয়ার পর এসব বস্ত্র সাধারণভাবে ধৌত করা, আছড়ানো ও ভাঁজ করার প্রাক্কালে সুতা এলোমেলো হয়ে গেলে, তা ঠিক করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথমেই নাগফনির পাঁজরার হাড়ে তৈরি সূক্ষ্ম ব্রাশ দিয়ে আঁচড়ে নেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা, এবং “নর্দিয়া” নামক একশ্রেণীর মুসলমান এ কাজ করে থাকে। মসৃণ ও বড় ধরনের শঙ্খ দ্বারা উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রাদি ঘষে দেওয়া হয়, এবং মোটা ধরনের বস্ত্রাদি ঘষার জন্য কাঠের ছোট হাতুড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর কারিগররা সম্পাদন করে। বস্ত্রাদি ভাঁজ করার ও গাঁট বাঁধার কাজগুলো নর্দিয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যকর্ম

এই শিল্পকর্মে নিয়োজিত ঢাকার কর্মকারগণ ফিলিখী বা তাদের কাজে বেশ পারদর্শী। তারা বলয়, গলার হার, ইয়ারিং এবং আতরদান ও গোলাপপাশ নিখুঁতভাবে তৈরি করে থাকে। এসব জিনিসপত্র দেশের বিভিন্ন অংশে রপ্তানি হয়। শহরে এ কাজে তিন শতাধিক কারিগর নিয়োজিত আছে। এ ছাড়া রয়েছে একশ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোকজন (সংখ্যায় ৬০ জনেরও বেশি) যারা এ সকল কারখানা থেকে ধূলা বা ঝাঁট দেওয়া জুজাল, পোড়া কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি পুরক পদার্থ লাভের জন্য ক্রয় করে নেয় এবং তা ধৌত করে তা সংগ্রহ করে।

শঙ্খ শিল্প

শহরে প্রায় ৫০০ জন শঙ্খ কারিগর আছে। এরা এই শিল্পকর্মের তিনটি স্বতন্ত্র শাখায়— যেমন, দাগরাজিকরণ, করাতে কেটে এগুলো মণ্ডলাকৃতিকরণ, এবং ঘষেমেজে মসৃণ ও চিকন করা, বক্র করা এবং বিভিন্ন টুকরা জোড়া লাগানো ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত। কলকাতা থেকে আমদানিকৃত চাক্ষুশ শঙ্খের বার্ষিক গড়পড়তা পরিমাণ ৩০,০০০। শহরে বার্ষিক বিরাট বিরাট সাময়িক মেলাসমূহে বিপুল পরিমাণ কুঁদান ও রঙিন শঙ্খের অলংকারাদি বিক্রয় হয়ে থাকে।

অন্যান্য শিল্প

এই শহরে ও সমগ্র জেলায় প্রচলিত অন্যান্য প্রধান শিল্পকর্ম হচ্ছে নৌ-শিল্প, তাম্র ও পিতলের জিনিসপত্র নির্মাণ এবং সাবান ও কাগজ শিল্প ইত্যাদি।

১৮৩৮ সালে লোক-গণনায় নিক্রপিত শহরের অধিবাসীদের পেশা, ব্যবসায়ী ও কাজের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

আইনজীবীগণ।	ভিন্সিমাড বা ভিন্সি।
কুটি প্রস্তুতকারক।	ইকা প্রস্তুতকারক।
নাপিত।	চুলী ও পালকি বাহক।
বাবরদার বা বিয়েশাদিতে	শিকাজীবী সম্প্রদায়।
পতাকাবাহক ইত্যাদি।	ছুতার-মিস্ত্রি।
বাদলাওয়ালা বা কুপার সুতা	বোকাওয়ালা বা মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা।
প্রস্তুতকারক।	কামার।
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, যারা যজ্ঞমণী	পুস্তক বাধাইকারী।
অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে।	ইত্মামদার, বা স্বাক্ষর আদায়কারী।
ফড়িয়া।	জোলে।
কসাই।	মালী।
বাঁদজী বা নর্তকী-রমণী।	ঘাটমালি।
বৈরাণী।	গ্রাস-ত্রোয়ার।
কাঁসারি।	স্বর্ণকার।
খাচা-নির্মাণকারী।	গোরবন্দ বা কবর খননকারী।
ভাস-পাশা প্রস্তুতকারক।	গরু দাগানিয়া বা যারা উত্তম লৌহ শলাকা দিয়ে
চিকন্-দাজ, বা বুটিতোলা মসলিন	গবাদিগতর চিকিৎসা করে।
বস্ত্রের সীবন-শিল্পী।	
চীপিগর, বা সূচীকর্মের জন্য	ঘাস-কাটার লোক।
(মসলিনের) ছাপা মারার লোকজন।	হেকিম ও কবিরাজ, বা মুসলমান ও হিন্দু
চেরা-কষ, বা তাম্রনির্মিত বাসনকোসন	চিকিৎসক।
ইত্যাদির খোদাইকারী।	হাত-কুটি, বা ইট-ভঁড়াকারী।
ময়রা বা মিষ্টান্ন বিক্রেতা।	হাউশীপার, বা আডশবাজি প্রস্তুতকারী।
কল্লিওয়ালা বা পানপাত্রওয়ালা।	শুকর-রক্ষক।
সুতা-পরিষ্কারকারক।	হকা বা পুতিদানা প্রস্তুতকারী।
রাখাল।	জহরী বা মূল্যবান পাথর বিক্রেতা।
উদ্ভেজক মাদকদ্রব্যের ভাটিখানার	প্রতিমা-নির্মাণকারী।
মালিক ও বিক্রেতা।	ইস্তিরিওয়ালা বা যারা কাপড়চোপড়
ডোম বা মৃতদেহ বহনকারী।	ইস্তিরি করে।
দোমনী বা মুসলমান মহিলা-	কাঁসারি বা তাম্র কাঁসার বাসনকোসন
বাদ্যকার।	ইত্যাদি নির্মাণকারী।
ঢাকী বা ঢুলী।	খুশিগর বা শিলা ও গজদন্তের

দস্তুরবন্ধ বা পাগড়ী নির্মাতা ।
 দস্তফরাশ বা পুরোনো বস্ত্রবিক্রেতা ।
 ইংরেজির দেশীয় লেখক ।
 খরানী মোল্লা বা যে সমস্ত লোক
 সরকারী অফিসমূহে শপথনামা
 পাঠ করায় ।
 কেদানী বা কোমরে বাঁধবার মোটা
 বস্ত্রের প্রস্তুতকারক ।
 কালি প্রস্তুতকারক ।
 দড়ি ও টোন সুতা প্রস্তুতকারক ।
 গালা করার মোম প্রস্তুতকারক ।
 দরজা জানালার জন্য পর্দা (চিক)
 প্রস্তুতকারক ।
 গম-পেষক বা গম ভাঙানী ।
 গাইনদার বা নৌকা মেরামতকারী ।
 ছাতা প্রস্তুতকারক ।
 বেহালা প্রস্তুতকারক ।
 ঘটক ।
 মহাজন, ব্যবসায়ী ও গোলদারসহ
 বণিক সম্প্রদায় ।
 মর্সিয়া গায়ক বা হসেনী দালানে
 শোকগীতির গায়ক ।
 ধাত্রী ।
 মোহরার বা লেখক ।
 মোল্লা ।
 মুদীদোকানী ।
 মুরগিওয়ালা ।
 মুরাক্ষ বা কাগজ ও কাপড়
 রঙকারী ।
 মোড়াদার বা ফড়িয়া, যারা খাদ্যশস্য
 বিক্রয় করে ।
 মুগজি, বা যারা কাপড়ের
 আঁচল বা পাড় সেলাই করে ।
 মনিহারী, বা চকবাজারের নানাবিধ

কারুশিল্পী ।
 খোঁড়াতি, বা কুন্দকার ।
 গিল্টিকারী ।
 কলু বা তেলী ।
 কুটিয়াল, বা খাদ্যশস্য পরিষ্কারকারক ।
 মালাকার, বা কৃত্রিম পুষ্প প্রস্তুতকারক ।
 কম্বল প্রস্তুতকারক ।
 তুঁতে প্রস্তুতকারক ।
 মোমবাতি প্রস্তুতকারক ।
 বেতের চেয়ার প্রস্তুতকারক ।
 ঢোলক বা ঢোল প্রস্তুতকারক ।
 পৌতা বা বালা ও অলংকারাদির জন্য
 রেশমি দড়ি প্রস্তুতকারক ।
 পাটনী বা খেয়ার মাঝি ।
 অবসরপ্রাপ্ত লোকজন ।
 পোদ্দার বা টাকা-পয়সা বদলকারী ।
 কুস্তকার ।
 পতিতা ।
 পণ্ডিত ।
 পসারী বা মসলা ও ওষুধ বিক্রেতা ।
 পরতাল্লা বা চাপরাস অথবা তকমার
 জন্য পট্ট প্রস্তুতকারক ।
 রাজ বা রাজমিস্ত্রি ।
 রঙওয়ালা বা টিন ও সীসার উপর
 কারুকার্যকারক ।
 রেজা বা ছাদ-পিটানী ।
 রিফুগর বা ছেঁড়া অংশ সেলাইকারী ।
 রঙরাজ বা বস্ত্র-রঞ্জনকারী ।
 রঙসাজ বা বাড়িঘর, নৌকা ও পালকি
 ইত্যাদি রঙকারক ।
 শাখারী সম্প্রদায় ।
 সেঙ্গার বা ছুরি, কাঁচি, তরবারি ইত্যাদি
 নির্মাতা বা বিক্রেতাগণ ।
 করাতি ।

দ্রব্যের দোকানদার।
 বাদ্যকর।
 নেউলবন্ধ বা যারা ঘোড়ার পায়ে
 নল লাগায়।
 নীলগর বা নীল কাপড়ের রঙকারক।
 নখা বা চিত্র ও পেইন্ট বিক্রেতা।
 নর্দিয়া বা যারা মসলিনের এলোমেলো সুতা ঠিক
 করে দেয়।
 নৈচাবন্ধ বা সর্পাকৃতি হুকা প্রস্তুতকারী।
 ওস্তাগর, ওস্তাগরনী যারা কাসিদা মসলিনের উপর
 সূচীকর্মের তত্ত্বাবধান করে।
 পান্নীওয়ালা বা স্বর্ণ সঞ্চয়কারী।
 পাটীয়াল বা বিছানা ও মাদুর বিক্রেতা। তারকষ বা সূত্র তার দ্বারা পার্শ্বকা নিবন্ধনকারী।
 ছুতো বিক্রেতা।
 ঝড়কুটা বিক্রেতা।
 তাড়ি বা দেশীয় মদ্য বিক্রেতা।
 তামাক বিক্রেতা।
 তরিতরকারি বিক্রেতা।
 বরকন্দাজ ও গিয়নসহ ভৃত্য সম্প্রদায়।
 শালগর বা শাল ধোয়া ও রিকু
 করার লোক।
 শিকারি বা ছস্ত্র মারার লোক।
 সাবান প্রস্তুতকারক।
 ছুতো মেরামতকারী।
 চশমা প্রস্তুতকারক।
 সাঁধুয়া, বা স্বর্ণকারের দোকানের ঝাঁট
 দেওয়া গুঁড়ো কয়লা, জঞ্জাল ইত্যাদি
 থেকে স্বর্ণরেণু বা পুরক পদার্থ সংগ্রহকারী।
 সানতরাশ, বা পাথর কাটার লোক
 ঝাড়ুদার।
 দরজি সম্প্রদায়।
 তালুকদার।

শিকারিগদ বা ইশ্শাত পালিশকারক।
 আতর ও সুগন্ধি তৈল বিক্রেতা।
 বঁশ ইত্যাদি বিক্রেতা।
 চুনি ইত্যাদি বিক্রেতা।
 কাঠকয়লা ও হুকার গোল বিক্রেতা।
 কাঠ বিক্রেতা।
 মরদা বা ছাত্তু ইত্যাদি বিক্রেতা।
 কলম্বু ইত্যাদি বিক্রেতা।
 লেবু বিক্রেতা।
 পানের চুন বিক্রেতা।
 ঠাকুর পূজা বা হিন্দু মন্দিরে পূজা
 পরিচালনাকারী ব্রাহ্মণ।
 তাম্বুলী বা পান বিক্রেতা।
 কাঠের বেগারী বা কাঠবন্দী।
 শিকারওয়ালা বা রক্ত চোষণকারী।
 সড়ক কুলি।
 সমাজী বা নৃত্যে যোগদানকারী
 বাদ্যকর।
 মিসি বা দাঁতের মাজন বিক্রেতা।
 মদ বা আকিস্য দ্রব্য বিক্রেতা।
 কাগজ ইত্যাদি বিক্রেতা।
 বায় পেন্টেরা ইত্যাদি বিক্রেতা।
 সুকলওয়ালা বা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক।
 সাপুড়িয়া বা সাপ ধরার লোক।
 উকিল সম্প্রদায়।
 ধোপা।
 তাঁতি।
 বাস্ত্যশাস্ত্র ইত্যাদির ওজনদার।
 চাকরুর কারবারী।
 জবিন্দার।
 জরদজী বা রেশমি, সোনা ও রূপার সুতার চিকন
 কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

রপ্তানি দ্রব্য

প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হল নানাবিধ বস্ত্র, নীল, সুপারি, জাফরান, পাট, সাবান, চামড়া, শঙ্খবানা, অলংকারাদি, তাম্রনির্মিত বাসনকোসন, পনির ও সংরক্ষিত ফলমূল ইত্যাদি। প্রথমোক্তটির মধ্যে নানারকমের ফুল বা বুটি তোলা মসলিন দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় এবং কাসিদা বা বিভিন্ন রঙের কারুকার্যখচিত বুটি তোলা মসলিন একচেটিয়াভাবে বসরা ও জেদ্দায় রপ্তানি করা হয়ে থাকে; পুনরায় জেদ্দা থেকে ঐ সব বস্ত্র মিসর ও তুরস্কে রপ্তানি করা হয়। বিগত চার বছরে এর রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল অনধিক ৯ $\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা। নীল ও জাফরানি রং কলকাতায় প্রেরিত হয় এবং সুপারি পাঠানো হয়ে থাকে রংপুর, আসাম, আরাকান ও পেগু প্রভৃতি দেশে।

চামড়া

বেশ কিছু পরিমাণ চামড়া কলকাতায় এবং উদ্‌বিড়ালের চামড়া চীনদেশে রপ্তানি করা হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে, মৌরিটিয়াসে এবং পূর্বদিকস্থ দ্বীপসমূহে সাবান এবং পনির ও সংরক্ষিত ফলমূল নিম্নাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের বিভিন্ন স্থানে এবং জেদ্দা ও বসরা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

আমদানি দ্রব্য

আমদানি দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে আসাম ও ময়মনসিংহ থেকে সরিষা ও তৈলবীজ; ফরিদপুর ও গৌরিপুর থেকে চিনি; সিলেট থেকে চুনাপাথর; আসাম, মোরাঙ্গ, রংপুর ও অন্যান্য স্থান থেকে কাঠ; পূর্ণিয়া ও রংপুর থেকে তামাক; আরাকান, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ থেকে তুলা; এবং আরাকান ও পেগু থেকে খয়ের, গজদন্ত, গোলমরিচ, সৈকোবিষ, মোম, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া আসাম ও সিলেট থেকে মুগা বা তসরসিদ্ধ; চট্টগ্রাম ও বাকেরগঞ্জ থেকে নারকেল ও বাকাম কাঠ; সিলেট থেকে ঢাল ও আগর কাঠ বা সুগন্ধি আলোঙ্গ কাঠ; পাটনা থেকে গম, খাদ্যশস্য, জুতো ও কলকাতা থেকে চাঞ্চ-শঙ্খ, বিলেতি সুতা এবং লংক্রথ, নানা রঙের সুতি ছিট-কাপড়, মিহি সাদা সুতিবস্ত্র, শাল, পশমি বস্ত্র, মাটি ও কাচনির্মিত বাসনকোসন, সুই, দেশীয় ঔষধপত্র, মসলা ও ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি বহু দ্রব্য আমদানি করা হয়ে থাকে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলাসমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য স্থানও বটে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা থেকে খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ এবং চট্টগ্রাম ও ভুলুয়া থেকে লবণ ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়ার জন্য নারায়ণগঞ্জে আমদানি করা হয়ে থাকে।

ওজন

এক সেরের ওজন ৮০ $\frac{১}{২}$ সিক্কা। একমাত্র এ ওজনেই সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খুচরা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। কেবল সামান্য কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া, যেমন, পিতলের দ্রব্যাদি সের প্রতি ৭৮ সিক্কায়ে এবং চুন ৯০ সিক্কায়ে বিক্রয় হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য, মণিমুক্তা, মসলা দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র, সুতা ও মসলিন বস্ত্র ইত্যাদির ওজনের ক্ষেত্রে তোলায় ব্যবহার হয়। এক তোলায় মাশার সংখ্যায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জন্য ১০; ঔষধপত্র ও মসলাদির

জন্য ১২ মাশা দু'রশ্তি এবং মণিমুক্তার জন্য ১২½ মাশা। ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলায় এক সেরের ওজন মাত্র ৬০ সিক্কা। খাদ্যশস্য ও তরল বস্তুর পরিমাপ বেত অথবা চাঁচ, কঞ্চি ইত্যাদি নির্মিত বুড়ি এবং ফাঁপা বাঁশের চুঙ্গা দ্বারা করা হয়। নির্ধারিত ওজনের সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ আছে এবং ৮০½ সিক্কা ওজনের সেরের সঙ্গে সবটারই নির্দিষ্ট অনুপাত রয়েছে।

পরিমাপ

আগের দিনে শহরে দু'ধরনের বস্ত্র-পরিমাপন পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল; যথা, সুলতানী গজ ছিল ৩৬½ ইঞ্চির সমতুল্য, এবং কোম্পানি গজ ছিল দৈর্ঘ্যে ৩৯½ ইঞ্চি। বর্তমানে ইংলিশ গজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এবং এর সঙ্গে কাটনি গজ প্রচলিত আছে, যা দৈর্ঘ্যে ৩৪½ ইঞ্চির সমতুল্য। অত্যুৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রাদি ঢাকি নামে প্রচলিত ওজনের দ্বারা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এতে ওজন হ্রাস, কাপড়ের দৈর্ঘ্য এবং ব্যবহৃত সূতার সংখ্যার অনুপাত অনুসারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সূতা ওজন করা হয় দানিস-দাঁড়িপাল্লার মান অনুযায়ী।

বণিক সম্প্রদায়

চার-পাঁচ জন মুসলমান এবং প্রায় অনুরূপসংখ্যক খ্রিষ্টান ব্যতীত সমস্ত বণিক সম্প্রদায়ই হিন্দু। ঢাকার অধিবাসী ব্যবসায়ীগণ তাদের পণ্যদ্রব্য কলকাতায় রপ্তানি করে; অন্যদিকে যারা পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের অধিবাসী এবং এখানে বসতি স্থাপন করেছে, তারা দেশের ঐ অংশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে থাকে। এদের অনেকে বার্ষিক মেলায় যোগদান করে। এসব মেলার পাঁচটিই শহরের কাছাকাছি অবস্থিত। মেলায় যোগদানের পরে এরা তাদের বাদবাকি পণ্যদ্রব্য শহরে বিক্রি করে দেয়। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা আরব্য জাহাজের নাখোদাদের নিকট তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় গমন করে, এবং সাধারণত চার-পাঁচ মাস অনুপস্থিত থাকে। যৌথ কারবারি সংঘ কর্তৃক পরিচালিত বেশ কিছু পরিমাণ ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে চালু আছে। এই সংস্থা প্রায়শই কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষ নিয়ে গঠিত, যারা এ পণ্য সম্ভারের মালিক। এ ছাড়া, নৌকার মালিক ও মাঝিমাল্লারাও এর সঙ্গে যুক্ত থাকে, যারা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে ফটকা বাজারীর আয়ের অংশ লাভ করে। এখানে একজন এজেন্ট থাকে, যে কলকাতা বীমা অফিসের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়, এবং দুজন স্থানীয় বণিক থাকে, যারা পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ নিশ্চিত করে।

দালাল বা শরফ

দালাল এবং শরফ বা পোন্দারগণ এক সময় শহরের খুবই গণ্যমান্য ও সম্পদশালী লোক ছিল। প্রথমোক্তরা ছিল ফড়িয়া; এরা কোম্পানির বাণিজ্য বিষয়ক কর্মচারীগণ কর্তৃক তাদের পুঁজি সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত হত এবং পাইকারদের এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবসার খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিষ্পত্তি করত। মুদ্রা বিনিময় ও দেশের বিভিন্ন অংশে অর্থকড়ি প্রেরণের ব্যাপারে বণিক সম্প্রদায় ও জমিদারদের সঙ্গে শেবোজদের বিরাট লেনদেন বিদ্যমান ছিল। এই দুটো শ্রেণী ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, এবং এতে নিয়োজিত মূলধনের বড় অংশ এদের আয়ত্তে ছিল। কিন্তু আর্কটমুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল এবং সুদের হার শতকরা ১২ তাল নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের মূলধন গুটিয়ে নেয়।

বর্তমানে পোদ্দারদের কাজ কারবার কলকাতা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বেনারস, সিলেট ও মির্জাপুর প্রভৃতি স্থানের ওপর হস্তি প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতায় সংগৃহীত বিনসমূহের ওপর নীলচাষীদেরকে তারা টাকা অগ্রিম প্রদান করে এবং অধিবাসীদেরকে তাদের বাড়িঘর ও জমিজমা বন্ধকীর ওপর ঋণ দেয়। এ ছাড়া, মণিমুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকারাদিও এদের নিকট বন্ধক রাখা হয়। এদের অনেকে কলকাতা থেকে বিলেতি সুতা আমদানি করে এবং তাঁতিদের নিকট খুচরা বিক্রি করে দেয়। কিন্তু শীতের মৌসুমে কলকাতা গমনকারী বণিকরা এ দ্রব্য বিপুল পরিমাণে ক্রয় করে থাকে। এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত পাইকারদের সংখ্যা প্রচুর। এরা শহরের বণিকদের জন্য তাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বাজার থেকে দেশী সুতা ক্রয় ও মসলিন বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে থাকে। ব্যবসায়ী অগ্রিম টাকা প্রদান করে এবং পাইকার তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ একটি পরিমাপ, মান ও সুতার নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্টসংখ্যক কাপড়ের গাঁইট সরবরাহ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর পাইক তাঁতিদের মধ্যে টাকা বিতরণ করে দেয় এবং তাদের কাজের অগ্রগতির তত্ত্বাবধান করে। সে তার পরিশ্রমের জন্য প্রায় শতকরা $2\frac{1}{2}$ ভাগের মতো সামান্য কমিশন পেয়ে থাকে। অর্থের বিনিময় ব্যাপক হলে পাইকার কর্তৃক বস্ত্রাদি বণিকের নিকট উপস্থিত করার পর একজন যাকিন্দার (যাচনদার) বা মূল্য নির্ধারণকারী কর্তৃক তা যাচাই করা হয়। গুণাগুণ অনুসারে বস্ত্রাদি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রতিটি শ্রেণীর মূল্য নির্দিষ্ট করা আছে, এবং যে সমস্ত মোটা বস্ত্রের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হওয়ারও যোগ্যতা নেই, সেসব বস্ত্র প্রত্যাখ্যান করা হয় বা পাইকারের হাতের ওপর ছুড়ে মারা হয়।

টাকা ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক

প্রাচীনকালে দেশের এই অঞ্চলের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য মাসালিয়া (মসলিপত্তন), তাপরাবন (সিংহল) হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বৈরাগর (বোচ) নামক স্থান দিয়ে চালানো হত। এই শেষোক্ত স্থান থেকে তা লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত আদালি ও মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং সেখানে ভূমধ্যসাগরীয় সীমান্ত এলাকা জুড়ে ইউরোপীয় বিভিন্ন প্রাচীন বন্দরে উক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল। সম্ভবত শস্যদানা, মণিমুক্তা ও বস্ত্র ছিল রপ্তানি দ্রব্য। দুজন মুসলমান পরিব্রাজক কর্তৃক প্রদত্ত ভারতবর্ষ ও চীনের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রিস্টীয় নবম শতকে দেশের এই অংশ থেকে চীনারা সুতিবস্ত্র, গুণারের শিং ইত্যাদি ক্রয় করত এবং ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতমানসের সময়ে বাংলার এ অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যাদি তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, পারস্য ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হত। তিনি লিখেছেন যে, বাংলা শহরে “বহু বিদেশী বণিক” ছিল যারা মূল্যবান পাথর ক্রয় করত এবং ৫০টি জাহাজে বোঝাই বস্তাসিন^১ ও রেশমি বস্ত্র প্রতি বছর উপরোল্লিখিত দেশসমূহে পাঠাত। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে র্যালফ ফিচও সোনারগাঁও সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন : “সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে সেসব বস্ত্র ও চাউল সমগ্র ভারতবর্ষে ও সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্য

১ তুলার জন্য ব্যবহৃত ইতালীয় একটি শব্দ—‘বস্তাসিন’

দেশে রপ্তানি হয়।” তাতার্নিয়ার ঢাকার খাসা মসলিন, রেশমি ও সুতিবস্ত্র, নকশা করা কারুকার্যখচিত বস্ত্রাদি প্রভেদে, ইতালি, লাক্সেমবুর্গ ও স্পেন প্রভৃতি দেশে (১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পরিদর্শনের পূর্বে) রপ্তানি হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে জনপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে সুরাট বন্দর যখন ইউরোপ ও ভারতের পণ্যদ্রব্যের জন্য বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন সেই স্থানের সঙ্গে ঢাকা বেশ কিছু পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। এখানকার চাউল রপ্তানি হত করমণ্ডল উপকূলে এবং বস্ত্রাদি যেত সুরাট বন্দরে। বিনিময়ে চাঞ্চ ও কচ্ছপের শঙ্খ আমদানি করা হত, কিন্তু বাণিজ্যোদ্ভূত তখন বিপুল পরিমাণে ঢাকার অনুকূলে ছিল। মসলাদ্রব্য সরাসরি আমদানি করা হত এবং এভাবে বাংলার পূর্বাঞ্চলে আর্কট মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়। আগের দিনের হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অংশেও কাপড় রপ্তানি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। দিল্লিতে সম্রাটের তোষাখানার জন্য এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তার দরবারের প্রয়োজনে বার্ষিক অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মসলিনের সবটাই একচেটিয়া করে নেওয়া হয়েছিল। উৎপাদনকারীগণকে এ ধরনের মসলিন বস্ত্রাদি দেশী ও বিদেশী লোকদের নির্ধারিত মূল্যের উর্ধ্বে বিক্রি করতে দেওয়া হত না। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করার জন্য সেখানে একজন বিশেষ প্রতিনিধি বসবাস করতেন। তিনি বিচারক ও সরকারি রাজকর্মচারীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন এবং মসলিন বস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত সমস্ত ফড়িয়া, তাঁতি ও সূচীশিল্পীগণের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। তাতার্নিয়ারের সময়ে ভুটান, আসাম ও শ্যামদেশে প্রবাল, অম্বর ও কচ্ছপ খোল বা শঙ্খ ইত্যাদি নির্মিত নানাবিধ অলংকার রপ্তানি হত। মসলিন দ্রব্য, উদ্বিড়ালের চামড়া ও শঙ্খবলয় ইত্যাদি নেপালে প্রেরণ করা হত এবং চাউরি, চীনা রেশমি ও তোশবস্ত্র (এক প্রকার গরম কাপড়) ঢাকায় আমদানি করা হত। পেগু ও পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের সঙ্গে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বর্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং খয়ের আমদানি হত। এ সব দ্রব্যের বিনিময়ে মসলিন ও রেশমি বস্ত্র, শাল, সুপারি ও নানারকম অলংকার দ্রব্য এখান থেকে যেত। টাকশাল উচ্ছেদের ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের আমদানি হ্রাস পেতে থাকে, এবং বর্মী যুদ্ধের সময় থেকে বাণিজ্য বহুল পরিমাণে স্তিমিত হয়ে আসে এবং কার্যত তা কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে যায় বলে প্রতীয়মান হয়। মি. হলওয়েল উল্লেখ করেন যে, ১৭৬৫ সালে সাবান্দার শুক্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দুকোটি টাকা। কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি এটা ছিল মোট বাণিজ্যের পরিমাণ; কেননা, এতে কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এখানকার সায়ার শুক্ক পর্যন্ত কখনো উক্ত অর্থের সমতুল্য হয় নি। ১৭৬১ সালে দেখা যায় যে, ঢাকা কারখানায় কোম্পানির পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ লক্ষ টাকা এবং সর্বপ্রকার খরচপত্র ও বেতনসহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৭,৬৬৭ টাকা। ১৭৮৭ সালে কালেক্টর মি. ডে জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল্যায়ন করেন এক কোটি টাকা বা ১ $\frac{১}{৪}$ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং, এবং ঐ অর্থের মধ্য থেকে বার্ষিক ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ইউরোপে রপ্তানির জন্য কাপড় ক্রয়ে ব্যয়িত হত। ইউরোপীয় বাজারের জন্য ১৮০৭ সালে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য ছিল ৮,৬১,৮১৮ টাকা ৮ আনা ৫ পাই। ১৮১০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৫৬,৯৯৬ টাকায়। কিন্তু ১৮১৩ সালে এর মূল্যমান ৩,৩৮,১১৪ টাকা ১২ আনা ৮ পাই-এর উর্ধ্বে ওঠে নি। অতএব, ১৮১৭ সালে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পদ বাতিল

করা হয় এবং উক্ত সময় থেকে কার্যত ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে ঢাকার তাঁতে দেশের সাধারণ পর্যায়ের বস্ত্রাদি ছাড়াও, প্রধানত বুটি তোলা ও কাসিদা মসলিন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে; কিন্তু প্রস্তুত দ্রব্যাদির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় খুব সামান্য।

১৮১৭ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ঢাকার শুল্ক বিভাগের মাধ্যমে রপ্তানি দ্রব্যরূপে প্রেরিত সুতিবস্ত্রের মূল্যের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা নিম্নে দেওয়া হল :

বছর	টাকা	আনা	পাই	বছর	টাকা	আনা	পাই
১৮১৭-১৮	১৫,২৪,৯৭৪	—১	—৮	১৮২৯-৩০	৫,০৪,৮৮২	—১২	—০
১৮২১-২২	১২,১৬,২৫২	—০	—৫	১৮৩১-৩২	৩,৬০,৭৪৭	—৫	—০
১৮২৫-২৬	৬,২৯,১৮৩	—১১	—৩	১৮৩৪-৩৫	৩,৮৭,১২২	—০	—০

সপ্তম অধ্যায়

[মুঘল শাসনামলে রাজস্ব—মহামান্য কোম্পানির প্রশাসনের প্রারম্ভিকাল থেকে রাজস্ব—১৭৬৫ সাল থেকে বেসামরিক প্রশাসন এবং স্থানীয় ঘটনাবলি]

মুঘল শাসনামলে রাজস্ব

মুঘল সম্রাটদের আমলে ধার্য করসমূহ মহল ও সায়ার^১ নামে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১৫৮৮ সালে রাজা তোডরমল কর্তৃক বিভক্ত বাংলার ১৯টি সরকারে পূর্বোক্ত কর বা ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হত। অন্যদিকে, আমাদের বর্তমান করের অনুরূপ স্কট বা কর নিয়ে গঠিত সায়ার হাট, গঞ্জ ও বাজারসমূহ থেকে আদায় করা হত। ঢাকার সঙ্গে সংযুক্ত সরকার ছিল বাজুহা ও সোনারগাঁও। বাজুহা ঢাকা শহরসহ বরবকাবাদ থেকে সিলেট অতিমুখে পূর্বদিকে প্রসারিত ছিল। এর আওতাভুক্ত পরগনা ছিল ৩২টি, এবং নির্ধারিত খাজনা ছিল ৯,৪৭,৯২১ টাকা।

সোনারগাঁওয়ের বেশিরভাগ অঞ্চল মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে বিদ্যমান ছিল, এবং বর্তমানে গঠিত ত্রিপুরা জেলার বেশকিছু পরিমাণ অংশ ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এর পরগনার সংখ্যা ছিল ৫২টি; এবং রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,৫৮,২৮৩ টাকা। বাজুহা ও সোনারগাঁওয়ের অন্তর্গত পরগনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ ভূমি-মঞ্জুরি ও খণ্ড খণ্ড জমি নিয়ে গঠিত “তকসিম জমার” ক্ষেত্রে তোডরমল কর্তৃক স্থিরীকৃত তাদের নির্ধারিত জমা বা খাজনা ছিল। এটা সম্ভবত মৌজাওয়ারিভাবে নির্ধারিত অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রামের খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল তা সে গ্রাম জমিদারগণের ‘নিজ’ তালুকগুলোর অন্তর্ভুক্তই হোক, বা জিম্মাদার কিংবা স্বতন্ত্র তালুকদারগণের আওতাভুক্তই হোক। শাহ্ মাহমুদের রাজত্বের সময়ে এবং ১৭২২ সালে জাফর খানের সুবাদারিত্বের আমলে তোডরমলের মূল সরকারসমূহের সঙ্গে ১৬৫৮ সালে সুলতান শুজা কর্তৃক পরবর্তী সময়ে পরগনাগুলো একত্রে ৩টি চাকলা বা সামরিক ও বেসামরিক অধিক্ষেত্রে (অংশে) পরিণত করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর (বা ঢাকা) চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোনারগাঁও ও বাকলা (বাকেরগঞ্জ) সরকার, বাজুহা ও ফাতেহাবাদের (নোয়াখালী) অংশবিশেষ, এবং উদয়পুর (ত্রিপুরা) সরকার ও মোরাদকান্দি (সুন্দরবন)। এই বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকা আবার কিছুসংখ্যক জমিদারিতে উপবিভক্ত করে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদারি জালালপুরের

১ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিষয়াদির ওপর পঞ্চম রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়; এতে ২৩৬টি পরগনা ছিল, এবং খাজনা ধার্য ছিল ১৯,২৮,২৯৪ টাকা। শূজা খান প্রদেশের সরকার পরিচালনায় জাফর খানের স্থলাভিষিক্ত হন এবং উক্ত ব্যবস্থাপনার দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বণ্টন করা হয়েছে বিবেচনা করে ১৭২৮ সালে তিনি সংশোধিত খাজনা তালিকা বা “জমা তামারি তৌজি” গঠন করেন যার ফলে বাংলা প্রদেশ ২৫টি ইহতিমাম বা জমিদারিতে বিভক্ত হয়।

ঘোড়াঘাট ও যশোহর পার্শ্ববর্তী বা সংলগ্ন চাকলাসমূহের অন্তর্গত এলাকার অংশসহ, চাকলা জাহাঙ্গীরনগর সমুদয় খালসা বা রাজকীয় সম্পত্তি ইহতিমাম জালালপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; ফলে তা একজন নায়েবে-নাজিমের শাসনাধীনে, একটি বিশাল ঢাকা প্রদেশরূপে গঠিত হয়। রেনেল সাহেবের জরিপ অনুসারে এর আয়তন ছিল ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল।

জায়গীর প্রদান

দেশের সামরিক ও বেসামরিক সংস্থাপনসমূহের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ঢাকা জেলায় প্রদত্ত জায়গীরগুলোর পরিমাণ ছিল সমগ্র ভূমির এক-তৃতীয়াংশ। প্রধান প্রধান জায়গীরের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) মগদের আক্রমণের বিরুদ্ধে উপকূলভাগ রক্ষার্থে সশস্ত্র রণতরীসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমলে নওয়ারাহ্। আকবর কর্তৃক নৌবহর সৃষ্টির প্রাক্কালে এর রণতরীর সংখ্যা ছিল তিন হাজারেরও অধিক; কিন্তু পরবর্তীকালে তার সংখ্যা ৭৬৮টিতে হ্রাস পায়। এ ছাড়া, জমিদারগণ কর্তৃক তাঁরা এই জায়গীয় নামের আওতায় যে সমস্ত জমি ভোগদখল করতেন, তার পরিবর্তে তারা বেশ কিছুসংখ্যক রণতরী ও লোকলস্কর সরবরাহ করতেন। নওয়ারাহ্ জায়গীর ছিল প্রধান সমর্পিত সম্পত্তি, এবং নিয়াবাতের (Neabut) উত্তম ভূখণ্ডগুলো এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো আবার বেশ কিছুসংখ্যক ছোট ছোট তালুকে উপবিভক্ত ছিল, যা বেতনের পরিবর্তে নৌবহরের নৌ-সেনা ও কারিগর বা কৌশলীদের প্রদান করা হত।

(২) আমলে আহশাম। সাগর-উপকূলের দুর্গসমূহ রক্ষার্থে গোলন্দাজ সৈন্যসহ ২,৮২০ জন সৈনিকের ভরণপোষণের জন্য এই ভূমি-মঞ্জুরি কাজে লাগানো হত।

(৩) সরকার আলী। পারিবারিক ব্যয়ভারসহ নবাবের অন্যান্য খরচপত্র ইত্যাদি নির্বাহ করার জন্য এই মঞ্জুরি প্রদত্ত হয়; এই জায়গীরের অর্ধেক ভূমি ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

(৪) সাম্রাজ্যে প্রধান সেনাপতির জায়গীর প্রদত্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব ভরণপোষণ এবং ২,৬৫০ জনের একটি অশ্বারোহী সৈন্যদলের রক্ষণাবেক্ষণার্থে। এই জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি প্রধানত ঢাকা ও সিলেটে অবস্থিত ছিল।

(৫) ফৌজদোরন। ঢাকা শহর-নায়েবের প্রধান কর্মস্থল হওয়ার পর থেকে এই মঞ্জুরি প্রদান করা হয় এবং প্রথমে তা মুর্শিদকুলি খানের সামরিক ব্যয়ভার বহনের জন্য দেওয়া হয়েছিল, যিনি প্রথম এই নিয়োগ লাভ করেছিলেন। উক্ত খরচপত্রের পরিমাণ ছিল ১,০০,১৪৫ টাকা।

ভূমি রাজস্বের সঙ্গে সংযুক্ত করকে আবওয়াব বলা হত

আঞ্চলিক রাজস্বের সঙ্গে সংযুক্ত আবওয়াব (Aboabs) নামে অভিহিত কর-ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, যা নাজিমের পক্ষ থেকে সমগ্র দেশব্যাপী আদায় করা হত। এসব কর সুলতান শুজার

আমলে আরোপিত হয়; কিন্তু জাফর খানের শাসনামলেই প্রথম তা নির্ধারিত করে পরিণত হয়। অর্থ প্রদানের হার বৃদ্ধি করা হয়। ঢাকা প্রদেশে সংগৃহীত আবওয়াবসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

খাসনবীসি

(১) খাসনবীস বা ভূসম্পত্তির ইজারা পুনরারম্ভ বা নবায়নের প্রাক্কালে সরকারি রাজস্ব বিভাগ বা খালসা-হিসাবরক্ষণকগণ কর্তৃক জমিদারদের নিকট থেকে আদায়কৃত এক প্রকার ফি বা খরচ (দেয়ক)।

(২) নজর বা দর্শনীর খরচপত্র সংগ্রহ করার নিমিত্ত গুজা খানের নজরান মুকারী, যা ঈদ এবং অন্য বড় বড় মুসলমানপর্ব উপলক্ষে প্রাদেশিক প্রতিনিধি দ্বারা সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হত।

(৩) জরমাথুত (Zermathoat) ছিল জমা-তামারী বা মূল আঞ্চলিক রাজস্বের ওপর দেয় শতকরা $1\frac{1}{2}$ টাকা এবং এটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আবওয়াব নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ জমিদারদের থেকে তাদের বার্ষিক হিসাব নিষ্পত্তিতে নজরপুগ্যা বা উপহারদি, বখেনাত হল খেলাত বা পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয় নির্বাহ করতে খরচপত্রাদি, যা এই সময়ে জমিদারকে উপহার প্রদান করা হত। রুসুম নেজারৎ বা দশ লক্ষ টাকা প্রতি দশ আনা কমিশন, যা খালসা বা সরকারি রাজস্ব বিভাগের প্রধান পিয়ন বা জমাদার কর্তৃক আদায় করা হত।

(৪) ফৌজদারি আবওয়াব। এটা জমির ওপর স্থায়ী কর, এটা নায়েব কর্তৃক তোলা হত এবং অফিসের বকশিশ হিসেবে তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত হত।

(৫) মারাঠা চৌথ। মারাঠাগণ কর্তৃক এই সময়ে বলপূর্বক আদায়কৃত রাজস্বের যোগান দেওয়ার জন্য রাজকীয় ভূমির ওপর আলীবর্দী খান কর্তৃক আরোপিত কর। অন্য ‘আবওয়াব’সমূহ কাসিম খান ও মোহাম্মদ রেজা খান কর্তৃক আদায় করা হত; ঈরা জাফর আলী খানের শাসনামলে ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। প্রধান কর ছিল ক্রীতদাস সিদ্ধা, এবং আবওয়াব খামসী। পূর্বোক্তটি সরকারি রাজস্ব বিভাগে প্রদত্ত খালসা জমা বা রাজস্বের প্রতি টাকার ওপর $1\frac{1}{2}$ আনা নিয়ে গঠিত ছিল এবং পরবর্তীটি ১৭৬৫-৬৬ সালে আদায় করা হয়, এবং তা মহামান্য কোম্পানিকে দেওয়ানি প্রদানের ফলে, তৎপরিবর্তে দিল্লির সম্রাটকে উপহারদানের অজুহাতে কয়েকটি ছোটখাটো কর নিয়ে গঠিত ছিল; যেমন—পোশাক-পরিচ্ছদ বা খেলাতের জন্য, মুর্শিদাবাদে নদীর তীরভূমি বাঁধানোর নিমিত্ত কর, কাছারির ভূত্বদের জন্য মফস্বল থেকে আনীত অর্থ সম্পদের ওপর কমিশন এবং পুরোনো টাকা-পয়সা ভাঙানোর ওপর বাট্টা বা কর।

উপরিউক্ত রাজস্বের উৎসগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ কৈফিয়ত ও তাউফির নামে বিভিন্ন সময়ে আদায় করা হত। এ শব্দ দুটোর দ্বারা বোঝানো হত কর পুনরারোপ থেকে অর্জিত অর্থলাভ যা প্রাদেশিক নায়েব, দেওয়ান ও তাদের অধীনস্থ কর্মচারীগণ কর্তৃক বেআইনিভাবে আদায় হত বলে প্রকাশ পায়। এ ছাড়া আকবরের সময় থেকে রাজকীয় ভূসম্পত্তির ওপর যে পরিমাণ কর ধার্য করা হয়েছিল, সেই অনুপাতে জায়গীরগুলোর ওপর কর বৃদ্ধি করার ফলে তা থেকে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যেত তাও তারা গ্রহণ করত। ঢাকা জেলার প্রধান কৈফিয়ত আসত সায়ার কর বৃদ্ধিজনিত কারণে ও বকশিশ আদায় থেকে যা নওয়াজিস মুহাম্মদ খান নায়েব ও দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত থাকে

কালে ভোগ করতেন। ১৭৬৫ সালে নওয়াবাহ, সরকার আলী, আহশাম ও প্রধান সেনাপতির জায়গীর ইত্যাদি থেকে লক্ষ এই কর ও তাউকির করসমূহের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষাধিক টাকা।

রাজস্ব আদায়ের খরচ

রাজস্ব আদায়ের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কখনো শতকরা ১০ ভাগের উর্ধ্বে যায় নি, এবং নানকর নামে এক বা একাধিক ভূসম্পত্তি (এস্টেটস) জমিদারদের ভরণপোষণের জন্য স্বতন্ত্র করে রেখে তদ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা হত, এর সঙ্গে পরবর্তীকালে জাফর খান কর্তৃক বনকর, জলকর, গোচারগভূমি, জ্বালানি ও মাছ ধরার অধিকারও প্রদান করা হয়েছিল। অন্যান্য ব্যয় মাসকুরাত বা ওজিয়ত নামে পরিচিত খাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরগনাসমূহের উপবিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খালসা জমার হাঁ হারে নিমতাকি ও তাক্সা নামে কানুনগুলোর প্রাপ্য অর্থের এই খাতও মুসকুরাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মকদমি ছিল নিজ বা স্বতন্ত্র তালুকদারদের জন্য একই ধরনের ভাতাবিশেষ, যারা সরকারি খাজাঞ্চিখানায় খাজনা প্রদান করতেন। দেশের ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবিকার জন্য আয়মা, মদদমাশ ও রোজিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। পূর্বোক্ত দুটো সাধারণত ভূমি মঞ্জুরির মাধ্যমে এবং শেষোক্তটি দৈনিক ভাতার আকারে প্রদান করা হত। ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে এই জেলায় বিনামূল্যে প্রদত্ত জমির অর্থমূল্য ছিল ১৭৬৩ সালে ৬,৬৩৪ টাকা। নাজিমের প্রয়োজনে সিবান্দী সৈন্যদল রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রধান খরচের পরিমাণ ছিল ৯০,০০০ টাকা।

সায়ার কর নির্ধারণ

রাজস্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা সায়ার কর মুঘল শাসনামলের প্রথম দিকেই প্রবর্তিত হয়েছিল। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের ওপর আদায়কৃত কর বা শুক্ক, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা কার্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর আরোপিত কর ইত্যাদি নিয়ে তা গঠিত ছিল। এই কর ব্যবস্থা প্রদেশের নায়েব এবং দেওয়ানের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং তারা যা যথার্থ মনে করতেন সেইভাবে এই রাজস্বের সংশোধন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা তারা ব্যবহার করতেন। এ সকল কর নির্দিষ্ট কতকগুলো গঞ্জ, ঘাট ও বাজার থেকে সংগ্রহ করা হত, এবং সাধারণত পার্শ্ববর্তী জমিদার, ইজারাদার বা শতকরা নির্দিষ্ট হারে খাজনা-আদায়কারী কৃষিব্যবসায়ীদেরকে আদায়ের জন্য অনুমতি প্রদান করা হত; কিংবা এসব কর আদায়ের দায়িত্ব সরকারি কর্মচারী, যেমন আমিন ও তহসিলদারদের ওপর অর্পণ করা হত, যারা বার্ষিক ধার্যকৃত অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকত। কর-নির্ধারণের হার ও তা সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো সঠিক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাড়াটে ও তাদের অধীনস্থদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাধীন ছেড়ে দেওয়ায়, এ সকল কর সাধারণত একতরফা ও উৎপীড়নমূলক হত। সায়ার করসমূহ মহল বা আঞ্চলিক রাজস্ব থেকে যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন, তথাপি তা কখনো কোনো নির্দিষ্ট নামে অভিহিত ছিল না। প্রতিটি মহলেই আরোপিত কর পেশা, কার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য বা দ্রব্যের স্থানীয় নাম থেকে তার বৈশিষ্ট্যসূচক নাম গ্রহণ করত। ঢাকা সম্পর্কিত সায়ার শুক্ক সাবানদার ও চান্দিনা এ দুটো দফার অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা ছিল এবং নিম্নলিখিত মহল ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ছিল।

(১) মীর বাড়ি। নৌযান নির্মাণের ওপর ধার্যকৃত একটি কর, যা তরবার আয়তন অনুসারে আট আনা থেকে এক টাকা চার আনা পর্যন্ত হয়ে থাকে। টাকা জেলার অধিবাসী নব—এক প নাবিক বা মাঝিদের যে সমস্ত নৌকা শহরে এসে পৌঁছাত, কিংবা শহর ছেড়ে যেত—সেই সমস্ত নৌকা থেকেও এই কর আদায় করা হত। এটা অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে অত্যন্ত উৎসাহিতমূলক ও ক্ষতিকর ছিল। মুর্শিদাবাদগামী একটি নৌকার দাঁড়প্রতি ৮ আনা হারে, কলকাতাগামী নৌকার দাঁড়প্রতি ১০ আনা হারে এবং বেনারসগামী নৌকার দাঁড়প্রতি ১ টাকা ৮ আনা হিসেবে খাজনা আদায় করা হত। অন্যদিকে, এ সমস্ত স্থান থেকে আগমনকারী তরীগুলোর ওপর নৌকাপ্রতি যথাক্রমে এক টাকা, দু টাকা ও চার টাকা আদায় করা হত। মহল প্রথমে শহরে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা গ্রামেও বিস্তৃত হয়; যেখানে জমিদার ও কৃষি ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক তাদের হৃদয়ঙ্গমের ওপর দিয়ে অতিক্রমকারী প্রত্যেকটি নৌকা থেকে তা আদায় করা হত। এরূপ ব্যবস্থা ডাকাত ধরার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল; কারণ জেলার অন্তর্গত নৌকা, মাঝি ও নৌকার লোকজনদের তালিকা জমিদারগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হত।

(২) চক-নিকাশ। জমির ওপর দোকান-গৃহ নির্মাণের জন্য প্রদত্ত খাজনা বাদে বাজারে বিক্রয় করা প্রত্যেকটি দ্রব্যের ওপর এই কর আরোপিত ছিল। একটি ছাগলের এক থেকে দু আনা আদায় করা হত। ক্ষেতার নিকট থেকে ১ টাকা ৪ আনা আদায় ব্যতিরেকে, হজী ও অশ্বের মূল্যের ওপর শতকরা ৫ ভাগ হারে এবং মহিষের ওপর শতকরা ১৪ ভাগ হারে আদায় করা হত। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধবতী মহিষের মালিকদেরকে প্রতিটি মহিষ রাখার জন্য বছরে ১ টাকা ৮ আনা হারে কর প্রদান করতে হত। তাম্বনির্ষিত বাসনকোসন, অস্ত্রশস্ত্র, ছুরিকাঁচি, সকল প্রকার ছুরিকাঁচির ব্যবসায়, আমনা, হাঁকা, অতি অল্পমূল্যের মণি ইত্যাদি অলংকার, বালা চুড়ি, চিক্রনি ইত্যাদি ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়স্থাপন এবং চকের ফেরিওয়ালা সম্প্রদায়, সকলের ওপরই টাকায় এক আনা হারে কর ধার্য করা হত।

(৩) ধূপ মহল। শহরে কাচের জিনিস বিক্রয়তাদের ওপর আরোপিত কর। বাজারে এই দ্রব্য বিক্রয় কিংবা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ অনুগাতে বছরে দু টাকা থেকে দু টাকা পর্যন্ত উদ্ভিষিত কর আদায় হত। ইউরোপীয়দের আস্তাবলে ঘাস-সরবরাহকারী ঘাস-কাটা লোকদের ওপর মাসিক আট আনা কর ধার্য ছিল। শহরের গরুর বাখালরাও এই একই হারে কর প্রদান করত। অন্যদিকে, যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত, কিন্তু শহরে দুধ বিক্রয় করত, তাদের ওপর মাসিক দু টাকা হারে খাজনা বসানো হত।

(৪) মহল ঘরকাঠি। যে সকল ব্যক্তি শহরে বিক্রয়ার্থে কাঠ, বাঁশ ও ছন ইত্যাদি আনয়ন করত, উক্ত খাজনা তাদের দেয় ছিল।

(৫) মহল ঢাল। এটি ভোলা হত ঢাল এবং সাময়িক সাজ-সরঞ্জাম একুতকারীদের থেকে। তা বছরে এক টাকা থেকে এক টাকা আট আনা পর্যন্ত ধার্য হত। পৃথকভাবে চামড়ার ওপর টাকাপ্রতি এক আনা দশ গুণা হারে এবং তা কালো রং করার জন্য বেল ব্যবহারের নিমিত্ত মনপ্রতি দু আনা হারে কর আরোপিত হত।

(৬) মহল সিন্দুরী। হিন্দুগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সিন্দুর নামে পরিচিত এক ধরনের লাল রং তৈরির ওপর আরোপিত কর। করের পরিমাণ উদ্ভিষিত হয় নি।

(৭) পান মহল। শহরে বিক্রয়ার্থে আনীত পানের ওপর শুল্ক। দামের পার্থক্যের ওপর এটা নির্ভরশীল ছিল; এবং সাধারণত বাভিলপ্রতি একটা নির্দিষ্ট হারে আদায় করা হত। শহরে ও শহরতলিতে পান বিক্রয়ে যারা একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করত, সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই এই খাজনার কর্তৃত্ব গ্রহণ করত। ১৭৭৩ সালে আঠার হাজার চার শ একচল্লিশ টাকা সাত আনা বার পয়সার জন্য পান মহলের ইজারা বা ভাড়া দেওয়া হয়েছিল।

(৮) সব্জি মহল। এটি শাক্সবজি বিক্রেতাগণের ওপর আরোপিত একটি কর। তাদের ব্যবসায়ের পরিমাণ অনুসারে তা বার্ষিক এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হত।

(৯) কাগজমহল। এটি কাগজ বিক্রেতাগণের ওপর বছরে দোকানপ্রতি ৩৬ টাকা হারে আরোপিত একটি রাজস্ব।

(১০) চান্দিনা আলমগঞ্জ। ঢাকা নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যে রত সকল ব্যক্তির ওপর বছরে ১ টাকা থেকে ২ টাকা ৮ আনা পর্যন্ত আরোপিত একটি খাজনা।

(১১) শিরে চান্দিনা, চকোন্দি ও পেশকশ বাজার। সোনা ও রূপার তার এবং আতশবাজি নির্মাণকারীসহ শাঁখারি, পুষ্পখচিত মসলিনের (ছাপা জামদানির) তাঁতি এবং স্বর্ণকার ও সেকরা, শহরের রকমারি কারিগর ও দোকানদার শ্রেণীর ওপর এই কর আরোপিত ছিল। করের পরিমাণের কোনো উল্লেখ নেই।

(১২) চান্দিনা-দামদারী। এটি ভল্লুক, বানর ও সর্প-নৃত্য প্রদর্শনকারী এবং পাখিশিকারি, গায়ক, ফকির ও ভেলকিবাজ প্রভৃতি ব্যক্তিদের ওপর বসানো একটি কর।

(১৩) চান্দিনা বাইজেনট্রি। সকল ধরনের বাদ্যকরদের ওপর আরোপিত একাট কর। এই কর ও পূর্বোক্ত করের সর্বমোট পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৪,৫০০ টাকা।

(১৪) চান্দিনার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শুল্ক ছিল মাহীমহল বা গুঁটকি মাছ বিক্রেতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর। লবণ বিক্রেতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত হত নিমক দালালি, ধোপা কর্তৃক প্রদত্ত হত গুজর মহল। কাঠ বিক্রির ওপর আরোপিত হত ইমাহ্ মহল বা ইমাহ্ শুল্ক।

(১৫) বাতছাপি ও পঞ্চতি মহল। ইতিসাবের পদ বিলুপ্তির পর এসব কর বসানো হয় এবং রাজকর্মচারীদের কর্তৃত্বাধীনে এদের নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করা হয় যারা শহরের সকল রকম ওজন ও মাপজোখ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করত, এসব কর্মচারীকে পণ্যদ্রব্য মূল্যের প্রতি এক শ টাকার ওপর আট আনা হারে কর আদায় করার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল। কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পরও কিছুকাল পর্যন্ত এই কর অব্যাহত ছিল এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের সেক্রেটারি ও কালেক্টর কর্তৃক নিযুক্ত আমিনদের তত্ত্বাবধানে আদায় করা হত এসব কর। নেগাবানগণ বাজারে ওজন ও পরিমাপ পরিদর্শন করতেন এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় মাসে দুবার এসবের ওপর সিলমোহর এঁটে দিতেন ও দোষত্রুটিপূর্ণ ঘটনাসমূহ কালেক্টরের নিকট রিপোর্ট করতেন। কালেক্টর অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন।

অন্যান্য কর

সায়ার শাখাগুলোর মধ্যে চান্দিনা ও সাবানদারের আওতাভুক্ত বিক্রমপুরের বাণিজ্যস্থান ও গঞ্জগুলোতে এবং শহরের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থানসমূহে কয়েকটি মহল ছিল। এগুলো বিভিন্ন

দ্রব্যের বেচাকেনার কাজে নিয়োজিত বেপারি ও ফড়েদের (ফড়িয়া) ওপর আরোপিত অত্যধিক শুক্কসহ পান, সুপারি, তামাক, সুতা ইত্যাদির ওপর বসানো কর নিয়ম গঠিত ছিল; এবং মাঝি, জেলে ও নৌকা নির্মাণকারী প্রভৃতিদের ওপর আরোপিত করসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত অত্যধিক শেখাচারমূলক ও উৎপাদক ধরনের আরো কয়েকটি শুক্ক ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ “মোকাম টঙ্গি-জামালপুর” নামে অভিহিত মহালের উল্লেখ করা যায়। উক্ত স্থানে সকল ব্যক্তি, যারা দেশের অন্যান্য অংশে চাকরিতে নিযুক্ত থাকত তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের ওপর শুক্ক বসানো ছিল; এবং এ স্থান থেকে অর্থকড়ি নিয়ে বাইরে গমনকারী সকল অপরিচিত ব্যক্তিকে তাদের তহবিলের টকাপ্রতি ১ আনা কর প্রদান করতে হত।

হাটবাজারের ওপর আরোপিত শুক্ক

এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের সকল হাট ও বাজার থেকে চান্দিনা ও সাবানদর শুক্ক আদায় করা হত। এগুলো সাধারণত সায়ার শুক্কের একটি শাখা হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বি. ভগলসের মতে, এসব শুক্ক তা থেকে ভিন্ন দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রাকালে ঢাকা প্রদেশের ৫৫৬টি বাজার থেকে এই সকল কর সংগৃহীত হত, এবং এর পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৬৮,৭৮৪ টাকা ৮ আনা ১৩ পয়সা। ১৭৯০ সালে সায়ার শুক্কর সত্ত্ব করসমূহ বাতিল করা হয় এবং এদের উচ্ছেদ সাধনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু জমির ওপর গৃহ নির্মাণের জন্য প্রদত্ত রাজনার অধীনে ভূস্বামীগণ কর্তৃক ঐ সকল কর আদায় অব্যাহত থাকে; সায়ারে বেশ কিছু অংশ ‘লাবেরাজ’ বা নিকর রাখা হয় এবং এদের ভূস্বামীরা পেনশন বা ভাতা লাভ করেন।

১৭৬৫ সাল থেকে রাজস্ব

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের ফলে মহামান্য কোম্পানির নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে যে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়, তার মধ্যে ছিল পুরাতন দুর্গ সংলগ্ন ভূমি, যার ওপর টাকশাল, সরকারি অফিস-আদালত ও নবাবের প্রাসাদ ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। এ ছাড়া ছিল শহীদাবাদ ও জাফরাবাদ পরগনার রাজকীয় ভূ-সম্পত্তির অন্তর্গত প্রায় ৬০০ বিঘা জমি এবং পেশকশ দেওয়ানি ও অন্যান্য সম্পত্তি যা বৈধ উত্তরাধিকারীর অভাবে সম্রাটের অধিকারে চলে গিয়েছিল, কিংবা যে সমস্ত সম্পত্তি মালিকগণ কর্তৃক অপরাধ সংঘটনহেতু বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এ ছাড়াও ছিল রাজীগঞ্জ ও দশরার রাজকীয় দুর্গসমূহ এবং কড় কাটা ও কয়েকটি বাড়ি, কিছু বিচ্ছিন্ন ভূমি ইত্যাদি, যা থেকে বছরে প্রায় ৫৫০ টাকা রাজস্ব আসত। এ সব জমিজমা ছাড়াও চান্দিনার আওতাভুক্ত শহরের কয়েকটি বাড়ি, কয় সড়ক ও বাজার সরকার কর্তৃক অর্জিত হয়। এ সব সম্পত্তি থেকে প্রায় ৭,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হত, কিন্তু বর্তমানে তা বছরে মাত্র ১,৭৮০ টাকায় ইজারা দেওয়া হয়। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষিত নওয়ারাহ্ সংক্রান্ত ভূসম্পত্তির মালিকানা সরকারের হাতে আসার সময় থেকে এখন তা প্রধান সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সম্রাট আকবরের আমলে নওয়ারাহ্ বা রণতরীর বহর প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বেশ কিছুসংখ্যক গ্রাম

ও ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। এই সমর্পিত সম্পত্তির রাজস্ব, খালসা বা সরকারি রাজস্ব বিভাগ থেকে নওয়ারাহ্ বিভাগে স্থানান্তর করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে একটিমাত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হল এই যে, জমির মালিকগণ তাদের খাজনা প্রদেশের দেওয়ানের নিকট প্রদানের পরিবর্তে, নওয়ারাহ্ কর্মচারীদের নিকট দিত। নাবিক, নৌসেনা, কারিগর প্রভৃতিদের অনুকূলে ভূমি-মঞ্জুরি বা অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে এই সকল রাজকর্মচারীর নির্দেশ নিয়ম ইত্যাদি পালনের জন্য দায়ী থাকতে হত। এরূপভাবে নওয়ারাহ্ বিভাগে প্রথমে স্থানান্তরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭,১২,৫০২ টাকা ১৩ আনা, এবং উক্ত অর্থের বেশ কিছু অংশ বিভিন্ন সময়ে ফেরত নেওয়া হয়েছিল। কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রাক্কালে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৭,৬৩০ টাকা ৩ আনা ১ পয়সা; এর মধ্যে ৩২,২২২ টাকা ১২ আনা জমিদারগণ কর্তৃক 'হিস্যারত' রূপে এবং ২৫,৪০৮ টাকা ১ আনা ১৭ পয়সা ঢাকার নবাবের অধীনে তাদের ভোগদখলে ছিল। কিন্তু বাদবাকি ৩,৪৩,৯৪৩ টাকা ৬ আনা ৫ পয়সার আর কোনো হিসাব পাওয়া যায় নি।

সরকার কর্তৃক উদ্ধারকৃত সম্পত্তি

১৭৯৮ সালে ঢাকা ও বাকেরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত হিস্যারত (Hissaraut) ও নওয়ারাহ্ লুণ্ঠায়িত ভূসম্পদ নিয়ে হিসাব করে দেখা গেছে যে, উল্লিখিত অর্থের ওপরে সরকার আরো ৯০,০০০ টাকা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। ঢাকার নবাবের দখলীভূত অংশ সরকার বহুকাল আগে থেকেই পুনর্গ্রহণ করেছেন এবং হিস্যারত ও লুণ্ঠায়িত ভূসম্পত্তির বেশ কিছু পরিমাণ অংশও জেলার রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীগণ কর্তৃক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। শহর ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূসম্পত্তির বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যার মালিকানা বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক দাবি করা হয়েছিল, তাও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ফলে এখনো লুণ্ঠায়িত নওয়ারাহ্ জায়গীরের একটা অংশ ছাড়া, মুঘল সরকারের আমলের এস্টেটের সমগ্র ভূসম্পত্তি বর্তমানে মহামান্য কোম্পানির দখলে এসেছে। যে ভূখণ্ডের ওপর শহর অবস্থিত তাও লাখেরাজ বা নিক্কর বলে কথিত হয়ে থাকে এবং জেলার রাজস্ব কর্মচারীগণও অনুরূপ বিবেচনা করতেন বলে প্রতীয়মান হয়। কোম্পানি কর্তৃক অতি সাম্প্রতিক কালে দখলীকৃত অন্যান্য সম্পত্তি বিভিন্ন নদীগর্ভে অবস্থিত পললভূমি নিয়ে গঠিত।

রাজস্ব হ্রাস

১৭৬৫ সালে কোম্পানির পক্ষে দেওয়ানির বন্দোবস্ত হওয়ার পর ঢাকার নিয়াবাত (Neabut), যা পূর্বে কিছুকালের জন্য মুহাম্মদ রেজা খানের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এখন তার প্রতিষ্ঠিত খাজনা ৩৮ লক্ষ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০½ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়ায়।

পরপৃষ্ঠার বর্ণনায় এ সময়ে ঢাকা-জালালপুর প্রদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকা লক্ষ্য করা যায়। এর আয়তনের পরিধি; আসল জমা-তামারি, বা ১৭২২ সালে রাজস্বের পরিমাণ; ইজাফা সুবাদারী বা ঐ সময় থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত কর নির্ধারণ ও অন্যান্য উৎস থেকে আগত বৃদ্ধি; মোট অর্থ থেকে হ্রাসপ্রাপ্তি এবং খরচপত্র বাদে ১৭৬৫-৬৬ সালে দেওয়ান কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত মোট রাজস্ব।

১৭৭২ সালে পাঁচ বছরের জন্য মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল কর্তৃক বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি

১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য জেলার বন্দোবস্ত প্রদানের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৫ সালের বন্দোবস্তে মুহম্মদ রেজা খান কর্তৃক যে তহবিল তহরুপ করা হয়, ইজারা ও আবওয়াব খামসি দ্বারা তা পূরণ করার ফলে পার্থক্য দূরীভূত হয়ে যায় এবং মোটমোট আদায় হয় ২৯,৭৮,১৪৩ টাকা। এই অর্থ থেকে রাজস্ব আদায়ের (সালিয়ানা) খরচপত্র বাদে মোট লাভ হয় ২৬,৯৩,০৪১ টাকা। হস্তাবাদ তদন্ত কমিশন গঠনের পর কাউন্সিল কমিটি কর্তৃক ১৭৭৭-৭৮ সালে জমিদারগণের কয়েকটি স্থানীয় জমিদারী ভূসম্পত্তিতে পুনর্বহাল করা হয়; এর পূর্ববর্তী চার-পাঁচ বছর সময়ে প্রদেশের $\frac{1}{3}$ অংশ অঞ্চলব্যাপী প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আমিনগণ কর্তৃক উক্ত তদন্তকার্য পরিচালিত হয়েছিল। এ সময়ে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তকৃত ভূমি বা অঞ্চলিক ও সাধারণ রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০,০৮,৯৭৪ টাকা। তা থেকে জমিদারি ভাতাদি বাদ দেওয়ার পর ২৮,৪৯,১১০ টাকার একটি পাঁচমিশালী জমা থেকে যায়। ১৭৮৩-৮৪ সালে রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীগণ কর্তৃক জমিদারদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য বন্দোবস্তকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল আদায়ের খরচপত্র বাদে ২৮,০৯,৯৯৮ টাকা। সালিয়ানা (১৭৭২ সালে প্রবর্তিত) ছাড়াও উক্ত ব্যয়ের মধ্যে ছিল হুন্ডিয়ান (Hoondeauan) বা অর্থ প্রেরণের খরচপত্র; শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত বিচারকরূপে জমিদারের কার্যকালে ফৌজদারী বা পিয়নদের জন্য ভাতা এবং আকরা-যৌথ সংক্রান্ত কিছুসংখ্যক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, যেমন মসজিদ এবং দুরা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করার খরচপত্র।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ঢাকা কালেক্টরের এলাকা

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ঢাকা কালেক্টরেট এই জেলা (বর্তমানে যে ভাবে গঠিত) এবং বাকেরগঞ্জ নিয়ে গঠিত ছিল। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১২½ লক্ষ টাকা এবং ভূস্বামীদের সংখ্যা ছিল ১৬,০০০। প্রথমে স্বতন্ত্র বা নিজ তালুকদারগণের সংখ্যা ছিল ৩৮০, কিন্তু ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে অধস্তন তালুকদারদের বেশিরভাগ, যারা নিজ তালুকদারকে খাজনা প্রদান করত, তাদেরকে স্বাধীন করা হয় এবং সরাসরি ট্রেজারিতে রাজস্ব জমা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়।

অধিকতর সহজ পদ্ধতিতে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা

এই অসংখ্য ভূস্বামীদের সাহায্যার্থে এবং দূরবর্তী স্থানে তাদের ভ্রমণের কষ্ট লাঘব করার জন্য ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে জেলাটিকে কয়েকটি কালেক্টরেট জেলায় পুনর্বিন্যস্ত করা হয় এবং রাজস্ব গ্রহণের নিমিত্ত তহসিলদারগণকে সেসব স্থানে পাঠানো হয়। কিন্তু বিভিন্ন তালুক বহু পরগণাব্যাপী বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততবিক্ষিপ্ত থাকার কারণে রাজস্ব আদায়ের এ পদ্ধতি অবাস্তব প্রমাণিত হয়। অগত্যা এই ব্যবস্থা বাতিল করে কালেক্টরের কাছারিতে খাজনা প্রদানের বর্তমান রীতি চালু হয়।

মুঘল শাসনামলে রাজস্ব বিভাগের বিভক্তিকরণ

মুঘল শাসনামলের রাজস্ব বিভাগ হজুরী ও নিজামত—এ দুটো শব্দে বিভক্ত ছিল; এবং ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এ উভয় শাখার স্বাধীনতা বজায় ছিল। এ সময়ে উক্ত শব্দ দুটোকে প্রথমোক্তটির নামের অধীনে সংযুক্ত করা হয়। ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কালেক্টরেট কার্যকরী হলে উপবিভক্ত হওয়ায়, হজুরী তহসিল ও জেলা তহসিলের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থা এখনো কালেক্টরেটে চালু রয়েছে, যদিও পরবর্তী নামের দ্বারা চিহ্নিত রাজস্ব আদায় পদ্ধতি এখন আর অবলম্বন করা হয় না।

শহরে উত্তেজক কড়া মদ্য চোলাইও বিক্রয় করা হত; এবং এর জন্য সরকারকে কোনোরূপ ক্ষতি প্রদান করা হত না। অবশেষে ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে মি. ডগলাস কর্তৃক এই মহল গঠিত হয় এবং বার্ষিক ২,১০০ টাকার জন্য তৎকর্তৃক এর ইচ্ছা প্রদান করা হয়। এই সময়ে মদের ভাটিখানার ওপর সাধারণ ক্ষতি ছাড়াও প্রতিটি টোবাক ও আগুনের চুল্লি রাখার স্থানের ওপর একটি কর আদায় করা হত, কিন্তু মহররম, রমজান ও ঈদের সময় উক্ত কর প্রদান থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করা হত। কেননা, এসব পর্বে উপলক্ষে মদ ব্যবহারের মাত্রা থাকত খুবই সামান্য। ফলে, চোলাইকারীরা তাদের কাজ বন্ধ রাখত। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এই করের পরিমাণ ছিল ৫,৬৯৬ টাকা, এবং ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ৬,০০০ টাকা। এ সময়ে হিসাব করে দেখা গেছে যে, তখন দৈনিক ৩২০০ কোয়ার্ট ভাড়া বা খেনা মদ চোলাই করা হত। আফিমের তৈরি নানাবিধ দ্রব্য যেমন, মদক ইত্যাদির ওপর ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ক্ষতি আরোপিত হয় এবং আফিমের ওপর কর ধার্য করা হয় ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৯৩ সালে গাজার আমদানিকারকরা মনপ্রতি ২ টাকা ৪ আনার ক্ষতি (কুসমহল) প্রদান করেছিল, এবং শহরে এর বিক্রয়গণ দিত মাসে দু'আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত।

নিম্নলিখিত বর্ণনায় ১৮৩৬-৩৭ সালের জন্য ঢাকা-জালালপুরের রাজস্বের পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে।

১৮৩৬-৩৭ সালে ঢাকা-জালালপুরের রাজস্বের পরিমাণ

		টাকা	আনা	পয়সা
ভূমি রাজস্ব	হজুরী তহসিল	২৮৯১৯৫—	৯—	০
	জেলা তহসিল	১৪১১৫৪—	৪—	৫½
		৪৩০৩৪৯—	১৩—	৫½
আকবরী রাজস্ব	আফিম, মদ ইত্যাদি	৪০৭৬৫—	৩—	১
	স্ট্যাম্প ইত্যাদি	৮৩২৬৫—	৮—	১
		১২৪০৩০—	১১—	১
সর্বমোট :		৫৫৪৩৮০—	৮—	৬½

রাজস্বের অন্যান্য শাখা হল চৌকিদারি ট্যাক্স এবং খেরা ও ডাকবিভাগ কর ইত্যাদি।

১৭৬৫ সাল থেকে জেলার সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা

কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময়ে ঢাকা প্রদেশের সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা হজুরী ও নিজামত নামক দুটো বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। পূর্বোক্তটি ছিল প্রাদেশিক দেওয়ানের অধীন, যিনি মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন, এবং তদীয় সহকারী রাজা হিম্মত সিংহের মাধ্যমে ঢাকায় তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। খালসার বা সরকারি রাজস্বসমূহের প্রধান অংশের দায়িত্ব ছিল এই রাজকর্মচারীর হাতে। তিনি তাঁর আওতাধীন রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করতেন। জশরৎ খান কর্তৃক নিজামতের কার্যাদি পরিচালিত হত, যিনি নায়েব বা নবাবে-নাজিমের সহকারীরূপে কার্য সম্পাদন করতেন। তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের তত্ত্বাবধান করতেন এবং রাজস্বের একটা অংশও তিনি আদায় করতেন যা তাঁর শাসনকার্য পরিচালনার খরচপত্র নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ সিক্স ও মুর্শিদাবাদের দেশীয় মন্ত্রীগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত ঢাকার সরকারি সংস্থাপন বিভাগসমূহের বার্ষিক ব্যয়ের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল।

	টাকা	আনা	পয়সা
১। রাজবন্দীদের জন্য ভাতা : (লর্ড ক্লাইভ এদেরকে ১৭৬৭ সনে মুক্তিদান করেন)	৩৪,৭৫৫—	১৫—	০
২। নিম্নশ্রেণী ইত্যাদি অধিবাসীদের মধ্যে অনবরত সংঘটিত ঝগড়াবিবাদ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা-মকদ্দমা পরীক্ষা করে দেখা ও নিষ্পত্তির জন্য নিযুক্ত ছয় সদস্যের ‘কোর্ট অব জাস্টিস’-এর প্রত্যেক সদস্যের জন্য মাসিক ৫০ টাকা হারে ভাতা ...	...	...	৩,৬০০
৩। দেওয়ানি সংক্রান্ত ব্যয়	...	...	২৫,০০০
৪। কাছারি সংক্রান্ত খরচপত্র (স্টেশনারি দ্রব্যাদি, গালিচা, তৈল, মাদুর ও অন্যান্য দ্রব্যসহ পাইক, সরদার, মুন্সীয়া ও ভৃত্যগণের পণ্য ব্যয়।)	...	...	৮,৫০০
৫। দান খয়রাত	...	...	৮,৩৮৮
৬। সাধারণ খরচপত্র	...	...	৮,৬১৮-১৫-২
৭। মাসিক ৬,০০০ টাকা হারে জশরৎ খানের ভাতা	...	...	৭২,০০০ ✓
৮। মহাসিংহের প্রাদেশিক দেওয়ান, মাসিক ৪,০০০ টাকা হারে (এই টাকা থেকে হিম্মত সিং পেতেন মাসিক ৫০০ টাকা হারে)	...	...	৪৮,০০০
৯। সুপারভাইজারের প্রাতিষ্ঠানিক খরচপত্র	...	...	৩৬,৫০০

সর্বমোট : ২,৪৫,৩৬২-১৪-২

১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ কেলস্যাল হজুরী ও নিজামত উভয় বিভাগের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বসহ মাসিক ১,০০০ টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

হয়েছিলেন। তাঁর দপ্তরে চুক্তিবদ্ধ তিনজন ইউরোপীয় কর্মচারী ছিলেন, যারা সহকারী, ফার্সির অনুবাদক ও একজন ইংরেজি লেখকরূপে কাজ করতেন। এ ছাড়া ছিল ১ জন প্রধান সেরেস্টাদার ও দু'জন সহকারী সেরেস্টাদার, ১১ জন মোহরার, ৩ জন আমিন, ১ জন নায়েব ও ২ জন মুনশী। তিনি আদায় উসুলের বিষয় তদারক করতেন যা তখন মফস্বলে আমিলগণ কর্তৃক করা হত এবং তাঁর ফৌজদারী ক্ষমতাবান এলাকার সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন জশরৎ খান ও মুর্শিদাবাদের দেশীয় মন্ত্রীদেব মধ্য যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম। এই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনোরূপ উপরস্থ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নায়েবই ছিলেন বাঁচা-মারার মালিক। কিন্তু মিঃ কেলসালের নিযুক্তির পর অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে তাঁর বিচারালয়ের ধারাবিবরণীগুলো প্রদত্ত দপ্তর অনুমোদনের নিমিত্ত রেসিডেন্টের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের দরবার ও কাউন্সিলে দেশীয় মন্ত্রীদেব নিকট পেশ করা হত। নিজামতের সকল ব্যবসা-সংক্রান্ত বিচার কার্যে, যাতে বিদেশী কারখানাগুলোর অন্তর্ভুক্ত লোকজন জড়িত থাকত, তা কেবল তত্ত্বাবধায়কের বিশেষ তদন্তের জন্য সংরক্ষিত থাকত।

১৭৭১ সালে মি. হ্যারিস তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্বাবধায়ক পদে মি. কেলসালের স্থলে মি. হ্যারিস নিযুক্তি লাভ করেন এবং তাঁর মাসিক বেতন ১৮০০ টাকায় উন্নীত হয়। নওয়ারাহর রাষ্ট্রীয় রণতরীসমূহ ১৭৬৯ সাল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এবং এখন ওকানগরের অপ্রয়োজনীয় পদ, এবং পরবর্তী সময়ে ইতিসাবের পদও বাতিল করা হয়। সায়ার কর এবং বিশেষ করে লবণ, সুপারি এবং তামাকের ওপর কর আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজস্বের এই শাখার তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। নিরপেক্ষভাবে যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, তা দেখার জন্য আদালত কাছারিতে একজন ইউরোপীয় কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, বিশেষত যখন গুরুত্বপূর্ণ মামলার মীমাংসা করতে হত।

নদীপথে ও সুন্দরবনে অসংখ্য ডাকাতদল

নদনদীগুলোতে অসংখ্য চোর-ডাকাত ছিল এবং তাদেরকে ধরার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্য শহরে ডাকাতদের হরকার (গুপ্তচর) থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চল চোর-ডাকাতে পরিপূর্ণ থাকার কথা, কলকাতা যাবার পথে ক্যাপটেন হল্যান্ডের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এ বছরের প্রারম্ভে আমিলদের স্থলে একজন দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছেন, যাকে মফস্বল থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, এবং আদায় করা রাজস্বের প্রায় সবটাই এ সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কারখানাগুলোতে দিয়ে দেওয়া হয়। বাদবাকি সামান্য অর্থ কেবল বাণিজ্যিক বিল বা হস্তির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হয়। দেওয়ানি নৌবহর রক্ষণাবেক্ষণের বার্ষিক খরচ ছিল ৪০,০০০ টাকা, এখন বছরের সংখ্যা হ্রাস করে ৩৭ থেকে ১৮ করা হয়।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লাস্কার্ট নিযুক্তি লাভ করেন এবং কালেক্টর উপাধি নিয়ে মিঃ গ্রুভারের স্থলাভিষিক্ত হন

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মিঃ লাস্কার্ট তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং ঐ বছরের আগস্ট মাসেই কালেক্টর উপাধি নিয়ে তিনি মিঃ গ্রুভারের স্থলাভিষিক্ত হন এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। এই বছর মহাম্মদ রেজা খানের স্থলে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর, সরকারি দপ্তরসমূহে কয়েকটি পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান ছিল দেওয়ানি আদালতের প্রতিষ্ঠা এবং কালেক্টরকেই এর তত্ত্বাবধায়ক করা হয়। সেখানে তিনি দেশীয় দেওয়ানের সহায়তায় দেওয়ানি মামলা-মকদ্দমার বিচার-আচার করতেন, এ সকল বিষয়ের খোঁজখবর নিতেন, যা পূর্বে হজুরী দপ্তরের সহকারী প্রধান রাজা ইম্মত সিংহের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হত।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসীদের বিরাট সমাবেশ

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কালেক্টর সরকারের নিকট অতিরিক্ত সৈন্যদলের জন্য আবেদন করেন। এ সময়ে প্রায় ১০,০০০ সন্ন্যাসী মধুপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একত্র হয় এবং গ্রামাঞ্চল লুণ্ঠন করে। ফলে অধিবাসীরা গ্রাম পরিত্যাগ করে নিরাপত্তার জন্য জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কোম্পানি টিমাসের হত্যা এবং একদল সন্ন্যাসীর হাতে কিছুসংখ্যক সিপাইয়ের পরাজয় বৎ ইত্যাদি বিষয় কালেক্টরের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছিল।

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হয়। এর প্রধান ছিলেন মিঃ বারওয়েল এবং মি. পল্লি, মিঃ হ্যাকারে, মিঃ শেল্লপিয়ার ও মিঃ হল্যাড প্রমুখ ছিলেন এর সদস্য। এখন থেকে নারেন্দ্রকে রাজস্ব সংগ্রহ কাজে ও দেওয়ানি আদালত পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত আদালত থেকে কাউন্সিলের নিকট আপিল করার ব্যবস্থা রাখা হয়। অন্যান্যক, ইটরোপীয় চুক্তিবদ্ধ সহকারীদের নিযুক্তি প্রদান করে নিম্নলিখিত পদগুলো পূরণ করা হয়: ১ম—বকশি বা কোষাধ্যক্ষ; ২ম—কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার জন্য রাজস্ব বিভাগের সহকারী; ৩ম—অল্পসংখ্যক রপ্তানি সংক্রান্ত (sub-export) পণ্যগার রক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের সাময়িক সহকারী; ৪র্থ—রপ্তানি দ্রব্যের গুণমানের সহকারী ও রাজস্ব বিভাগের সাময়িক সহকারী; ৫ম—সেক্রেটারি; ৬ষ্ঠ—হিসাবরক্ষক; ৭ম—দেওয়ানি কাছারির নথিপত্রের জন্য সহকারী; ৮ম—সেক্রেটারির সহকারী; ৯ম—প্রধানের সহকারী; ১০ম—কর্মী অনুবান্ধক।

জশরৎ খান স্ব-পদে বহাল থাকেন

জশরৎ খান চাকাতুলের ধরার জন্য তাঁর অধীনস্থ কৌশলদার ও পুলিশদল পরিচালনা করেন, কৌশলদারি আদালতের তত্ত্বাবধান করেন এবং কোম্পানি কর্তৃক ইতপূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি পরিবর্তন সত্ত্বেও স্ব-পদে বহাল থাকেন। অতঃপর তাঁর বৃদ্ধ অবস্থা ও কোম্পানি সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে তাঁকে নিজস্ব বিভাগের ব্যয় নির্বাহ করার নিমিত্ত মূল মজুরিকৃত বেতনেই প্রতিশ্রুতি করার ব্যবস্থা করা হয়।

ইংরেজ ও করাসিদের কণ্ঠা

এ বছরের প্রধান ঘটনা ছিল পূর্বাভাস নব্বয়ের অধীন জনৈক কর্মচারীর অবরোধ থেকে সৃষ্ট ইংরেজ-করাসি কারখানার প্রধানদের মজুরকার বিবাদ। এই কণ্ঠার উত্তর পক্ষের মধ্যে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের শ্রম জেগে ওঠে। অতঃপর, জশরৎ খান ঘোষণা করেন যে,

বিদেশী কারখানায় কোনো দেশীয় ব্যক্তি আশ্রয় নিলে তাঁকে অপরাধীরূপে গণ্য করা হবে ও প্রেষ্টারপূর্বক শাস্তি প্রদান করা হবে। এটা পরবর্তীকালে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসি সরকারদ্বয়ের মধ্যে একটি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।

ডাক-দপ্তর

ডাক-দপ্তর বিভিন্ন বিভাগে প্রসারিত হয়। সবটাই বহুতল ও অসংযুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে এবং খরচপত্র কিছুটা কোম্পানি দ্বারা এবং কতকটা জমিদার ও ভোগদারদের ওপর আরোপিত শুদ্ধের দ্বারা নির্বাহ হয়। এ অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় যে, “কোনরূপ বন্ধ বা নিয়মশৃঙ্খলার অভাবহেতু ডাক বিভাগ দুর্বোধ্য জটিলতার জর্জিরে, পড়ে এবং সাধারণ চিঠিপত্র আদান-প্রদানের সময় অপেক্ষা এতে অধিক বিলম্ব ঘটে।” চিঠিপত্র আদান-প্রদানের সুবিধা ইউরোপীয়রা ভোগ করত।

ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যদলের পরিমাণ

এ সময়ে কোম্পানির সৈন্য বলতে ঢাকায় কেবল চট্টগ্রামের আগন্তুক সৈন্যদলের দুটো কোম্পানি ছিল। কিন্তু এই সৈন্যদল অপ্রচুর বিধায়, একটি বিশিষ্ট রেজিমেন্ট গঠন করা হয় এবং তা কাউন্সিলের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বাহিনী দুটি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ছিল। প্রতিটি কোম্পানিতে এক শ সৈন্য ছিল এবং একজন এল্ফুজেন্ট ও সেক্স সামরিক কর্মচারীদের একটা পূর্ণসংখ্যা নিয়ে তা একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। এর কর্তব্য ছিল প্রধানত দেশের কাছাকাছি মূহ ও শিল্প-নির্মাণ কার্যের বা বাধাচল্লি রক্ষা করা, অর্থসম্পদ সমস্ত পাহারাধীনে আনা-নেওয়া, লবণের ট্রান্সপোর্টের প্রতিরোধ করা, প্রাদেশিক কাউন্সিল ও ফৌজদারি আদালতের আদেশ-নির্দেশ কার্যকর করা এবং অবাধ্য জমিদার ও তালুকদারদেরকে প্রেষ্টার করা ইত্যাদি।

সরকারি ব্যাংক স্থাপন

এ সময়ে অন্যান্য সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে ছিল সরকার কর্তৃক একটি ব্যাংক স্থাপন। মুদ্রার মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও অস্থির বণ্যদানের ক্ষেত্রে সরকারের মাস্তকিক সুদ জন্মের ও অসমস্ত দাবির অত্যাচার থেকে রক্ষিত এক চূ-অধিকারীদের কিছুটা মুক্তিমান এর উদ্দেশ্য ছিল।

আর্কট মুদ্রা

এ সময় বাংলার পূর্বাঞ্চলে আর্কট টাকাই ছিল দেশের প্রচলিত মুদ্রা, এক ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ আর্কটসহ সর্বসাধারণ এই মুদ্রার দামটি তিন তিন মূল ও নব্বই ইটমি বিস্তারিত ছিল। তাম্রমুদ্রার স্থলে কড়ি ব্যবহৃত হত এবং তাম্র মূল্যমুদ্রার পরিমাণ ৫০,০০০ টাকার উপরে ছিল না। আর্কট মুদ্রাতেই রায়চরণ তাদের বাক্য প্রকাশ করত, এক চাঁচি ও মুদ্রা প্রতীকায়করণও এই মুদ্রাতেই অস্থির দাম নিত। প্রত্যেক প্রায়েই এক হু একমিক

গোন্দার ছিল, এবং এই সকল মুদ্রা শহরে সিকার সঙ্গে বিনিময়ের পূর্বে, এদের নিকট মূল্যায়নেও জনা অর্পণ করা হত। কারণ, সরকারি রাজস্ব সাধারণত সিকাতেই পরিশোধ করা হত। বিভিন্ন মানের প্রচলিত মুদ্রা-মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাটার পরিমাণের পার্থক্য পাইলক্ষিত হত এবং এর পরিমাণ সময় সময় উর্ধ্ব শতকরা ১ ভাগ পর্যন্ত ছিল। এ ব্যাপারে ব্যাংক জনসাধারণের দুর্গতির উপশম করতে পারে নি বলেই মনে হয়। ফলে এ প্রথা প্রচলনের প্রায় এক বছর পরেই এর বিলুপ্তি ঘটানো হয়। এই বছরে ক্যাপ্টেন এলারটনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য জয়ন্তিয়ার রাজধানী দখল করে।

তাতি সম্পর্কিত মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য নায়েবদের নিয়োগ

যে সমস্ত মকদ্দমায় তাতিয়া জড়িত ছিল, তা নিষ্পত্তির জন্য ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন আরও নায়েবদেরকে নিয়োগ করা হয় এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যতীত, ১০০ টাকা পরিমাণ মকদ্দমাও লা নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা এদেরকে দেওয়া হয়েছিল, এবং দশ টাকার নিম্নে সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত।

মিঃ বারওয়েল, যিনি এই বছরেই সুপ্রিম কাউন্সিলে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর স্থলে প্রধান কমকর্তার পদে মিঃ বাউস নিযুক্তি লাভ করেন; আর বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগে আসেন মিঃ গ্রুভার। এই বছরের শেষের দিকে বাংলার নায়েবে নাজিমরূপে মহাম্মদ রেজা খানের নিযুক্তির পর, কয়েদিদের আহাৰ্য যোগানের জন্য জমিদারদের ওপর আরোপিত কর বাতিল করা হয়। ঢাকা জেলে এ সময়ে আটককৃত ১১০ জন কয়েদির মধ্যে ৮৭ জন ছিল ডাকাত; ১৫ জন হত্যাজনিত কারণে এবং ৮ জন চুরির অপরাধে আটক ছিল। কাউন্সিল প্রধান কর্তৃক সভার একটি কার্যবিবরণীতে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে ৯৫ জন ছিল সড়ক নির্মাণ ও লোহার কাজে ব্যাপৃত “আদালতে যাদের অপরাধ কখনো প্রমাণিত হয়নি; এবং এদের অনেকে এরূপ অবস্থায় ন’ বছর যাবৎ ছিল।” পুণ্যাই বা জমিদারদের সঙ্গে বার্ষিক হিসাব-নিকাশ নিষ্পত্তির দিনে প্রাদেশিক কাউন্সিল কর্তৃক পাওয়া নজরের অর্ধকাড়ি এ সময়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদান করা হয়েছিল।

১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ও কোম্পানির আদালতের মধ্যে সংঘর্ষ

১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দের প্রধান ঘটনা ছিল রাজা এবং কোম্পানির আদালতের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়, যা সম্ভবত এখানকার ও ইংল্যান্ডের উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মি. পিট এ্যাটর্নি, শরীফ ডিপুটি ও হাইকোর্টের একজন বিভাগীয় কর্তা—এই তিন যোগ্যতাবলে ঢাকায় বসবাস করছিলেন; তৎকর্তৃক প্রাদেশিক ফৌজদার সৈয়দ আলী খানের গৃহে ফৌজদারি আদালতের পেশকার জগন্নাথ নামে জনৈক ব্যক্তির ওপর পরওয়ানা জারি করার সময়ে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়; এবং দুপক্ষের মধ্যে সংঘটিত ধস্তাধস্তির প্রাক্কালে দুর্ভাগ্যবশত ফৌজদারের জনৈক আত্মীয় মীর হুসেন গুলিবিদ্ধ হন। কোনো একটি মকদ্দমা থেকে এই পরওয়ানা জারি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে সামান্য অপরাধের জন্য কিরো (Kyeroo) নামের জনৈক ব্যক্তিকে জগন্নাথ আটক রেখেছিল। অতঃপর, উক্ত আটককৃত

ব্যক্তি পলায়ন করে কলকাতায় গমন করে এবং সেখানে সে অনাধিকার প্রবেশ ও অবৈধভাবে আটকে রাখার জন্য জগন্নাথের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

ইংরেজদের নিকট ফরাসি ফ্যাক্টরি সমর্পণ

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে লেফটেন্যান্ট কাউইয়ের নিকট ফরাসি ফ্যাক্টরি সমর্পণ করে; এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের সেক্রেটারি মিঃ লজের আদেশে মিলিশিয়ার একটি দল ত্রিপুরা জেলার যুগদিয়া (ঢাকা ফ্যাক্টরির একটি শাখা) দখল করে নেয়। ঢাকায় তাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল ২টি বাড়ি এবং বার্ষিক তিন শ টাকা আয়ের একটি গজ বা বন্দর। তাদের অবশ্য তেজগাঁও এবং বাকেরগঞ্জের বাড়িঘর ছিল।

মিঃ শেঙ্গুপিয়ার ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ রাসের স্থলাভিষিক্ত হন এবং মিঃ হল্যাড, হ্যাচ, লজ ও ডে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত হন।

১৭৮১ সালে কাউন্সিল বাতিল

১৭৮১ সালে কাউন্সিল বাতিল করা হয়। মিঃ ডে কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়, এবং এর প্রথম জজ ছিলেন মিঃ ডানকানসন। কৌজদার ও থানাদারদের ডেকে পাঠানো হয় এবং জজ ডাকাতদের খেঁজাবের ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কার্য পরিচালনা করেন। এই বছরেই ওলন্দাজ (Dutch) ফ্যাক্টরির দখল নিয়ে নেওয়া হয়। ১৭৮৩ সালে মিলিশিয়া ভেঙে দিয়ে তদস্থলে সিবনী বা প্রাদেশিক সৈন্যদল গঠন করা হয়। ওলন্দাজদের সম্পত্তি বলতে শহরে ৩১টি এবং তেজগাঁওয়ে একটি বাড়ি ছিল।

১৭৮১ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত উনবাট জন সিভিল সার্ভেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু এদের মধ্যে ত্রিশ জনই কেবল সাময়িকভাবে উক্ত পদে বহাল ছিলেন। সুতরাং প্রতিজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের গড়পড়তা মেয়াদ দু বছরের। দীর্ঘতম কার্যকালের মেয়াদ ছিল চার বছর সাতাশ দিন। ঐ একই সময়ের জন্য কালেক্টরদের সংখ্যা ছিল সাঁইত্রিশ জন। এদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন সাময়িকভাবে নিযুক্ত কালেক্টর। সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন তিনি একজন হাঙ্গেরীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর কার্যকাল ছিল ছ বছর পঁয়তাল্লিশ দিন।

ম্যাজিস্ট্রেটের বৈধ কর্তৃত্বের সীমা

ম্যাজিস্ট্রেটের বৈধ কর্তৃত্ব ২০টি থানা বা পুলিশ জেলায় বিভক্ত; এর মধ্যে ১০টি শহরে এবং বাদবাকি ১০টি মফস্বলে। এই জেলায় নিয়োজিত চৌকিদারদের সংখ্যা হল ২,৬১৯ জন; ৯০ জন বরকন্দাজ ও ১০ জন জমাদার ছাড়াও চৌকিদারদের ১৮৯ জন এই শহরেই কার্যরত আছে।

ঢাকা ও ফরিদপুরের বেসামরিক বিচার বিভাগভূক্ত এলাকার পরিধি হল ৪,৮০০ মাইল। এর সঙ্গে সংযুক্ত প্রধান প্রধান কর্মচারীরা হচ্ছেন ১ জন সিভিল ও সেশন জজ, ২ জন প্রধান সদর আমিন, ১ জন অতিরিক্ত সদর আমিন ও ৯ জন মুন্সেফ। মোট বার্ষিক খরচের পরিমাণ

৭৭,৭৪১ টাকা ১১ আনা ৯ পয়সা। ১৭৯৬-৯৭ সালে দলিলপত্র রেজিস্ট্রিকরণ থেকে ১,৭৭০ টাকা আয় হয়। বর্তমানে এ থেকে বছরে প্রায় ৪৫০ টাকা আসে।

কালেক্টরের অফিস

কালেক্টরের অফিস—সাতটি ছোট ছোট বিভাগ; যেমন ট্রেজারি, দেওয়ানি, সেরেস্টাখানা, মুন্সীখানা, নেজারত, রেকর্ড অফিস, আকবরী ও স্ট্যাম্প অফিস ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। কালেক্টর ও ৩ জন ডেপুটি বাদে এতে কর্ম-নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ৯৩। মোট মাসিক খরচ হয় ৪,০৯৯ টাকা ১০ আনা ৫ পয়সা।

অষ্টম অধ্যায়

[অধিবাসী : হিন্দু—মুসলমান—খ্রিস্টান]

জনসংখ্যা

এই জেলায় জনসংখ্যা কখনো সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে কালেক্টর মি. ডগলাসের একটি হিসাব অনুসারে সংযুক্ত ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৯,৩৮,৭১২ জন। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩,০৭,১৪৪; এবং স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ৩,১০,৬০৮ জন। এবং পুরুষ-শিশুদের সংখ্যা ১,৭৫,৭৫২ ও স্ত্রী-শিশুদের সংখ্যা ১,৪৫,২০৮ জন। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কেবল এই জেলার জনসংখ্যা হিসাব করেন ৫,১২,৩৮৫। অন্যদিকে, ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেটের দাবোসান্দের সরকারি বিবরণ অনুযায়ী ঢাকা শহরের অধিবাসীসহ জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪,০৩,৬০৯ জন। নিঃসন্দেহে, পরবর্তী এই হিসাবে প্রকৃত জনসংখ্যা অপেক্ষা কম দেখানো হয়েছে এবং সম্ভবত এ দুটোর মধ্যে পূর্বোক্তটি হচ্ছে বর্তমান সময়ের অধিবাসীগণের প্রায় নিকটতম সংখ্যা। ম্যাজিস্ট্রেট মি. থাণ্টের সহায়তায় আমি ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এ জেলার আদমশুমারি শুরু করি, কিন্তু আমি আমার কার্যস্থল পরিত্যাগের পূর্বে মাত্র ২৫টি গ্রামের বিবরণ পেয়েছিলাম। আমি উল্লেখ করতে পারি যে, এই ২৫টি গ্রামে বাড়ির সংখ্যা ছিল ৮৩৩ এবং জনসংখ্যা ছিল ৫,১৫২। ফলে, গৃহপ্রতি লোকসংখ্যার অনুপাত ছিল $৬ \frac{১}{২}$ । অত্যন্ত জনবহুল থানাগুলোর একটিতে এই গণনা কর্ম পরিচালনা করায়, এর অনুপাত এত বেশি উচ্চ ছিল যে, এটাকে একটি গড় হিসেবে সাধারণভাবে সমগ্র জেলার জন্য গ্রহণ করা যায় না। একই সময়ে পরিচালিত শহরের অন্য একটি আদমশুমারি অনুসারে, গৃহপ্রতি লোকসংখ্যার অনুপাত তিনের অধিক ছিল না। অতএব, $৪ \frac{১}{২}$ গড় অনুমান করে এবং ১৮২৪ সনে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাড়ির সংখ্যা ১,০২,৪৭৭ হিসাব করে, জেলার মোট জনসংখ্যা হয় ৪,৬১,১৪৬ জন।

ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা

শহরতলির হস্তশিল্প কার্য একবার শহরের লোকসংখ্যা নির্ধারণেছিল ৬০,৬১৭; যথা,

	হিন্দু	মুসলমান
পুরুষ	১৫,৭৩৫	১৫,৮৭৭
স্ত্রী	১২,৪১৯	১৬,৭৭৬
	২৮,১৫৪	৩২,৬৫৩

এই জনসংখ্যার মধ্যে ১৭,৮৭৫ জনের বয়স ছিল ১৫ বছরের নিম্ন। শহরতলির হস্তশিল্পকার্যে জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৭,৬৮১।

এক বছরে বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

জন্মসংখ্যা	বিবাহ	জন্ম	মৃত্যু
৬০,৬১৭	৩৭০	৬২৮	৫৪১

এই পক্ষ থেকে অনুমান করা গেছে যে, শহরের বার্ষিক মৃত্যুর অনুপাত হচ্ছে প্রতি ১,১০০ জন প্রায় একজন। এমন পক্ষ শহরের ইউরোপীয় অধিবাসীদের লোকসংখ্যা কোনরূপে পক্ষ না হওয়ায়, নির্ভর্য নার-ভাগিকাতলা থেকে তাদের মধ্যে মৃত্যুর সঠিক কোন অনুপাতই নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রোস্টেটান্ট মর্নিংস্টার ৪৫০টি বন্দর আছে, এক এই সমাধিস্থি অস্তিত্বকে ১১৪ বছরের পুরোনো। সেক্ষেত্রে ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দের তারিখকৃত একটি মৃত্যুসৌধ বিদ্যমান আছে। এটা হচ্ছে বছরে চারটি বন্দ অস্ত্রোপক্ৰিয় অনুষ্ঠানের হয়। কিন্তু যেহেতু ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ঢাকায় খ্রিষ্টান অধিবাসীদের সংখ্যা বেশ পরিমাণে উল্লিখিত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায় নি, সেহেতু আমরা অনুমান করতে পারি যে, বিগত ৭০ বছরের অনুপাত উপরিউক্ত হয় অপেক্ষা বেশ কিছু উর্দ্ধ ছিল। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনাল হুসগাতালে উল্লিখিত সংখ্যা করে মৃত্যুর অনুপাত নির্ধারণ প্রতি ৩৮.২৪ জনে একজন ; এতে শতকরা অনুপাত হয় ২.৬০। ১৮৩৯ সাল হি. হুজিরাতের পক্ষ অনুসারে জেলার কার্যদিগের মধ্যে মৃত্যুর হয় অপেক্ষা এই অনুপাত অর্ধেক। ৫ বছরের জন্য তাদের মধ্যে মৃত্যুর সাধারণ হয় ছিল শতকরা ৪.৬৫। ১৮০১ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত উক্ত সালসহ তাওয়ালা রোমান ক্যাথলিক নির্ভর্য তারিখকৃত বিবাহ, খ্রিষ্টধর্ম দীক্ষা গ্রহণ ও অস্ত্রোপক্ৰিয় বা সমাধিস্থ করার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

অওয়াস

নির্ভর্য

গ্রেট লোকসংখ্যার সেটাবুটি হিসাব	বিবাহ	খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ	অস্ত্রোপক্ৰিয়া অনুষ্ঠানাদি
৫,০০০	১০৮	৩,২০৮	২,৭১৮

शानानाम

१००० (१०००) १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १०००
 १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १०००

[illegible]

हिन्दु नष्टदाय

জেলার দক্ষিণাংশে এই সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য্য নথ্যে দেখি। হুন্দ হুন্দ এই বর্গ
একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে, আদিম বন দেহতে সোমন দে, সোমন বড় দুক
সম্প্রদায় নিম্বকর্ণের পেশার নিয়োজিত এক তাঁর অস্তিত্ব কিছু ঘোঁর অন্ধার উল্লেখ
করাতে অক্ষর, শুকন তিনি তাগদ্যকে বিকল্পে য়েব নির্দিষ্ট করুন হে পশ্চিমবঙ্গ
প্রদেশের কলীচ শহর য়েব পঞ্চদশ শিক্ত দুকপার তাঁর দাড়া হুন্দ হুন্দ হুন্দ

ଆଦିଶୂର କଟକ ଆସନ୍ତି କନୌଷ୍ଠେର ବ୍ରାହ୍ମଣ

সাহিত্য, কাশ্যপ, বাসপ, চক্ৰবৰ্ত্তী ও নুৰু নামেৰে চাৰিজন তামেৰ পুৰ সন্তান ও পৰিচালক
পৰিচালনাসমূহ এই জেলায় আগমন কৰেছিলেন বুলি জনা যায়। এনেৰে সৰ্বমুঠ বহুটি
৫৯। কটকটলো গ্রাম ও চুবুৰী বাহাৰ বিচিৰি অংশ তামেৰ চৰণশাৰীৰে জনে বিক্ৰি
কৰা হৈছিল। তদনুসাৰে পৰবৰ্তীকালে তামেৰ বংশধৰসকল তামেৰ জেলাৰ নামানুসাৰে পৰিচিহ্ন
হয়ে চিহ্ন চিহ্ন বৰ্ণে বিস্তৃত হয়ে যান। অনুষ্ঠি অনুসাৰে কাল সেনেৰ বংশধৰ বৰ্ণনামেৰ
উত্তরাধিকাৰী হৈছিল একে এই কাল সেনাই নিম্বৰ্ণেৰে হাৰে বৰ্তমানৰ যে শ্ৰেণীবিভাজন
বিদ্যমান, তা সপন্ন কৰে যান।

ভাষ্যসংগ্ৰহ প্রণী

ব্রাহ্মণদেরকে তিনি রাজী, বরেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এসব শ্রেণীর
একমোটটিকে তিনি পুনরায় কুলীন ও শ্রেণীর এ দুইটি আলাদা করণে বিভক্ত করেন। অতঃপর

দ্বিতীয়টি বা বরেন্দ্র শ্রেণীকেও তিনি কুলীন ও কাশ্যপ এ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। রাঢ়ী কুলীন বা দেশের এ অঞ্চলের অভিজাত ব্রাহ্মণগণ আদিতে কনৌজ ব্রাহ্মণদের বাইশ পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল। এটি আবার কুলীন ও গাঁও-কুলীন পদবি দ্বারা বিভক্ত হয়ে দুটো পৃথক শ্রেণীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে সাঁইত্রিশটি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত শ্রোত্রীয়গণ সাধু, সুসিদ্ধ ও দূরী ইত্যাদি চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একজন রাঢ়ী কুলীন তার কৌলিন্য না হারিয়েই চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। এসব স্ত্রীর অন্তত একজনকে অবশ্যই শ্রোত্রীয়ের কন্যা হতে হয়, কিন্তু অন্যান্যের ক্ষেত্রে তিনি তার নিজ গোত্রের কুলীন কন্যাদের মধ্য থেকে বাছাই করতে পারতেন। এই সংখ্যার অধিক যদি কেউ বিয়ে করেন তা হলে তিনি তাঁর বিশুদ্ধ কৌলিন্য থেকে বঞ্চিত হন এবং “সুকৃত-ভঙ্গ” বা ভাঙাবর্ণ কুলীনে পরিণত হন। এরা আরো ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আরো বর্ণচ্যুতি না ঘটিয়ে, সেই সমস্ত লোকদের অনির্দিষ্টসংখ্যক কন্যা বিয়ে করতে পারেন—যারা তার মতোই তাদের কিংবা তাদের বংশধরদের কৌলিন্য হারিয়েছেন। বল্লাল সেনের সময় থেকে একে অন্যের সঙ্গে কিংবা উচ্চতর বর্ণে অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে পরবর্তীদের বা ‘সুকৃত-ভঙ্গ’ কুলীনদের বংশধরগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর। এঁরা বর্তমানে “বংশজ” নামে অভিহিত হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। অনুরূপভাবে বর্তমানের রাঢ়ী কুলীন সম্প্রদায়ও যথাক্রমে কুলীন, শ্রোত্রীয় ও বংশজ এই তিন শ্রেণী নিয়ে গঠিত। একইভাবে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও কুলীন, কাশ্যপ ও বংশজ এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একজন কুলীন যখন বংশজের কন্যা বিয়ে করেন, তখন তিনি তাঁর বর্তমান স্ত্রীদের সংখ্যার অনুপাতে পণের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি তিনি তাঁর প্রথম বংশজ স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সময়ে ১,৫০০ টাকা পণ পান, তা হলে সম্ভবত তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সময় পাবেন ১,৪০০ টাকা। এই টাকার পরিমাণ ৪০ থেকে ৩০ টাকায় নেমে না আসা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি পরবর্তী বিয়েতে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। তিনি মনে করেন যে, একজন বংশজ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণপূর্বক তিনি তাঁকে উচ্চ সম্মান প্রদান করে থাকেন; সুতরাং তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব তাঁর শ্বশুরের ওপর ছেড়ে দেন। এ ধরনের বৈবাহিক সম্বন্ধের দ্বারা একমাত্র আর্থিক দায়িত্ব—যা একজন কুলীন পালন করে থাকেন তা হচ্ছে তাঁর কন্যাদের জন্য বিয়ের বন্দোবস্ত করা। একমাত্র পুরুষ শিশু সন্তানই পিতার কৌলিন্য লাভ করে থাকে। অতএব, বিয়ের ব্যাপারে শ্রোত্রীয় ও বংশজ যুবকদের প্রলুব্ধ করার মতো অর্থসম্পদ অবশ্যই কন্যাদের থাকতে হয়। কুলীনদের মধ্যে অবশ্য খুব কম ব্যক্তিই আছেন যারা কন্যাদের বিয়েতে যৌতুক দেবার মতো ধনসম্পদের অধিকারী। এর ফলে বংশজ স্ত্রীদের গর্ভজাত কুলীন কন্যাদের বেশিরভাগই নিঃসঙ্গ বা অবিবাহিতা থেকে যায়।

এ জেলার অধিকাংশ কুলীনই ‘সুকৃত-ভঙ্গ’ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, এবং এদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের মাত্র ৫০ জন পর্যন্ত স্ত্রী রয়েছে। যে সকল জেলায় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেশি সেই সকল স্থান অপেক্ষা এখানে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন কিছুটা কম। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, এই জেলাতে ঘটকের সংখ্যাধিক্য। ঘটকের সংখ্যাধিক্যের দরুন, বিয়েতে বিরাট খরচপত্রের প্রয়োজন পড়ে। এইসব ঘটকের সকলেই কুলীনের বিয়ে-শাদির সময়ে প্রদত্ত দর্শনী লাভের অধিকারী। এরা মূলগোত্র নামে অভিহিত কুলজী বা বংশ বিবরণের একটি তালিকা সংরক্ষণ করে থাকেন। এতে এই দেশের প্রত্যেক কুলীন পরিবারের বংশ-বিবরণ বল্লাল সেনের সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। এ কারণেই

বিয়ে-শাদির চুক্তিপত্র করার পূর্বে উভয়পক্ষ তাদের নিকট থেকে সর্বদা পরামর্শ নিয়ে থাকেন। ঘটকদের প্রায় সকলেই বংশজ ব্রাহ্মণ। বিয়ে-শাদি তালিকাভুক্ত করা ছাড়া এরা আর কোনো পেশা অবলম্বন করেন না। এদের ৭৫০টিরও অধিক পরিবার বিক্রমপুরে বিদ্যমান আছে। ছোট ছোট সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা প্রধান হওয়া সত্ত্বেও, একমাত্র এরাই এসব তালিকাসমূহ সংরক্ষণ করে থাকেন এবং গোত্রপ্রধানদের সকলেই বিবাহের সময়ে পারিতোষিক দাবি করে থাকেন। এরা কুলীনের বিবাহ উৎসবে খুব কমই অনুপস্থিত থাকেন এবং কষ্ট করে হলেও তাতে যোগদান করেন। ঘটক একজন বিশুদ্ধ কুলীনের নিকট থেকে তাঁর বিয়ের দু বছরের মধ্যে ইচ্ছেমত যে কোনো সময়ে উপস্থিত হয়ে পারিতোষিক আদায় করতে পারেন। কিন্তু কেবল সুকৃত-ভঙ্গ কুলীনের ক্ষেত্রেই তিনি বিবাহ-উৎসবে বকশিশ দাবি করতে পারেন। একজন পণ্ডিত ঘটকের সম্পত্তি অনুসারে সর্বদা দানের পরিমাণ নিরূপিত হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রথমে কনৌজ ব্রাহ্মণদের পঞ্চগোত্রের পুরোহিত বা বেদ-পাঠক ছিলেন। কনৌজীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই এরা এই জেলায় আগমন করেছিলেন। বাংলার আদি ব্রাহ্মণগণ তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালনে তাঁদের অজ্ঞতার দরুন, আদিশূর কর্তৃক নির্বাসিত হন। কথিত আছে, বৈদিকগণও অনুরূপ কারণে বল্লাল সেন কর্তৃক কুলীন, শ্রোত্রীয় ৫ ক্যাশ্যপ গোত্র থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদেরকে বল্লাল সেনই উল্লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে যান। সাধারণত ঘটকগণ কর্তৃক বিবৃত এই হচ্ছে তাদের ইতিহাস। কিন্তু বৈদিকগণ নিজেরা জোরেশোরে বল্লাল সেনের বর্ণবিন্যাসের অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন এবং তাদের স্বগোত্রীয়দের ওপর আরোপিত পদবির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বিক্রমপুরে বৈদিকদের সংখ্যা প্রচুর। প্রধানত এরাই পণ্ডিত ও জ্যোতিষী। একই গোত্রভুক্ত হওয়ার দরুন, বর্ণের রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি দ্বারা তারা অপেক্ষাকৃত কম আবদ্ধ এবং তাদের কন্যা-সন্তানদের বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা তাদের অপেক্ষা কম ভাগ্যবান রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ওপর আরোপিত আর্থিক বাধা-নিষেধগুলোর নির্দিষ্ট গতির অধীন নন।

দেশের আদি বা নির্বাসিত ব্রাহ্মণগণ ৭০০ ঘর বা পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত ছিলেন বলে ‘সাত-শতী’ নামে অভিহিত হতেন। নির্বাসনের পর এদের অধিকাংশই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিকে গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, কিন্তু অনেকে আবার প্রদেশের সর্বত্র ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েন। বল্লাল সেনের পরবর্তী সময়ে এরা রাঢ়ী কুলীনদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের পুত্র সন্তানদের বিবাহ দেন। ত্রিপুরা, সিলেট ও ময়মনসিংহে এখনো তাঁদের বেশ কিছুসংখ্যক লোক বিদ্যমান আছে এবং আমার বিশ্বাস, প্রদেশের প্রত্যেক বড় গ্রামে তাঁদের একটি বা দুটি পরিবারের সন্ধান মেলে। এ জেলায় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সংখ্যা খুব কম।

বৈদ্য শ্রেণী

ব্রাহ্মণদের পরেই বৈদ্য শ্রেণীর স্থান। যারা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন এবং শূদ্রদের সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক

বা আত্মীয়তা বর্জন করে চলেন। এদের থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে বলে কথিত আছে। সম্ভবত এই সম্প্রদায় তাদের উচ্চতর মর্যাদার জন্য বল্লাল সেনের নিকট ঋণী, যিনি নিজে এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং যিনি অন্য বর্ণগুলোর পুনর্বিন্যাস করার সময়, স্থায়ী বর্ণকে হিন্দু সমাজের শ্রেণীগুলোর মধ্যে বর্তমান পদমর্যাদায় উন্নীত করে যান। ঢাকা প্রদেশের দেওয়ান ও সহকারী নায়েব রাজা রাজবল্লভ প্রায় ১০০ বছর পূর্বে এই সম্প্রদায়ের জন্য পৈতাদান অনুষ্ঠানের অধিকার অর্জন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজনগরে তার গৃহে নদীয়া ও বেনারসের প্রায় সকল বিদ্বান ও প্রভাবশালী পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন এবং এ উপলক্ষে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ব্যয় করেন। অবশ্য কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের পৈতার তিন গুচ্ছ সুতার বদলে, বৈদ্যদের পৈতা মাত্র দু গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। বৈদ্যগণ এ জেলায় হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থাশালী সমাজ। তারাই প্রধানত তালুকদার, দেওয়ান ও চিকিৎসাবিদ।

কায়স্থ সম্প্রদায়

কায়স্থ শ্রেণীকে এখানে শূদ্রদের বংশোদ্ভূত বলে গণ্য করা হয়, যদিও তারা নিজেদের জন্য উচ্চতর বংশ মর্যাদা দাবি করেন। ব্রাহ্মণদের ন্যায়, এরাও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং কুলীন, মুলী ও ভট্টাচার্য ইত্যাদি নামে পরিচিত। রাঢ়ীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক এদেরও ঘটক রয়েছে, যারা বংশ বিবরণ বা ঠিকুজীর তালিকা সংরক্ষণ করেন। এঁদের অর্থাৎ বৈদ্য শ্রেণীর অধিকাংশই এটর্নি, উকিল, লেখক, হিসাবরক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে এবং শহরের বিভিন্ন আদালতে জমিদারগণ কর্তৃক কর্মে নিয়োজিত আছেন। ভট্টাচার্য বা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় লোকেরা স্থানীয় পরিবারগুলোতে পাচক, চাকর ইত্যাদি রূপে কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছে এবং অনেকে ময়রা ও শহরে চাল, লবণ ও ঘি প্রভৃতি দ্রব্যের খুচরা বিক্রেতা হিসেবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

শূদ্র

শূদ্রগণ নয়টি বিশুদ্ধবর্ণ বা বল্লাল সেনের নবশাখ নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে তাঁতি বা বয়নশিল্পীর সংখ্যা এ জেলায় প্রচুর। এরা ঝাপানিয়া ও ছোটভাগিয়া নামে দু ভাগে বিভক্ত। এরা একে অন্যের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া কিংবা কোনো রকম বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না। পূর্বোক্তদের বিয়ের মিছিলে পালকির পরিবর্তে ঝাঁপা বা এক প্রকার আসনে করে কনেকে বহন করার অদ্ভুত প্রথা থেকে তাদের এই পদবির উদ্ভব হয়েছে। শহরে ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এদের সংখ্যা অনেক। পরবর্তী বা ছোটভাগিয়া সম্প্রদায় প্রথমে কায়স্থ ছিল এবং তত্ত্বাবায়ের পেশা অবলম্বন করার দরুন, তারা কায়স্থ সম্প্রদায় কর্তৃক গোত্র থেকে বহিস্কৃত হয়। সমগ্র জেলায় এরা ছড়িয়ে আছে এবং শহরে তাদের মোট গৃহের সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে নয়।

শাঁখারী

শাঁখারী বা শঙ্খের কাজে নিযুক্ত লোকেরা সম্পদের দিক থেকে তাঁতিদের পরেই স্থান পায়। এরা সকলে একই বাজারে দু'ধারে বসবাস করে; সেখানে তারা শহর পত্তনের সময়েই বসতি স্থাপন করেছিল। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্মঠ জাতি, এবং অত্যন্ত ধনী হওয়ার মতো

শুণ তাদের আছে, কিন্তু তারা মাত্ৰাতিরিক্ত কৃপণ। স্থানীয় সাধারণ লোকদের চেয়ে তাদের বেশিরভাগই অপেক্ষাকৃত অধিক সুন্দর চেহারার অধিকারী। এদের কোনো কোনো পরিবারে কিছুসংখ্যক আলবেনীয় অধিবাসী বসবাস করে।

কামার

কামার বা লোহার কারিগররা শহরের কর্মকারদের মধ্যে একটি সংখ্যাবহুল শ্রেণী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই স্বর্ণকার ও রৌপ্যকাররূপে কার্যরত। বঙ্গাল সেনার সময়ে এদেশে বিক্রমপুরেই সর্বপ্রথম ধাতু সর্মিশ্রণ শিল্পের সূচনা হয় বলে কথিত আছে। ভালো কারিগর হিসেবে ঢাকার কাঁসারী ও তাম্রকারগণের বিশেষ খ্যাতি আছে এবং ছোট ছোট বাঙ্গালপেটরা ও হুঁকাদও তৈরির কাজে তারা বেশ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে। এদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী।

কুমার

কুম্ভকারগণ শহরতলিতে তাদের ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে। সেখানে তারা হস্তচালিত যন্ত্রে খেলনা ও মাটির দ্রব্যাদি নির্মাণ করে। খোটা-কুমার নামে অভিহিত পশ্চিম দেশীয় লোকেরা ঢাকার সাহায্যে রান্নাবান্নার বাসনকোসন তৈরি করে। আর যে সমস্ত কারিগররা পুতুল ইত্যাদি বানায় তারা কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। এরা সাধারণত অন্যান্য কুম্ভকার কর্তৃক অর্জিত অর্থের প্রায় তিন শুণ বেশি উপার্জন করে থাকে।

সদগোপ গোয়ালী

সদগোপ গোয়ালীরা শহরে সংখ্যায় প্রচুর। তারা গ্রামের প্রজাদের কাছ থেকে দুধ ক্রয় করে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গাইগরুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। আহির গোয়ালী নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সংখ্যা দেশের এ অঞ্চলে খুব বেশি নয়। এই শ্রেণীর অল্প কিছুসংখ্যক লোক, যারা শহরে বসবাস করে, তারা দেশওয়ালী গাইগরু পালন করে থাকে। এর থেকে তারা ঘৃত ইত্যাদি বিক্রয় করে। এই গোত্রের কিছু লোক আবার গরুর চিকিৎসক হিসেবে মাঝে মাঝে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহ ভ্রমণ করে। এরা সাধারণত শীত ঋতুর শুরুতে বের হয়ে পড়ে। রায়তদের গরু-মহিষাদির মচকানি, ঘা ও বাতরোগ ইত্যাদি উপশমের জন্য তাদের চিকিৎসাকার্যের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। এদের অবলম্বিত প্রধান প্রতিকারমূলক পদ্ধতি হচ্ছে আকুপাঙ্কচার (acupuncture) বা ক্ষতস্থানে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে পোড়ানো।

মালাকার

মালাকার শ্রেণী সাধারণত মালী, এবং বিয়ের শোভাযাত্রার জন্য মুকুট, মালা ও কৃত্রিম পুষ্প প্রস্তুতকারী লোকদের নিয়ে গঠিত। শেখোস্তরা আতশবাজিও তৈরি করে। সাধারণত এই জাতীয় প্রচুর কাজ হাতে থাকলে মুসলমান বাজিকরগণও নিজেদের সাহায্যার্থে এদের নিয়োগ করে থাকে। বিয়ের সাজসজ্জা প্রস্তুতকরণের ব্যবসা মালাকারদের কয়েকটি পরিবারের হাতে একচেটিয়া। এরা স্বরগাভীত কাল থেকে এ শহরে বসবাস করে আসছে। এদের দ্বারা শহরটি কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত এবং এই একই ব্যবসায়ে নিয়োজিত অনধিকার

প্রবেশকারী ব্যক্তিদের বহিষ্করণের নিমিত্ত এসকল জায়গায় তারা তাদের নিজেদের পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে থাকে।

নাপিত সম্প্রদায়

নাপিত শ্রেণীর প্রায় সকলেই ত্রিপুরা জেলা থেকে এসে থাকে, এবং শল্য চিকিৎসক ও ক্ষৌরকর্মকারীরূপে তাদের ব্যবসাকার্য চালায়। নয়টি বিশুদ্ধ গোত্রের শেষোক্ত বামীগোত্রের ব্যবসায় অনধিকার প্রবেশ করে পান ও সুপারির চাষাবাদ করে এবং খুচরা বিক্রেতা হিসেবে ব্যবসা চালায়। নানান ধরনের পেশা ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত অসংখ্য লোক অবিশুদ্ধরূপে গণ্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরা এ জেলার হিন্দু-মুসলমান শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ।

গণক বা আচার্য ব্রাহ্মণ

গণক বা আচার্যরা (Assagee) হচ্ছে অধঃপতিত ব্রাহ্মণ। এরা প্রতিমা নির্মাণ এবং এর চিত্রাঙ্কন বা সজ্জিতকরণের কাজে নিযুক্ত আছে। এরা বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক প্রস্তুত পঞ্জিকাদি নকল করে। তারা জ্যোতিষী ও ভাগ্য গণনাকারী। চুরি উদ্ঘাটনের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এদের দক্ষতার বিশেষ চাহিদা আছে। এরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে দিয়ে চাল চিবিয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে বাধ্য করে থাকে।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ

শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে প্রদত্ত প্রথম দান গ্রহণকারীদেরকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত করা হয়। এদেরকে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক অবিশুদ্ধ ও অধঃপতিত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই জেলায় বসবাসকারী কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ শবদাহকার্যে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানপূর্বক তাদের জীবিকা অর্জন করে। সাধারণত এদেরকে দান করা জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, কাপড়, ছোট এক টুকরা স্বর্ণ বা রৌপ্য ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল দান গ্রহণের পূর্বে, এদেরকে মৃতের প্রতি উৎসর্গীকৃত সিদ্ধ “চাল পাতরাণের” কিছুটা অংশ গ্রহণ করতে হয়।

সুবর্ণ বণিক

সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় শহরের অধিকাংশ পোদ্দার, এবং যারা বিলেতি দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য দোকানপাট চালায় তাদের নিয়ে গঠিত। এরা কাপড়, মূল্যবান পাথর ইত্যাদির ব্যবসায় নিয়োজিত আছে।

সৌন্দুক বা সাউলোক

সৌন্দুক বা সাউলোকগণ দু ভাগে বিভক্ত। যথা, বরেন্দ্র সাউ ও রাঢ়ী সাউ। বরেন্দ্র সাউরা খাদ্যশস্য, লবণ, চিনি, সুপারি ইত্যাদির ব্যবসা করে এবং গ্রামাঞ্চলে দোকান চালায়; অন্যদিকে, রাঢ়ী সাউরা হচ্ছে মাদকদ্রব্যের চোলাইকারী। এদের কেউ কেউ বেশ ধনী এবং প্রতিবেশী অঞ্চলে এদের জমিদারি আছে।

কাপালিক সম্প্রদায়

কাপালিকগণ চট্টের কাপড় বোনে এবং দড়ি, পাকানো সুতা ও থলে ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। এদের অনেকে আবার গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হিসেবেও কাজ করে।

পাটিয়াল

পাটিয়াল শীতলপাটি বা সুন্দর মাদুর তৈরি করে থাকে। স্থানীয় লোকেরা এসব পাটের ওপব শোয়। পুরুষ ও রমণী উভয়েই পাটি তৈরির কাজে নিযুক্ত থাকে।

পাটনী

পাটনীরা হচ্ছে খেয়ানৌকার মাঝি। যখন খেয়াঘাটে তাদের কাজ বন্ধ থাকে তখন এরা বুড়ি বা চুপড়ি ইত্যাদি বানায় এবং গ্রাম্য হাটে মাছ ক্রয়-বিক্রয়ের কাজেও নিযুক্ত থাকে।

কৈবর্ত

কৈবর্তগণ দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, চাষা কৈবর্ত অর্থাৎ চাষী লোক এবং জেলে কৈবর্ত বা জেলে। জেলেরা দেশের এ অঞ্চলে সবচেয়ে ভালো মাঝি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

তাম্বলী সম্প্রদায়

‘তাম্বলী’ পদবি এই শ্রেণীর নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও তারা শুধু পান-সুপারি বিক্রির মাধোই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বরেন্দ্র সাউদের ন্যায় তেপান্তির ব্যবসা অনুসরণ করে এবং শহরে তৈল, খাদ্যশস্য, লবণ ইত্যাদি বহু জিনিসের ব্যবসাসে নিযুক্ত থাকে।

গন্ধ বণিক

গন্ধ বণিক বা নানাবিধ মসলাদ্রব্য ও ঔষধপত্রের খুচরা বিক্রতাপণেব বসতি প্রধানত শহরাঞ্চলে। ধোপী বা ধোপা সম্প্রদায় সোনারগাঁও ও ডেমবা শহরে বসবাস করে এবং সেখানকার বণিকদের মসলিন বস্ত্রাদি ধোয়ার কাজে নিযুক্ত থাকে। গ্রামাঞ্চলে ধোপারা অপেক্ষাকৃত ধনী দেশীয় পরিবারগুলোর দ্বারা ধোয়ার কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। বাদ্যশাস্যে এবং নগদ অর্থে এদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কোম্পানি কর্তৃক এদেশে ব্যবসা আরম্ভ করার প্রাক্কালে, এই শ্রেণীর মধ্যে বার্ষিক প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। তৎকালে ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত এদের কিছুসংখ্যক পরিবার এখনো শহরাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ-সম্পদের অধিকারী। সুতার বা সুতার মিল্লিদের সংখ্যাও প্রচুর। এরা প্রধানত পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে কাঠ কাটা, করাত দিয়ে কাঠ চেরাই, নৌকাদি নির্মাণ ও লাঙ্গল তৈরির কাজে নিযুক্ত থাকে।

ডোম ও অন্যান্য সম্প্রদায়

ডোম বা শবদাহকারীরা সাধারণত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারা শূকর পালন করে, বুড়ি ইত্যাদি তৈরি করে এবং এদেরকে কুকুর মারার কাজেও নিয়োগ করা হয়ে থাকে। গ্রাম

তৈমল্লই সন্ধ্যা চামড়ার কাজে নিযুক্ত চামার এক ভুঁইয়ালী বা ঝাড়ুদার শ্রেণী। পূর্বোক্ত সম্প্রদায় চামড়া প্রস্তুত করে (অর্থাৎ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে) এবং ছুতা, হাতের মাছ, ঢাক ও সুতা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত ধনুকের তার ইত্যাদি বনায় এ ছুতা, বিবাহ ও অন্যান্য শোভাযাত্রায় এর বাদ্যকরের কাজ করে। অন্যদিকে ভুঁইয়ালী শ্রেণীর প্রায় সকলেই শহরঞ্চলে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহৃত থাকে। দেশের এ অংশে চণ্ডালের অস্তিত্ব শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যায় অনেক।

চণ্ডাল

জৈন উচ্চ বিজ্ঞানের ভাষ্যেচ ও অন্যান্য এস্টেটে রায়তদের বেশ বড় একটা অংশ চণ্ডাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অনুপ্রপত্তাবে, এই জেলায় ও শহরে এদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বালকটী, লোক, মল্লী, মবি-মল্লা, পাল্কি ও ডুলীর বেহারা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নানতর নিয়োজিত আছে।

যোগী সম্প্রদায়

এ জেলায় ও মহম্মদসিরাহ যোগীরা আর একটি সংখ্যাবহুল সম্প্রদায়। অন্য সব নিম্ন শ্রেণীর ন্যায় তাদেরও বিবাহ অনুষ্ঠান এবং পূজা পার্বণ ইত্যাদি উদ্‌যাপনের নিষিদ্ধ নিজস্ব ব্রাহ্মণ রয়েছে; কিন্তু সকল ব্রাহ্ম-উপসকলের প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ একটা কাজ তারা করে এবং তা হচ্ছে মড় শব্দের পরিবর্তে তার মৃতদেহ কবর দেয়। গোলাকার করে কবর খোঁড়া হয় এবং এর মধ্যে বসার ভঙ্গিতে মৃতদেহ স্থাপন করে। অতঃপর এর সম্মুখ একত্রে একটি ক্ষুদ্র পানির কলস, একটি ইঁকা ও চটাই রেখে দেয়। এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিরাট অজ্ঞতার অঙ্কুরে চপা পড়ে রয়েছে। জনশ্রুতি এই যে, এরা হচ্ছে কোনো এক মন্যাসীর বংশধর যিনি দীর্ঘকাল কৃষ্ণসুধন এবং বিচ্ছেদের পর এ ধরনের জীবন পদ্ধতিতে ক্লান্ত হয়ে তার বেশ ভেঙে ফেলেন, এবং তার পরিবার-পরিজনদের নিকট ফিরে আসেন। তিস্তাজীবী যোগীপণ্ডিত তাদের মৃতদেহ কবর দেয়, কিন্তু তারা এই একই অনুষ্ঠানাদি পালন করে কি না সে সম্পর্কে আমি অবহিত নই। অবশিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজন প্রথমে পাল রাজাদের পুরোহিত ছিলেন বলে ড. হ্যামিল্টন ধারণা করেন। এ সকল রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত বর্তমানের যোগীদের দুটো স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ই পূর্বে একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং বনিয় রাজাদের সম্মুখ একত্রে দেশের এ অংশে বসতি স্থাপন করেছিল।

বহুলানেশ্বর সর্বত্র যোগীদের সাক্ষাৎ মেনে, কিন্তু গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত জৈনস্তল্লাতাই তাদের সংখ্যা প্রচুর। এরা সকলেই তাঁতি, এবং নারী-পুরুষ সবাই তাঁতের কল্ল কর থাকে। তার সাধারণ ধামা মোটা কাপড়চোপড় তৈরি করে, এবং খইয়ের পরিবর্তে তার সিঁহতাতের মাড় ব্যবহার করে, এবং সে কারণে অন্যান্য তাঁতির নিকট তারা মনোহরিষ্ঠ অবিস্তৃত ছাতিরাপে গণ্য হয়।

পাকুড়ী

পাকুড়ী নামে অল্পত এক শ্রেণীর লোক এ জেলায় বাস করে। তারা ভোঁদড়, শুক ও কুমির ইত্যাদি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। প্রথমোক্তটি মাঝা হয় চামড়ার জন্য এবং শেষোক্ত দুটো তৈলের জন্য—যা তারা সিঁহ করে বের করে আনে, এবং ঔষধিরূপে বিক্রি

করে। তাদের একমাত্র ব্যবহৃত অস্ত্র 'চাঁচ' নামের এক প্রকার কুদ্র বর্ম; এ নিয়ে তর কয়েক শ গজ দূরের কোনে ক্যুদও সঠিকভাবে অঘত হনাত পড়ে। এই অস্ত্র ব্যবহারে তাদের দক্ষতার জন্য নরীপক্ষে তাকাতলে নিকট তর বৃষ্টিমান বর্টিবিকসরণ এবং আগের দিনে বর্ণিকর তাদের নৌকায় এই ত্রুটির কটিপে লোক হুড় অধন কলকাতার পথে যাত্রা করতে সাহসী হত ন।

বাদিয়া বা বেদে সম্প্রদায়

যার একটি নিম্ন ও অল্প সম্প্রদায়ের লোক হচ্ছে বেদে। বেদে এ অঞ্চলে তাদের সর্ব প্রচুর। তারা হিন্দু কি মুসলমান তা নির্ণয় করা কঠিন। কেননা বহুত তাদের ধর্মীয় হত দেশের যে যে অঞ্চলে তারা বসত করেছে, সেই সেই প্রকৃষ্ণ প্রচলিত ধর্মোতের সত্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবানে এদের একটা ঠাট্টাযোগ্য অংশ পঞ্চদশের অনুদ্বীপ নিচলে পরিচয় দেয়, এবং গাফড়ীনের ন্যায় নরীর দেবতা "বনরে" পূজ করে। বেদের সব বহু পানির উপরে বসবাস করে, এবং সাধারণত সম্ভবত্বতাবে হাট ব ন নৌকায় এক একটা বহরে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রা অন্সায়, রাত্রিবেলা ফেসব নৌকা লল থেকে সরে পড়ে, কিংবা নৌকায় বহর হোক নূর নেছর করে, পুনরায় দলে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে জরিমানা নিতে হয়। বেদের নানন ধরনে কলাকৌশল আয়ত্ত করে থাকে। তারা খুব দক্ষ চুবুরি, এক প্রযন্ত শীত নৌকায় পরিচর পানিতে মাই ধরার কাছে ব্যাপ্ত থাকে। তাদের পাওয়া হোট হোট মুতা নিয়ে তর নক ও কানের জন্য অলংকার তৈরি করে থাকে; এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে গৃহস্থলীর কাছে ব্যবহৃত হয়; এমন কয়েকটি দ্রব্য; যেমন, শব্ব ইত্যাদি তারা বাজারে বিক্রি করে। এরা পুঁতির মালা, খুব অল্প মূল্যের মতি, তুঁতিনা ও চিনের আর্চি, বাঘ-নকরের তৈরি পল্লব হার ইত্যাদি বিক্রি করে। এগুলো দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীসমূহ তাদের ছেলমেয়েদের সজ্জাত তালবাসে। এ ছাড়া, তার ওষুধপত্র, ক্লাচ, মরিচ প্রভৃতি মসলা এবং তাঁতিনের দুন্টের সুতাগুলো পৃথক করার কাছে ব্যবহৃত 'হাল্লা' বা বাঁশের তৈরি চিকুনি ইত্যাদিও প্রস্তুত করে থাকে। এরা শিঙা নাগিয়ে রক্তচাষণ বা কপির-পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে যন্ত্রাণি ব্যবহার করে, তা হচ্ছে চামড়া ছিদ্র করার জন্য কংকিন মাইর ধরনের নাঁত, এবং গরুর শিঙের অঘতগ য নিয়ে চুমুক দিয়ে তারা রক্ত শুষে আনে। বেদেরা শিকারে ও গাধিমারায় দক্ষ, এবং পালক সম্ভ্রহের জন্য কঁদ পেতে ও নানান উপায়ে গাধি শিকার করে।

বেদেরের ভেলকিবাঙ্গি

এরা জনসাধারণকে ভেলকির কলাকৌশল, কিকির-কুন্দি, তজুক ও বানর নাচ দেখিয়ে আনন্দ দিয়ে থাকে। এভাবে যখন তারা জীবিকা উপার্জনে অক্ষম হয় তখন তারা সাধারণত চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে। অন্যান্য দেশে তাদের সমপ্রদায়ী ব্রাতবর্গের নাম, তারা আংশিকভাবে মোরগ-মুরগি ইত্যাদি পালার পক্ষপাতী এবং তাদের নৌকাগুলোতে সাধারণত হাঁস, মোরগ-মুরগি, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত থাকে। তারা সাধারণত সব ক্রম পতপাখির মাংস খায় এবং গাভা ও কোফলবিশিষ্ট উষ মদের প্রতি এরা অতিমাত্রায় আগ্রহ; কলে তাদেরকে অত্যন্ত অল্প একটি জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। স্বাধ নিবন্ধিত

(বাঘ হত্যাকারী) এবং ইদুরের গর্ভে লুক্কায়িত খাদ্যশস্যের অব্বেষণকারী বাইদাগণ উভয়েই বেদে শ্রেণীর অন্তর্গত।

কোচ ও রাজবংশী

জেলায় উত্তর ভাগের অরণ্যক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর উপজাতি বাস করে এবং এরা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ প্রকৃতিতে যে কোনো সম্প্রদায় থেকে বহুল পরিমাণে পৃথক। এদের চোয়াল উচু, মুখ চ্যাপটা এবং মঙ্গোলীয় প্রজাতির ন্যায় চোখের পাতা সংকীর্ণ ও তির্যক। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানদের তুলনায় এরা অনেক বেশি শক্ত ও অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু জাতি। এরা কোচ ও রাজবংশী নামে পরিচিত। রংপুর ও আসামের এই একই নামের উপজাতিদের মতো একই উৎস থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এরা এ জেলার উত্তরাঞ্চলের আদিম অধিবাসী। দেশের এ অংশে এরা প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের জনসংখ্যার শেষ চিহ্ন বা অবশিষ্টাংশ। উক্ত রাজ্য বুড়িগঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। দিনাজপুরের কোচ ও রাজবংশীদের কথা বলতে গিয়ে ড. বি. হ্যামিলটন উল্লেখ করেন যে, সেখানকার কিংবদন্তি অনুসারে, তারা হচ্ছে জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং এরা রাজা পরশুরামের অত্যাচার থেকে চীনে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পান ও “নর” নামে অভিহিত তাদের রাজপুত্রেরা ভগবান শিবের বংশধর বলে ভান করেন। এই জেলার কোচ উপজাতি রংপুরে “পানিকোচ” নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। এরা দরিদ্র ও অজ্ঞ জাতি। তারা তাদের নিজস্ব ইতিহাসের কিছুই জানে না, কিংবা তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত কোনো ঐতিহ্যও তাদের নেই। ভাওয়াল, কাশিমপুর ও আটিয়ার অরণ্যের অভ্যন্তরে এবং মধুপুর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তারা বাস করে। দেশের এ অংশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সত্ত্বেও, তারা উন্নত স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী এবং পৃতিগন্ধময় দূষিত বাষ্প ইত্যাদিতে জেলার একই অংশে বসবাসকারী প্রতিবেশীদের চেয়ে অনেক কম ভোগে। তারা কুঠার ও লম্বা বাঁটওয়ালা কোদালের সাহায্যে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে, এবং ধান, তৈলবীজ ও তুলার চাষাবাদ করে থাকে। তারা কাঠ-কয়লা বানায় ও হরিণের শিং সংগ্রহ করে। এসব দ্রব্য তারা অরণ্যের কাছাকাছি সাপ্তাহিক হাটগুলোতে মাদকদ্রব্যের জন্য বিক্রয় অথবা বিনিময় করে থাকে। কোচেরা তাদের চাষের আওতায় আনা জমির জন্য খাজনা দিতে পরাজুখ, এবং এক্ষেত্রে অর্থদানের পরিবর্তে, বরং তারা প্রায়শই অকস্মাৎ তাদের কুঁড়েঘরগুলো পরিত্যাগ করে অরণ্যের অভ্যন্তরে চলে যায়; এবং সেখানে পুনরায় জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ শুরু করে দেয়। জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে থাকে; এবং এর পরিবর্তে কোচ ও রাজবংশীরা তাদের স্ব-স্ব জমিদার বা ভূমি মালিকদের প্রয়োজন পড়লে, তাঁদের বরকন্দাজ ও যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে। কোচরা সাধারণত কয়েকটি নির্জন কুঁড়েঘর নিয়ে গড়ে-ওঠা ছোট ছোট গ্রামে বাস করে। অনেক ক্ষেত্রেই ঘরগুলো একটা থেকে অন্যটা বেশ কিছু দূরে দূরে অবস্থিত।

তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি

এরা ভেড়া, ছাগল, হরিণ, শূকর ও মোষের মাংস খায় এবং মাদকদ্রব্য পান করে। এই পদ্ধতির জীবন যাপনের ফলে তারা বিস্তর দৈহিক শক্তি ও সাহসের অধিকারী হয়ে থাকে। কথিত আছে, এরা বল্লম নিয়ে পদব্রজে বন্য হাতি ও বাঘ ইত্যাদি শিকার করতেও দ্বিধা করে

না। এরা তাদের সকল রকম লেনদেনের ব্যাপারে নিতান্ত সৎ ও বিশ্বস্ত। সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সৎ গুণ তাদের রয়েছে, যা তাদের প্রতিবেশীগণের মধ্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে পুরোহিত কিংবা নাপিত কোনোটাই না থাকায়, এরা হিন্দুগণ কর্তৃক তাদের গোত্রভুক্ত নয় বলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

কিন্তু রাজবংশীরা যারা প্রাণিজ্ঞ খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকে, এবং সাধারণভাবে হিন্দু রীতিনীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণ করে, তারা হিন্দু সমাজবহির্ভূত নয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। অন্যেরা কোচ উপজাতি থেকে আকৃতি-প্রকৃতিতে খুব একটা স্বতন্ত্র নয়; এবং বাস্তবিক পক্ষে তারা নায়ক বা সর্দারের বংশধর হওয়ার কল্যাণে, একই বর্ণের উচ্চতর পদমর্যাদার অধিকারী মাত্র। এদের নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে।

এদের ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দ নিম্নে দেওয়া হল

মাধাই	সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর		
মিয়া	মানুষ	মিরাজ	চাল
হা	পৃথিবী	খিরি	কল্যা
চিরাজ	পানি	নিয়েকা	হলুদ
হনোয়ান	অগ্নি	কুম্ভ	নৌকা
মুচুক	হরিণ	শীল	লোহা
চুপ	সর্প	মাছিএ	ব্যাঘ্র
সা	মাছ	ওয়াক্	শূকর
গুম	নাক	জোক	হাত
নতুন	কান	চুনা	কাপড়
ডাম্বা	ইঁকা	নুক	ঘর
ওয়াই	সুপারি	ফক্স	একটি গাছ
জামচা	লঙ্কা	বাউম	বাড়াস

জেলায় উত্তর ভাগে এবং ময়মনসিংহের মধুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়ে বসবাসকারী কোচ ও রাজবংশীয়দের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে ৮,০০০।

উল্লিখিত শ্রেণীগুলো ছাড়াও, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত কিছুসংখ্যক বাস্তুত্যাগীর এখানে স্থায়ী উপনিবেশ আছে। দেড় শ বছরেরও অধিক কালব্যাপী পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের অধিবাসী প্রায় শতিনেক সড়ক-কুলি এখানে বসতি গেড়েছে। ভেঁজলীও এলাকায় কিছুসংখ্যক মণিপুরী অধিবাসী বসবাস করছে, এবং সেখানে তারা ইক্ষু ও শাকসবজির চাষাবাদ করে এবং মণিপুরী খাসবস্ত্র বয়ন করে। বীরভূম হতে আগত ডিন থেকে চার শত বনিয়া কুলি অত্র জেলায় নীলের কারখানাগুলোতে কার্যরত আছে। ধানান্তলোতে এবং জমিদারদের কার্বে নিয়োজিত বহুসংখ্যক বরকন্দাজ ও পিয়ন মূলত পশ্চিম প্রদেশসমূহের অধিবাসী।

কালী ও কৃষ্ণ উপাসকগণ

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে $\frac{1}{4}$ ভাগ এবং শূদ্রগণের মধ্যে সমস্ত কায়ার ও কামারী সম্প্রদায় কালীর উপাসক; এবং বাকি অষ্টমাংশ, সমগ্র ভাঁতি সম্প্রদায়, শোখারীদের অর্ধাংশ

ও সৌন্দুকদের (Sounoidikus) $\frac{9}{8}$ ভাগ লোক বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ উপাসক। শহরে তিনজন গৌসাই আছেন, যাদের চতুর্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে সুদূর আসাম ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রচুরসংখ্যক শিষ্য আছে। এদের নিকট থেকে গৌসাইরা বার্ষিক চাঁদা আদায় করে থাকেন। এখানে প্রায় শ'তিনেক বৈরাগী আছে। এরা সকলে আখড়া বা সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে বসবাস করে থাকে এবং এসব আশ্রম গৌসাইদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ধর্মসম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বে দীক্ষালাভের সময় একজন বৈরাগী প্রায় এক টাকা আট আনা প্রদান করে থাকে। এবং গৌসাই কর্তৃক আরোপিত জরিমানা প্রদানে সে বাধ্য থাকে। এ ছাড়া, বৈরাগীর মৃত্যুকালে তার যা কিছু সম্পত্তি থাকে তার সবটাই গৌসাই উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়ে থাকে।

প্রধান বৈষ্ণব উৎসব

এখানকার প্রধান বৈষ্ণব উৎসব আগস্ট মাসে কৃষ্ণের জন্মের পরবর্তী দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে, তাঁতি সম্প্রদায় ‘লক্ষ্মী-নারায়ণ’ ও ‘মুরলীমোহন’ নামে অভিহিত দুটো দেবমূর্তির সম্মানার্থে দুটো শোভাযাত্রা বের করে। প্রথমটি হচ্ছে গন্ধক নদী থেকে আনা শালগ্রাম বা শিলা; এটি একজন অবস্থাশালী তাঁতি কর্তৃক প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে পূজার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্তটি হচ্ছে একটি কৃষ্ণমূর্তি, যা বেশ কিছু পরবর্তী সময়ে ঐ একই পেশার জনৈক ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সকল শোভাযাত্রায় রঙিন কাগজ, চটকদার উজ্জ্বল বস্ত্র ও কৃত্রিম পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত ও বহনযোগ্য মঞ্চোপরি সমাসীন বালকেরা কৃষ্ণ ও তদীয় পরিবারবর্গের রূপ ধারণ করে। হস্তী ও অশ্বশ্রেণীসহ গান-বাজনাসহকারে এইসব মঞ্চ নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করা হয়ে থাকে; এবং রাত্রিবেলা আতশবাজি পোড়ানো হয়। স্থানীয় লোকদের নিকট এ এক বিরাট আনন্দ উৎসব; এবং এ উপলক্ষে চতুর্পার্শ্বস্থ সকল এলাকা থেকে এরা বিপুল সংখ্যায় শহরে এসে ভিড় জমায়। আগের দিনে তাঁতি সম্প্রদায় যখন বর্তমান সময়ের চেয়ে অধিক অবস্থাপন্ন ছিল, তখন এই ধরনের শোভাযাত্রাগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ খরচ হত এবং শতাধিক মঞ্চ শোভাযাত্রায় শোভা পেত। আর একটি বিরাট হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হয় সোনারগাঁও পরগনায় ব্রহ্মপুত্র নদের (নদীর পুরাতন শাখার) তীরে। নদীতে স্নানার্থী হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে। উৎসবটি মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং আট কি দশ দিন পর্যন্ত চলে। শহরের হিন্দুদের ধর্মকর্মের স্থানগুলো হল ৫২টি আখড়া, ৫৫টি কালীবাড়ি ও ১২টি স্নানঘাট। চাকেশ্বরী দুর্গা মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল ১৮, এবং যারা যজ্ঞমানী অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

মুসলমান সম্প্রদায়

এক হিসাব অনুযায়ী জেলার হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান সমান। কিন্তু শহরে মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে অধিক। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে শহরতলির গ্রামগুলো বাদে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬০,৬১৭। এর মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৪,৩০৯ জন বেশি ছিল। মুসলমান কর্তৃক এদেশ বিজয়ের সময় থেকে, তারা পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে প্রচুর সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছিল বলে প্রতীয়মান হয় এবং প্রথম দিকে তারা মেঘনার মোহনার অদূরে জনপদে বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রধান অংশে পরিণত হয়। ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সীজার ফ্রেডারিক উল্লেখ করেন যে, “সন্দ্বীপের অধিবাসীরা

মূ'র জাতি।" পুরকাসের ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক সগ্রহে বর্ণিত হয়েছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদে "উপকূলের সন্নিকটবর্তী অধিবাসীগণ" প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। তারা প্রায় সকলেই শেখ। সৈয়দ, মুঘল ও পাঠানগণ ছিলেন মোট জনসংখ্যার নগণ্য অংশ। পাঠানরা অবশ্য, পূর্বকালে এ জেলায় সংখ্যাবহুল ছিলেন। ডেমরার নিকটে পাঠানটুলী গ্রামে এখনো তাদের সামান্য কিছু বংশধরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সেখানে তারা পূর্বকালের শাসকগণ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সনদের বলে কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী।

কতিপয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাদের পেশা ও চাকরি অনুসারে তারা পৃথক সামাজিক শ্রেণীর রূপ ধারণ করেছে; এবং এরা একে অন্যের সঙ্গে বিয়ে-শাদি ও খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের মতো বর্জন নীতি গ্রহণ করে চলে। এদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, প্রথম—কসাই, বা মাংস বিক্রেতা, যারা তাদের ভবাই করা পণ্ড অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। দ্বিতীয়—কলু, বা তিল ও সরিষার তৈল উৎপাদনকারী। তৃতীয়—জোলা বা গ্রাম্য মোটা বস্ত্র প্রস্তুতকারী তাঁতি। চতুর্থ—মালী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে মহররম ও বেড়া উৎসবকালে এবং বিয়ের শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত কৃত্রিম পুষ্প ও সাজসজ্জার প্রস্তুতকারী ও মালীগণ। পঞ্চম—জেলে বা সেইসব ব্যক্তি যারা মাছ ধরে থাকে। ষষ্ঠ—বিলদার বা গোরখন্দকারী, বা সড়ক নির্মাণকারী, কবর খননকারী, মৃতদেহ বহনকারী প্রভৃতি। সপ্তম—দড়িয়াগণ, কুকুর রক্ষক, ভুঁইমালী, ঘটক ও জলৌকা প্রয়োগকারী চিকিৎসক সম্প্রদায় ও অন্যান্য। অষ্টম—মৃশকারিয়া, বা পাখি মারা ব্যাধ সম্প্রদায়। নবম—দাই বা ধাত্রীগণ। শহরে এই পেশা অবলম্বনকারিণী স্ত্রীলোকেরা মহলদারনীগণের নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। মহলদারনীগণ তাদের কগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দেয় বলে তাদের উপার্জিত অর্থের একাংশও তারা পাওয়ার অধিকারী হয়।

এই পৌরবিধি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং প্রথমাবস্থায় পুলিশের কর্তৃত্বাধীন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। মহলদারনীদেবকে কর্তৃপক্ষের নিকট অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম ও শিশুহত্যার ঘটনাগুলো রিপোর্ট করতে হত। এরা মেয়েমহলে প্রবেশ করা ও অনুসন্ধান কার্য চালানো এবং যে সমস্ত মহিলারা তাদের বংশ মর্যাদার প্রেক্ষিতে বিধিনিষেধের জন্য উন্মুক্ত আদালতে আসতে অপারগ, সেসব মেয়েকে সাক্ষ্য গ্রহণে সাহায্য করা, ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হত। অনুরূপ কার্যের জন্য এখনো শহরের ম্যাজিস্ট্রেটদের এদের থেকে সাহায্য লাভের প্রয়োজন পড়ে।

হাজাম। ধোপা। মাহিফরাস। বেহারা। সাপুড়িয়া। বাজিকর।

দশম—হাজাম বা নাপিতগণ। একাদশ—ধোপা। দ্বাদশ—মাহিফরাস বা মাছ বিক্রেতাগণ। মুঘল সরকারের আমলে শহরের মাছ বিক্রয় ব্যবসা এই শ্রেণীর হাতে একচেটিয়া ছিল, এবং এখনো এই ব্যবসা প্রধানত তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ—বেহারা বা ডুলি বাহক। চতুর্দশ—সাপুড়িয়া বা যারা সাপ ধরে। পঞ্চদশ—বাজিকর, বা তেলকিবাজ ও দড়িনৃত্যকারীগণ।

পীর ও কতিপয় ফকির

শহরের সন্নিহিতে বিরাট সম্মানিত পবিত্র দুজন পীরলোক, এবং বেশ কিছুসংখ্যক ফকির আছেন। এসব ফকিরের কেউ কেউ মাঝে মাঝে মুহররম ও রমজানের উৎসবের প্রাকালে মন্দির নিচু নিম্নেদেরকে কবরস্থ করে তাঁদের ধর্মীয় আবেগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে কবরের আকারে একটি গর্ত খোঁড়া হয়; এবং কৃচ্ছসাধনের প্রাকালে নেহায়েত জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে করে ভক্তলোক উক্ত কবরে নেমে পড়েন। কেবল বাতাস প্রবেশের জন্য সামান্য একটুখানি ছিদ্রের ব্যবস্থা রেখে, অতঃপর এই কবরগুহা বাঁশ, মাদুর ও মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফকির এ অবস্থায় সেখানে অবস্থান করেন।

মহররম অনুষ্ঠান

মহররমের অনুষ্ঠানটি ইসাইনী দালানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি একটি বৃহৎ দালান এবং সেখানে একসঙ্গে বহু লোকের স্থান সংকুলান সম্ভব। ‘আত্তরা’ বা প্রথম দশ দিন রোজার প্রকালে এর অভ্যন্তরভাগ কৃত্রিম পুষ্পরাজি, স্বচ্ছ দ্রব্যাদি—বিশেষত বস্ত্র, উটপাখির ডিম ইত্যাদি নিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। ইমাম হাসান ও হসেনের প্রতিকৃতি সংরক্ষিত স্থানের ঠিক উপরে দেয়ালগুলোতে কালো বস্ত্রের লাইন টানা থাকে। কক্ষের কেন্দ্রস্থলে একটি ঝরনা রয়েছে এবং রাত্রিকালে যখন এ কক্ষের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল গায়ক কর্তৃক ‘মর্শিয়া বার্নি’ বা মৃতের জন্য শোকগীতি ও উচ্চ প্রশংসাবাহী গীত হয়, তখন সমগ্র কক্ষটি প্রচুর প্রদীপ ও রঙিন মোমবাতির আলোকে আলোকিত থাকে; এবং এরা সারাটা রমজান মাসব্যাপী তাদের ‘সর-বেদারী’ বা রাত্রিকারীন জাগরণ অব্যাহত রাখে। প্রার্থনার ৭ম দিনে পুষ্পরাজি ও ভক্তদের বস্ত্রে সজ্জিত কাষ্ঠদণ্ডের ওপর স্থাপিত একখানি মুক্ত খোলা হাতের প্রতিকৃতি নিয়ে গান-বাদ্যসহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করা হয়। দশম তারিখে বা রোজার দশম দিনে তদ্বিষয়ে বা এ দুজন শহীদের প্রতিকৃতি বিরাট জাঁকজমক ও উৎসবসহকারে শহরের নিকটবর্তী একটি স্থানে বহন করে নেয়, এবং সেখানে এই প্রতিকৃতি সমাধিস্থ করা হয়। এই উৎসবের সময় লাল ও সবুজ বস্ত্রে সজ্জিত বালকগণ পানি বা শরবত পরিপূর্ণ চর্মনির্মিত পাত্র ও পতাকা বহন করে এবং শহরের এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এরা পথযাত্রীদের শরবত ও পানীয় বিলায়।

বেড়া উৎসব

বড়ো বিভিডের (পরগম্বর ইলিয়াস বলে অনুমান করা হয়) সম্মানার্থে বেড়া উৎসবটি বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। এ সময়ে এখানে নওয়ারাহ সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু একদিক থেকে বিচার করে দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে এই উৎসব বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে নুর্শিনাবাদ ও দেশের অন্যান্য শহর অপেক্ষা এখানে অপেক্ষাকৃত কম আড়ম্বর ও চাকচিক্যের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। এখানে ‘বদর’ নামীয় নদীর দেবতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপকভাবে পূজিত হয়ে থাকেন। প্রধানত মুসলমানদের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এটা বহুল প্রচলিত।

নদীর কূলে মোরগ-মুরগি জবাই করে, এবং ফলমূল ও পুষ্পাদি উৎসর্গ করে উক্ত দেবতার তৃপ্তিসাধন করা হয়, এবং এসকল উৎসর্গীকৃত দ্রব্য মৃৎপাত্র বা ফাঁপা করা কুমড়ার

খোলে রাখা হয় ও নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বন্দর পূজা, মেদন থেকে শুরু করে শুধু চট্টগ্রাম পর্যন্তই নয়, আমার বিশ্বাস সুদূর আরাকান পর্যন্তও বিস্তৃত।

মুসলমানদের এক নতুন সম্প্রদায়

বিগত দশ বছরের মধ্যে দেশের এ অংশে মুসলমানদের ভিতরে একটি নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, এবং এরা অসাধারণ ক্ষিত্রতার সঙ্গে এই জেলায় ও করিমপুর, বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে বিস্তার লাভ করেছে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শর্কিতুল্লাহ নামের জনৈক ব্যক্তি। এ লোক মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কায় হজ্জযাত্রা করেন। পুনর্বর্ত্তি তিনি হজ্জবৃত্ত পালন করেন ও ওহাবীদের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেন। দীর্ঘ বিশ বছরকাল অনুপস্থিত থাকার পর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বদেশ ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারে নিযুক্ত রয়েছেন, এবং ধারণা করা হয় যে, উপরিউক্ত স্থানসমূহের মুসলমান জনসংখ্যার ১/৫ ভাগ লোককে তিনি তাঁর শিষ্য পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। শহরে মুসলমান অধিবাসীগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই তাঁর শিষ্য বলে অনুমান করা হয়। এরা ফরায়েজী নামে অভিহিত এবং মৌলবিদের থেকে পৃথক।

ফরায়েজী নামে পরিচিত এই সম্প্রদায় পশ্চিমাংশের জেলাসমূহের মৌলবিদের থেকে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। অবশ্য মৌলবি আবদুল্লাহ বেশ কিছু শিষ্য^১ এখানেও বসতি স্থাপন করেছেন। তাঁরা কোরানের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং এর দ্বারা অনুমোদিত সকল অনুষ্ঠান বর্জন করে চলেছেন। মুহররম উৎসব যেভাবে হজ্জবৃত্ত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ কর্তৃক পালিত হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেন তা অর্থাৎ এ মাসের দশম তারিখ অপরিবর্তনীয়ভাবে রক্ষা করা হয়েছে। উক্ত তারিখটি আদম ও হাওয়ার পৃথিবীতে অবতরণ ও আরশ (নবম বা উর্ধ্বতম স্বর্গলোক) এবং কুরসির (অষ্টম বা স্ফটিকবৎ) স্বর্গসমূহ সৃষ্টির তারিখ হওয়াতে তারা এ দিনটিকে বিশেষভাবে পবিত্র স্থানে উদ্‌যাপন করে থাকেন।

ফরায়েজীগণের নীতি

তদনুসারে তাঁরা এই দিন ও পরবর্তী দিনে রোজা রাখেন, সারা রাত এবাদত করেন; গরিব-মিসকিন ব্যক্তিদের ভোজদান করেন এবং একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পুনর্মিলন সাধন করেন। তাঁরা পয়গম্বর কর্তৃক ন্যস্ত-করা কর্তব্য প্রশংসনীয়ভাবে পালন করে থাকেন। কিন্তু শহীদ হাসান হোসেনের আত্মোৎসর্গের স্মৃতি উৎসব যা এ সময়ে পালিত হয়ে থাকে তা তাঁদের নিকট শুধু নিষিদ্ধই নয়, এমনকি এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি দর্শন করা থেকেও তাঁরা দূরে থাকেন। তাঁরা পুঁতি, ছাতি ও চিল্লার আচার-অনুষ্ঠানও বর্জন করে চলেছেন। এসব অনুষ্ঠান শিশু-জন্মের চল্লিশ দিনের মধ্যে পালিত হয়ে থাকে। তাঁরা একমাত্র আকিকা উৎসব পালন করেন, এবং এতে পুরুষ শিশুর জন্য দুটো ছাগল ও কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এই সময়ে শিশুর মাথা কামানোর অনুষ্ঠান পালিত হয়, এবং পিতামাতার আর্থিক অবস্থানুসারে চুলের ওজনে স্বর্ণ বা রৌপ্য দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

১ মৌলবি আবদুল্লাহ মুরিদ করেন এবং তাতে শর্কিতুল্লাহ আগন্তি জানান।

বিয়ে-শাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি

একইভাবেই তাঁরা বিবাহ অনুষ্ঠানকেও এর নানা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বা লৌকিকতা থেকে মুক্ত করেছেন। এ উপলক্ষে নানাবিধ প্রথা-পদ্ধতি পালন করা হত; যেমন, “জাঁকজমকের সহিত বসে থাকা”, “হলুদ বহন করে নিয়ে যাওয়া ও লাগানো”, “বিয়ের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য পরিমাপ”, এবং “সব গসত্ শোভাযাত্রা” ইত্যাদি, সবকিছু নিষিদ্ধ করা হয়। একমাত্র অনুমোদিত আড়ম্বর বা জাঁকজমক হচ্ছে বর-কনেকে তাদের শাদি বা বিয়ের দিনে সাজানো। সাক্ষীগণের সম্মুখে উভয় পক্ষের স্বীকৃতিতে বিয়ে পড়ানো হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে গান-বাজনা ও নৃত্যগীত বর্জন করা হয়, এবং এতে একমাত্র খরচপত্র হচ্ছে তাদের বন্ধুবান্ধব ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য “আলেমা খানা” নামে পরিচিত ভোজন।

সংকার কার্যাবলি

তাঁদের সমাধি সংক্রান্ত সংকার কার্যাদি অনুরূপ সরলতার সঙ্গে পরিচালিত হয়ে থাকে। কবরে ফলমূল ও পুষ্পাদি অর্পণ এবং নানাবিধ ফাতেহাখানি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। তাঁদের কবর মাটির উপরিভাগে উচ্চ করে তোলা হয় না, কিংবা কোনো রকম ইট বা প্রস্তরনির্মিত সৌধ দ্বারা চিহ্নিত হয় না। ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ফরায়েজীরা তাঁদের অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতৃ অপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করে থাকেন; কিন্তু তাঁরা অসহিষ্ণু ও উৎপীড়নের পক্ষপাতী। তাঁদের প্রতিবেশীদের ধর্মীয় মতামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে গিয়ে প্রায়ই তাঁরা শহরে প্রকাশ্য স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁদের নেতা “হাজী শরীয়তুল্লাহ” এই উপলক্ষে একাধিকবার হাজতে ছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস খাজনা প্রদান বন্ধ করার অভিপ্রায়ে গ্রামাঞ্চলে তাঁর শিষ্যদের উত্তেজিত করার অভিযোগে বর্তমানেও তিনি পুলিশের নিষেধাজ্ঞাধীনে আছেন।

খ্রিস্টধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীগণ প্রায় সাড়ে তিন শ বছর ধরে দেশের এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন। ভারতমানস ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা শহরের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “এখানে আমরা বহু খ্রিস্টধর্মাবলম্বী বণিকদের দেখতে পাই, যারা সার্নান শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানান। তথাকার বিরাট বাণিজ্যবন্দরে তাঁরা পশমিবস্ত্র এবং আলোই কাঠ ও লেজার (Lazer) ইত্যাদি নিয়ে গমন করেন। লেজার (Lazer) থেকে এক ধরনের মিষ্টি আদাজাতীয় উৎপন্ন দ্রব্য ‘লেসার পিটিয়াম’ রূপে পরিচিত। এটা এক প্রকার সুগন্ধি-নির্যাস হওয়াতে একে সাধারণভাবে ‘বেলজুই’ (Belzoi) বলা হয়।”

চট্টগ্রামে বসতিস্থাপন ও পরবর্তীকালে শ্রীপুরে

এসব খ্রিস্টান লোকেরা সম্ভবত সিরীয় গির্জার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পর্তুগিজেরা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন নি। এই বছরে জন. ডি. সিলভেরা বাংলায় একটি কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে মালদ্বীপ থেকে চারটি জাহাজসহ আগমন করেন। সেখানে তিনি

শীতকাল অতিবাহিত করেন এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। এর অল্পকাল পরেই, তাঁদেরকে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়, এবং এর অল্প কয়েক বছর পরে তারা নিজেরা মেঘনার তীরবর্তী শ্রীপুরে বসতি স্থাপন করেন।

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নির্মিত তেজগাঁও গির্জা

ঢাকার সন্নিকটে তেজগাঁও-এর গির্জা ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সেন্ট অগাস্টাইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। কিন্তু ভারতের দক্ষিণ দিকে নেষ্টরীয় উপাসনালয়গুলোর সঙ্গে এই গির্জার সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রথমে তা ভারতমানস কর্তৃক উদ্ভিখিত খ্রিস্টীয় বণিকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং তা পরবর্তীকালে রোমান ক্যাথলিক মিশনারিগণ কর্তৃক কেবল সংস্কার সাধিত বা পুনর্নির্মিত হয়। পর্তুগিজগণ এখানে বসতিস্থাপন করে মেঘনার মোহনায় প্রধানত জলদান্যবৃদ্ধি দ্বারা জীবন যাপন করত বলে প্রতীয়মান হয়। শ্রীপুরের অধিবাসীরা প্রধানত পর্তুগিজ ছিল এবং ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যালফ ফিচ্ এদেরকে, “সম্রাট জালালউদ্দিন আকবরের বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহী বলে উল্লেখ করেছেন। এ স্থানে এত বেশি নদনদী ও দ্বীপ আছে যে, তারা এর একটা থেকে অন্যটায় পলায়ন করে; ফলে সম্রাটের অশ্বারোহী সৈন্যরা এদের বিরুদ্ধে অধিপত্য বিস্তার করতে পারে না।” পরবর্তীকালে প্রদেশের মুঘল শাসনকর্তাগণ তাদেরকে নান কার্যে নিয়োগ করেন। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে তাদের একদল ইব্রাহীম খানের সঙ্গে তাঁর রণতরীসমূহের গোলন্দাজ সৈন্য হিসেবে যোগদান করে। ইব্রাহীম খান যখন সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক রাজমহলে বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিল। আরো পরবর্তী সময়ে এদের বেশ কিছুসংখ্যক লোক আরাকান রাজ্যের চাকরি ত্যাগ করে চলে আসে এবং শায়েস্তা খান এদেরকে ফিরিঙ্গিবাজারে বসতি স্থাপন করার সুযোগ প্রদান করেন।

উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্তি

এই সময়ে তারা রণতরী ও গোলন্দাজ সৈন্যদের সেনাধক্ষ হিসেবে এবং গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী ও নওয়ানাহ্ বিভাগগুলো কারিগররূপে নিয়োগ লাভ করে। তাভার্নিয়ারের মতে তাদের বেশকিছু পরিমাণ লোক নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যদলে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। তারা ধোলাইখালের সন্নিকটে (Dullye creek) বসবাস করত এবং সেখানে তাদের একটি গির্জা ছিল। তাভার্নিয়ার এর নির্মাণরীতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন। এখানে একটি সেন্ট অগাস্টাইন মনাস্থি বা মঠও বিদ্যমান ছিল বলে থির্কিনাট উল্লেখ করেন। ঢাকা, ভাওয়াল ও হোসনাবাদে অবস্থিত তিনটি পর্তুগিজ গির্জার অধীনে খ্রিস্টানদের মোট সংখ্যা ছিল ১০,১৫০ জন।

ইংরেজদের প্রথম বসতি স্থাপন

ইংরেজগণ এখানে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বসতি স্থাপন করেন বলে মনে হয়। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাভার্নিয়ার কথা প্রসঙ্গে ইংরেজদের কারখানার উল্লেখ করেন এবং এর প্রধান কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করেন। এই সময়ে ইংল্যান্ডে প্রথম ভারতীয় মসলিন ব্য

আমদানি করা হয়। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের আগে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানির কর্মচারীদের সংখ্যা কখনো পাঁচজনের অধিক ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না।

বিনা শুদ্ধে ইংরেজদের বাণিজ্য করার অধিকার লাভ

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির প্রতিনিধিগণ সুলতান মহাম্মদ আজিমকে ২১,০০০ টাকা নজর প্রদান করেন, এবং এর ফলে তাঁরা বিনা শুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে। ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান উক্ত কারখানা বাজেয়াপ্ত করেন। ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এই নবাব বা তাঁর সহকারী বাহাদুর খান আওরঙ্গজেবের আদেশে বাংলায় অবস্থিত সমস্ত ইংরেজ সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেন এবং এখানকার কোম্পানির কর্মচারীদেরকে বন্দী করেন। ১৭৭৮ এবং ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এখানকার ইংরেজ অধিবাসীদের পেশা ও চাকরির একটি তুলনামূলক বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল :

১৭৭৮ ও ১৮৩৮ সনের ইংরেজ অধিবাসীগণের পেশা ও চাকরির অবস্থা

১৭৭৮

প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যবর্গ	৫
শুদ্ধ-কালেক্টর	১
দেওয়ানি আদালতের তত্ত্বাবধায়ক	১
সচিব	১
সহকারী সচিব	১
ফার্সি অনুবাদক	১
বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্থাপনের প্রধান	১
বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রধানের সহকারী	১
লবণ-প্রতিনিধি	১
সার্জন	১
সহকারী সার্জন	১
নিম্নপদস্থ কর্মচারী	১
বণিক	৪
এটর্নি	১
কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যবসায়ী ও লেখক	৫
পাইলট	১
সহকারী পাইলট	১
দরজি	১
ভৃত্য	২
বেকার লোক	৫

৩৭

রাজস্ব সংক্রান্ত মহাধ্যক্ষ বা কমিশনার	১	
সিভিল ও সেসন জজ	১	
ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর	১	
জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট	১	
ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী	১	
সদর আমিন	১	বেসামরিক
সহকারী কালেক্টর	১	
বেসামরিক কর্মচারী (বেকার)	১	
প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত	১	
সার্জন	১	
সহকারী সার্জন	১	
দেশীয় অশ্বারোহী বাহিনীর রেজিমেন্টের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার	১৩	
সৈনিকদের রসদ সরবরাহ দপ্তরের কর্মচারী	১	
কার্যনির্বাহক কর্মচারী	১	
গোলন্দাজ সেনাধ্যক্ষ	১	সামরিক
নন-কমিশনড অফিসার	৩	
ব্যাপটিষ্ট মিশনারি	১	
নীলকর ও বণিক	১৬	
	৪৭	

আর্মেনীয় ও গ্রিক অধিবাসী

শহরের প্রায় ৪০টি আর্মেনীয় ও ১২টি গ্রিক পরিবার আছে। আর্মেনীয়গণ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রাক্কালে এখানে বসতি স্থাপন করেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁদের অনেকে বস্ত্র, লবণ ও সুপারির ব্যাপক ব্যবসা চালিয়ে জমিদারির মালিক হয়েছিলেন; এর কিছু কিছু এখনো তাঁদের বংশধরগণের হাতে আছে। তাঁদের গির্জা ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। গ্রিকগণ আরো পরবর্তী সময়ে শহরে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। কলকাতার গ্রিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালেক্সিস আর-গীরী এখানে ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন, এবং বেশ কিছু সম্পত্তি রেখে যান। অতঃপর উক্ত সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তারা ঢাকা ও বাকেরগঞ্জে তাঁদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের গির্জা তৈরি হয়। মাউন্ট সিনাইয়ের মঠ বা সন্ন্যাস আশ্রমের অধীনস্থ জনৈক পুরোহিত এই গির্জার পুরোহিত হন। আর্মেনীয়দের ন্যায় গ্রিকরাও প্রধানত আন্তঃবাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল এবং এখনো তাদের কিছুসংখ্যক লোক নারায়ণগঞ্জে লবণের বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে।

১৮৩৮ সালে শহরে খ্রিস্টিয়ানদের মোট সংখ্যা

১৮৩৮ সালে ইংরেজ, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, পর্তুগিজ, আর্মেনীয় অধিবাসী, গ্রিক এবং ফরাসি ও ডাচদের বংশোদ্ভূত লোকজন প্রভৃতিদের সমন্বয়ে গঠিত খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০৪ জন।

নবম অধ্যায়

[চরিত্র—আচার-আচরণ—পোশাক-পরিচ্ছদ—রীতিনীতি—আমোদ-প্রমোদ—
শিক্ষা—মামলা-মকদ্দমা, অপরাধ ও এর বাস্তব কারণসমূহ]

বাংলার অধিবাসীগণের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা

বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের অধিবাসীগণ সাধারণভাবে তাদের স্বদেশীয় অন্যান্যের ন্যায় মধ্যমাকৃতি, পাতলা গড়ন ও দুর্বল দেহবিশিষ্ট। তারা কখনো সাহসিকতার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন না, বরং তাদেরকে ভীকু ও কাপুরুষরূপে অভিহিত করা হয়েছে। এক শ পঞ্চাশ বছরেরও উর্ধ্বকাল পূর্বে, হ্যামিলটন ঢাকার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন : “দেশটি জনবহুল, কিন্তু কোনো সাহসী লোকের জন্মদাত্রী সে নয়। কেননা, মাত্র পাঁচ-ছ’জন লোকই এদের এক হাজার ব্যক্তিকে তাড়িয়ে যেতে পারে।”

প্রকৃতিগতভাবে এরা অলস ও নিষ্কর্মা

অধিবাসীরা নিষ্কর্মা, শ্রমবিমুখ ও অলসতাপ্রবণ এবং খুব সামান্যই কষ্ট সহ্য করতে পারে। কিন্তু তারা খুব ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী এবং স্বাভাবিকভাবেই সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন। যে সমস্ত পেশায় শারীরিক শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয়—সেগুলো অপেক্ষা তারা সাধারণত শিল্পকলায় পারদর্শী—যাতে দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টা ও হস্তকৌশল প্রদর্শন দরকার হয়। সেজন্য তারা সুতা কাটায় পারদর্শী, ভালো তাঁতি, সুলেখক, সূক্ষ্ম সূচীকর্ম শিল্পী, রৌপ্য ও স্বর্ণকার এবং শাঁখারী ; কিন্তু তারা দ্বারবান, মুটে, গ্রহরী বা সৈনিক হিসেবে অনুল্লেখযোগ্য।

স্বভাবে নিরীহ ও শান্ত

একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে এরা শান্তশিষ্ট, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়, এবং শাসকদের প্রতি অনুরক্ত ও আনুগত্যের জন্য খ্যাত। কোম্পানির শাসনক্ষমতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত একটি মাত্র গণঅসন্তোষ প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়েছে ১৮১০ সালে। সেই সময় গৃহ-কর আরোপিত হওয়া উপলক্ষে শহরের নাগরিকগণ একত্র হয়ে কালেক্টরের নিকট তাঁদের দাবি-দাওয়া পেশ করে। অভিযোগসংবলিত আবেদনপত্রে স্থানীয়দের প্রায় ৯,০০০ গণ্যমান্য

গৃহকর্তা স্বাক্ষরদান করেন। এঁরা কেবল এই নিন্দনীয় কর রহিত করার জন্যই দরখাস্ত করে নি, বরং দলিলপত্রাদি লেখার কাজের ওপর আরোপিত কর বাতিল এবং নিম্নপদস্থ পদসমূহে প্রকৃত যোগ্যব্যক্তিদের নিয়োগের জন্যও আবেদন জানান। কাছারি অবরোধকারী সশস্ত্রবহু জনতার হাত থেকে কালেক্টর এই দরখাস্ত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে, তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভের ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রাস্তায় একদল সিপাহীর আগমনই এদের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য যথেষ্ট ছিল; ফলে জনতা পরের দিন দরখাস্ত পেশ করার নিমিত্ত প্রতিনিধি নিয়োগের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে অসাধুতা। এঁরা মামলাবাজ এবং ছোটখাটো ঝগড়া-ফ্যাসাদ ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা তাদের খুব বেশি। মামলা মকদ্দমা বিচারের সময় তারা ব্যাপকভাবে প্রবঞ্চনা ও ছলচাতুরির আশ্রয় নেয় ও সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তাদের এই স্বভাব সম্বন্ধে এ জেলার প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত প্রায় সকল সরকারি কর্মচারীই মন্তব্য করেছে। এদিক থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দেশের মধ্যে সবচেয়ে গোলযোগ সৃষ্টিকারী লোক বলে অখ্যাতি অর্জন করেছে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা বিরল। উভয় শ্রেণী সম্পূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করেছে যে, তারা একই ইঁকা থেকে ধূমপান পর্যন্ত করে থাকে। দেশের এ অংশের ব্রাহ্মণগণ বহুল পরিমাণে বর্ণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার জাল ছিন্ন করেছে, যা তাদেরকে পৌরোহিত্যের গতির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। বর্তমানে তারা প্রায়শই দেওয়ান, লেখক, উকিল ও অন্যান্য লোকায়ত বৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন। একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে উল্লিখিত লোকেরা শহরের নিম্নবর্ণের লোকদের থেকে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন না। এই গোত্রের যেসব ব্যক্তির প্রতি বাস্তবিক যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করা হয় তারা মন্দিরের প্রতিনিধিত্বকারী পুরোহিত সম্প্রদায় ও গোসাইগণ। এরা পার্শ্বিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তাদের শিষ্য; যেমন, তাঁতি, শাঁখারী এবং অন্যান্য কৃষ্ণ-পূজারী প্রভৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

হিন্দুদের সংগঠিত সমাজ বা সংঘগুলো “দল” নামে আখ্যায়িত

হিন্দুরা তাদের সামাজিক মেলামেশা কাজকর্মে ‘দল’ নামে আখ্যায়িত বিভিন্ন সমাজ বা সংঘে বিভক্ত। অনেক সময় একই বর্ণে একাধিক সমাজ বা সংঘ রয়েছে, এবং এমনকি, একই পরিবারের কয়েকজন সদস্যের বিভিন্ন দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও বিচিত্র নয়।

সমাজপতি

প্রত্যেকটি সমাজ একজন সভাপতি বা সমাজপতি কর্তৃক শাসিত—যিনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দলপতি নামে, তাঁতি, স্বর্ণকার, নরসুন্দর ও অন্যান্যের মধ্যে প্রামাণিকরূপে এবং তাকাল্লিদের মধ্যে মুকিয়া উপাধিতে পরিচিত। সদস্যবর্ণের কুঁদুলে স্বভাব থেকে এদের দলগুলো পুনরায় ‘দলাদলি’ নামে প্রসিদ্ধ বা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বিভিন্ন দলের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আতিথেয়তা বা ভোজানুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে। গোষ্ঠীগতভাবে নিজস্ব সম্প্রদায়ের নিয়মকানুন ও প্রথাপদ্ধতি লংঘনের বিষয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় এবং সঙ্গী-সহযোগীদের সামাজিক ও নৈতিক আচার-আচরণ তথা নানাবিধ কার্যকলাপের ওপর খবরদারি করে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে একই ধরনের সমাজ ও অন্যান্য বিষয়

মুসলমান শ্রেণীগুলো : যেমন রিফুগর বা রিফুগরী, মাহিফরাস বা মৎস্যবিক্রেতা প্রভৃতিদের মধ্যে কিছুটা একই ধরনের সমাজ বিদ্যমান। পূর্বোক্তদের মধ্যে সমাজপতির পদ বংশগত এবং এর বক্শিশ বা উপরিপাওনা হচ্ছে ভোজানুষ্ঠানসমূহে সবচেয়ে বিশিষ্ট মর্যাদা এবং দ্বিগুণ বরাদ্দ খাদ্য ও পানীয়। ভোজসভায়, শেষকৃত্যে কিংবা ধর্মীয় উৎসবে কোনো সদস্যের যোগদানের অঙ্গীকৃতির জন্য সমাজপতি বিধিবিধান লংঘনের দায়ে অপরাধী ব্যক্তিদের জরিমানা ধার্য করেন এবং ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করেন। মাহিফরাসদের সভাপতি শুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সব রকমের বিবাদের ফয়সালা করেন। তিনি প্রত্যহ সমাজের সদস্যদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করেন এবং তৎপরিবর্তে তিনি তাদের জন্য বছরের শেষে একটি ভোজ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুদের মধ্যে পরিবারের সদস্যবর্গ পিতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত একত্রে বসবাস করেন। অতঃপর কনিষ্ঠতম পুত্র তার মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে।

বিয়ে-শাদি

মেয়েদের বেলায় অত্যন্ত অল্প বয়সে তাদের বিয়ের বাগদান করা হয়। কুলীন ব্রাহ্মণ, বৈদিক ও ঝাপানী তাঁতিগণ ব্যতিরেকে, অন্য সকল বর্ণের মধ্যে বরের পিতা এ উপলক্ষে কনের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করেন। টাকার পরিমাণ ২০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাটিয়ালদের মধ্যে মাদুর তৈরির কাজে কনে কর্তৃক প্রদর্শিত নৈপুণ্যের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ নিরূপিত হয়ে থাকে এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বে কনের কাজের দক্ষতার ওপর টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এই শ্রেণী কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ ১০০ টাকা।

শ্রেণী অনুসারে খরচপত্রের তারতম্য

বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের খরচপত্রের বিরাট তারতম্য ঘটে থাকে; কিন্তু শহরের অধিক অবস্থাপন্ন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে এর পরিমাণ নিরূপণ করা যেতে পারে : যেমন, উচ্চশ্রেণীর জন্য ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ৪০০ থেকে ৮০০ টাকা, এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১০০ থেকে ২০০ টাকা। যে সকল ব্যক্তি তাঁদের পদমর্যাদা দ্বারা স্থিরীকৃত অর্থের পরিমাণ লংঘন করেন, তাঁরা অধিক সম্মানিত অধিবাসীগণের মধ্যে তাঁদের নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্যর্থ হন এবং এ উপলক্ষে তাঁদের আচরণ দলের সদস্যদের নিকট নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। অবশ্য এ অর্থের বেশিরভাগ অংশ রাত্রিকালীন শোভাযাত্রার সময় পথে পথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত এই ধরনের মিছিলে দেশীয় দুর্দশাগ্রস্ত, অর্ধাহারী, টাটু ঘোড়ার ওপর সমাসীন দামামা-বাদকদল ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত পতাকাবাহীদের একটি সারিসহ—বর বা কনের বন্ধুবান্ধব, বাদ্যকর, কৃত্রিম পুষ্পরাজি বহনকারী, রঙিন আলো এবং আতশবাজি ইত্যাদি বহু কিছু থাকে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণীগুলোর সর্বনিম্ন খরচে যে অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপিত হতে পারে তার পরিমাণ হচ্ছে দশ টাকা। যেমন—

একটি অনুষ্ঠানের সর্বনিম্ন হার

হিন্দু

			টাকা	আনা
ব্রাহ্মণ	...	...	১	০
বর ও কনের জন্য কাপড়চোপড়	...	..	২	০
শঙ্খ নির্মিত বালা	...	...	১	০
চিরুনি ও সিঁদুর	...	...	০	৪
অলঙ্কারাদি	...	...	১	০
বাদ্যকরগণ	...	...	০	৪
কনের মাথার চূড়া বা চাঁদি	...	...	১	০
ধোপা	...	...	০	৪
নাপিত	...	...	০	৪
ভোজ	...	...	২	০
বিবিধ	...	...	১	০
সর্বমোট			১০	০

মুসলমান

			টাকা	আনা
কাজী	...	...	০	৮
পোশাক-পরিচ্ছদ (বর-কনের)	...	...	৩	০
চিরুনি ও অন্যান্য	...	...	০	৪
চুড়ি বা বালা	...	...	০	৮
মাথার চুড়া বা চাঁদি	...	...	০	৮
নাপিত	...	...	০	৪
ভোজ	...	...	২	০
গান-বাজনা ও অন্যান্য খরচপত্র	...	...	৩	০
সর্বমোট			১০	০

কলকাতা অপেক্ষা এখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান অধিক অর্থব্যয়ে পরিচালিত হয় বলে কথিত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানাদিতে অপেক্ষাকৃত কম খরচ করা হয়। অত্যধিক সম্পদশালী শ্রেণীর মধ্যে শেষকৃত্যমূলক অনুষ্ঠানে যে-কোনো পরিমাণ বিপুল অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করার ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত খরচপত্র তুলনামূলকভাবে পরিমিত।

এই উপলক্ষে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিন্দু বা মুসলমানের খরচের নিম্নতম হার নিম্নে প্রদত্ত হল :

হিন্দু

		টাকা	আনা
শেষকৃত্য সংক্রান্ত বস্তাদি	...	০	৮
চিতাগ্নি তৈরির জন্য একজন ডোমকে দেয়...	...	০	৮
অগ্নিকাষ্ঠ	...	০	১২
সন্দাল, ঘি ও বাঁশ ইত্যাদি	...	০	৮

শ্রাদ্ধপর্ব

		টাকা	আনা
ব্রাহ্মণ	...	১	০
বস্ত্রদান	...	১	০
চাল ও ডাল	...	২	০
ব্রাহ্মণগণের জন্য ভোজানুষ্ঠান	...	১	০
পিতলের পাত্র ইত্যাদি	...	১	০
নাপিত	...	০	৮
ধোপা	...	০	৮
বিবিধ	...	০	৮
সর্বমোট		৯	০

মুসলমান

		টাকা	আনা
কবর খননকারী	...	০	১২
শবাধার, কাপড়, মাদুর, বাঁশ ইত্যাদি	...	১	০
মোল্লা	...	০	৮

চতুর্থ ফাতেহা পাঠকারী

		টাকা	আনা
মোল্লা	...	১	০
খাদ্য ইত্যাদি	...	০	৮
তাম্র থালা ও অন্যান্য	...	১	০
গরিবদের মধ্যে কড়ি বিতরণ	...	০	৮
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফাতেহা	...	২	৮
উপলক্ষে খরচ	...	২	৮
সর্বমোট		৭	০

নিতান্ত গরিব পরিবারের শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পালনের পক্ষে পরিবার যদি খুব গরিব হয়, তা হলে তারা অর্থদানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েক সের চাল, কিছু তৈলবীজ ও কড়ি বিতরণ করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে ভোমদেরকে কদাচিৎ নিয়োগ করা হয় এবং গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে যে সকল ব্যক্তি চিত্তার খরচ যোগাতে অক্ষম তারা মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেয়। মুসলমানদের কয়েকটি শ্রেণী যেমন : রিফুগর অন্যান্য কিছু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মৃতব্যক্তির জন্য উক্ত সমাজের সদস্যরাই কবর খনন করে এবং মৃতদেহ বহন করে। এটা তাদের এমন একটি কর্তব্য যা পালান্ধ্রমে তাদের সকলেই পালন করে থাকে। অত্যন্ত গরিব ধরনের লোকেরা কদাচিৎ ফাতেহা পাঠ করে এবং যারা কোনো পরিবার বা বন্ধুবান্ধব না রেখে মারা যায়, তাদের জন্য কখনো ফাতেহা পড়ানো হয় না। ফরায়েজীগণ বিবাহ ও শেষকৃত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে থাকেন। সুতরাং এ সকল পর্ব উপলক্ষে তাদের ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য—কেবল দানস্বরূপ কিছু অর্থই বিতরণ করা হয়।

হিন্দুদের মধ্যে কোনো ধাত্রীর ব্যবস্থা নেই

এখানে কোনো হিন্দু ধাত্রী নেই। যারা এ পেশায় কার্যরত, তারা সকলেই জাতিতে মুসলমান এবং শহরে বাস করে। সেখানে তারা মহলদারনীদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং একে অন্যের কাছে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করে বিশেষ বিশেষ এলাকায় তারা তাদের পেশায় কার্যরত থাকে। খুব কমসংখ্যক গ্রামেই ধাত্রী আছে। সেখানে ধাত্রীর কাজ সাধারণত একজন অভিজ্ঞ প্রতিবেশিনীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের স্থীলোককে তার কষ্ট স্বীকার করার দরুন একখানা কাপড় বা অনুরূপ কিছু উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

পারিশ্রমিকের পরিমাণ

নিম্নতম পারিশ্রমিক চার আনায় শহরের একজন ধাত্রীর সেবাকার্য পাওয়া যেতে পারে। পরিচর্যাকারিণীদের পানসুপারি ও তামাকের জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে ৪০ দিনের জ্বালানির জন্য অন্যান্য খরচপত্র বাবদ আরো ১২ আনাসহ মোট ব্যয় হয় মাত্র এক টাকা।

হিন্দুদের মধ্যে মায়েরাই স্তন্যদান করে

হিন্দুদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের লালনপালনের ক্ষেত্রে মায়েরাই সর্বদা নিজস্ব সন্তানসন্ততিদেরকে তাদের নিজেদের স্তন্যদান করে থাকেন, কিন্তু মুসলমান রমণীরা প্রায়শই এ কাজের জন্য নার্স বা শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত করে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে শিশুদেরকে আফিম খাওয়ানোর রীতি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। শিশুর অল্প কয়েকদিন মাত্র বয়স হলেই এটা শুরু হয় এবং সাধারণত চার বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আফিম খাওয়ানো অব্যাহত থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আফিম খাওয়ানো হয় যে, তা শিশুকে সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগার হাত থেকে রক্ষা করে। এ কারণে পীড়িত অবস্থায় রোগদমনের জন্য এটা আরো ঘন ঘন সেবন করানো হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ অভ্যাসটা মাঝেমধ্যে স্থানীয় নার্সদের দ্বারা ইউরোপীয় পরিবারে প্রবেশ করে।

আফিম সেবনই প্রায়শ শিশুমৃত্যুর কারণ

আমার বিশ্বাস, আফিম সেবনের মাত্রাধিক্যতা হেতু মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। বিগত আট মাসের মধ্যে আমি দশ মাসের কম বয়স্ক শিশুদের দুটো ঘটনা দেখেছি। এদের মৃত্যু এরূপ আকস্মিকভাবে আফিম সেবনের জন্যই হয়েছে। আমি একটি ইউরোপীয় পরিবারের অন্য একটি ঘটনার কথা জানি, যেখানে ঐ একই কারণে পিতামাতাই তাদের শিশুর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী।

অবস্থাশালী হিন্দুদের কথাবার্তা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি

অবস্থাশালী হিন্দুশ্রেণী তাদের কথাবার্তা বলার ধরনধারণে, লেখায় ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে কলকাতার লোকদের অনুসরণ করে থাকেন। গৌড় বা এতদঞ্চলীয় বাংলা ভাষার (এই ভাষা পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর অধিবাসীদের নিকট প্রায় সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য) স্থান এদেশের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত কলকাতার কথ্যভাষা দখল করেছে। এরা কলকাতায় তাদের হিন্দু স্বজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আমোদপ্রমোদ, অনুষ্ঠান ও অভ্যর্থনা ইত্যাদি জ্ঞাপনের রীতিনীতিও অনুসরণ করে থাকেন।

পরদা

দেশের এ অংশে হিন্দুদের মধ্যে রমণীদের পরদা পালনের ব্যাপারে খুব একটা নজর দেওয়া হয় না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এটা কঠোরভাবে পালন করা হয়। একমাত্র যারা নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত কেবল তারাই সদাসর্বদা প্রকাশ্যে চলাফেরা করে থাকে। এটা উল্লেখ্য যে, নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের কিছুসংখ্যক পুরুষদের ন্যায়ই কঠিন পরিশ্রমের কাজকর্ম করে থাকে। বিশেষত, কুটিয়াল শ্রেণীর রমণীগণ ধান ভানে, দালান নির্মাণ কাজের জন্য ইট ও অন্যান্য উপকরণ বহন করে। এ ছাড়া, যারা জেলে ও বেদে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তারাও নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা ইত্যাদির মতো দৈনিক শ্রমসাপেক্ষ কাজে নিয়োজিত থাকে।

পালঙ্কের ব্যবহার

শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মুসলমান রমণীগণ বস্ত্র-বোরখায় আবৃত হয়ে দুজন বাহক দ্বারা বাহিত ‘দুলী’ অথবা পালকিতে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাকেন। পালঙ্কের ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত নয় এবং বলদ কিংবা অশ্ব দ্বারা টানা গরু কিংবা ঘোড়ার গাড়ি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। এখানে কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে। জমিদারদের বেশিরভাগই হাতি পোষণ; কিন্তু এদের ভ্রমণের সাধারণ ব্যবস্থা হল জলপথ।

পোশাক-পরিচ্ছদ

এখানকার নিম্নশ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষেরা প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বসবাসকারী একই অবস্থার ব্যক্তিদের অপেক্ষা অধিক উন্নত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। এদের কমসংখ্যক ব্যক্তিকেই দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র বস্ত্র বা পরিচ্ছদ ব্যতিরেকে চলতে দেখা যায়। শহরে ছাড়া, চামড়ার জুতো খুব বেশি একটা পরিধান করা হয় না। গ্রামে কাঠের

জুতো বা খড়ম ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত একটি কাঠের বোতাম লাগিয়ে কিছুটা স্যাণ্ডেলের ন্যায় ব্যবহার করা হয়, অথবা পায়ের পাতা ও গোড়ালির চতুর্দিকে একটি ফিতা বাঁধা থাকে। এ কাজের জন্য মুসলমানগণ এক টুকরা চামড়ার পাতলা ফালি এবং হিন্দুরা শণ বা সুতার দড়ি ব্যবহার করে।

হিন্দু-মুসলমান রমণীদের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান

হিন্দু ও মুসলমান রমণীরা একই ধরনের বস্ত্র পরিধান করে। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে আঁচলের রঙে। হিন্দু রমণীরা পরে লালরঙা আঁচলের শাড়ি, আর মুসলমান মহিলারা পরিধান করে কালো আঁচলের শাড়ি। এখানকার হিন্দু রমণীগণ কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত সমগ্র হাত প্রায়ই শঙ্খ নির্মিত বালা পরিধান করে আবৃত করে ফেলে। এই সমস্ত অলঙ্কার ও রৌপ্যনির্মিত মল বা পাইজের প্রায়ই বেশি দামি হয় এবং বংশপরম্পরায় এক কন্যার থেকে আর এক কন্যার হাতে গিয়ে পড়ে। হাতের বালা এবং কপালের ওপর ডোরা-কাটা সিঁদুর হচ্ছে সধবার অর্থাৎ স্ত্রীর স্বামী জীবিত থাকার চিহ্ন। বিধবা ও অবিবাহিতা মেয়েদের এগুলো পরবার সুযোগ নেই। মুসলমান মেয়েরা শাঁখার পরিবর্তে লাক্ষা বা গালা, কাচ বা রৌপ্যনির্মিত বালা ব্যবহার করে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত অন্যান্য অলঙ্কার হচ্ছে চৌকা-কাচ বসানো হাতের আংটি, নাক ও কানের রিং, গলার হার, চুলের জন্য পিপা-স্নাকৃতির অলঙ্কারাদি—যাতে মাদুলি বা রক্ষাকবচ থাকে। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ছোট ছোট মুক্তা ইত্যাদি নির্মিত অলঙ্কার এবং গরিবদের মধ্যে টিন, পিতল, সীসা ও লুপ্তার মিশ্রিত দ্রব্যাদির দ্বারা তৈরি অলঙ্কারপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই পান ও তামাক ব্যবহারের প্রতি পুরোমাত্রায় আসক্ত। শহরের লোকেরা সাধারণত তামাক সেবন করে। কিন্তু গ্রামে স্ত্রীলোকেরা এটা পানের সঙ্গে চর্বণ করে থাকে।

প্রচলিত কুসংস্কার

সাধারণভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতিগুলো তাদের ধর্মের সঙ্গে এতই সংমিশ্রিত যে, এগুলোর যে কোনো রকম বর্ণনা হবে—তাদের অসংখ্য অবাস্তব কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানাদির বিরক্তিকর বিবরণ। এ রকম একটি কুসংস্কারের কথা অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে, যা বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বহুল প্রচলিত; এটা হল—শিলাবৃষ্টির হাত থেকে প্রজা কর্তৃক তাদের ফসল রক্ষার্থে লোক নিয়োগ। যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষমতার অধিকারী বলে ভান করে তাদেরকে ‘শিলারী’ নামে অভিহিত করা হয়। এই জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা ময়মনসিংহে এরকম গ্রাম খুব কমই আছে, যেখানে তাদের একজন লোক নেই। এরা প্রধানত যোগী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং নির্ধারিত মাসিক বেতন লাভ করে। এই বেতন নগদ টাকায় ও শস্যে এবং গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে সাধারণ বা পাইকারি হারে চাঁদা তুলে পরিশোধ করা হয়। খোলা মাঠে বছরে একবার সমবেত প্রজাসাধারণের উপস্থিতিতে শিলারী কর্তৃক পূজা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে একটি ছাগল ছানা, একটি বিড়াল ছানা, একটি মুরগি ও একটি শিং মাছ (সবগুলোই কালো রঙের) উৎসর্গ করা হয়। প্রথমটি জ্বাই করা হয়, কিন্তু বাদবাকিগুলো বিরাট একটি মাটির পাত্রের ভিতরে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়।

এই গায়েব ওপর ঐ একই আকার ও মাপের অন্য একটি পাত্র উলটো করে বসিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর সম্পূর্ণ বস্তুটার ওপর মাটি ফেলে ঢিপিতে পরিণত করা হয়। শিলাবৃষ্টি শুরু হলে, শিলারী তার কুঁড়েঘর থেকে উলঙ্গ অবস্থায় দ্রুতবেগে বের হয়ে আসে এবং কৃত্রিম পুষ্টি ওপর তার অবস্থান নেয়। এখানে সে তার বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে কুলানো মোহের শিলা বাজায়, গালাফলে পুনঃ পুনঃ মস্ত পাঠ করে এবং ত্রিশূল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে “ঝড়ের দৈত্য”-কে তার আবাসস্থলের দিকে ডাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভান করে। সকলের বিশ্বাস, জয়প্রিয়া পাহাড় ঝড়ের দৈত্যের বাসস্থান। শিলাবৃষ্টি স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে; অনেক সময় এক জমি থেকে অন্য জমি পর্যন্ত কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে শিলা পড়ে। এর ফলে মহাবলী ক্ষেত রক্ষা পেয়ে যায়। শিলারীগণ এসব অবস্থার সুযোগ নেয়, এবং শিলাকে পাণ্ডবতী গ্রামে গাঠিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের আছে বলে ভান করে থাকে। এভাবে যাদের জমি ক্ষেত পরপর তিন-চার বছর শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তারা তাদের নিরুচ্চ শিলারীকে একজন অতি মূল্যবান ব্যক্তিরূপে শ্রদ্ধা করে। ফলে সে একই কাজে নিয়োজিত অন্যান্য কম ভাগ্যবান শিলারী অপেক্ষা প্রায়শই দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি

উভয় পক্ষ কর্তৃক কাপড়ের নিচে একে অন্যের হাত স্পর্শ করে ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি বা “স্পর্শের অঙ্ক” বলে আখ্যায়িত রীতি প্রায়শই এইস্থানে, নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে অনুসৃত হয়। তাঁতি ও বণিকদেরও ‘তার’ (Tar) নামে কথিত তাদের নিজস্ব বাণিজ্যিক ভাষা আছে। এই ভাষায় অন্যান্য ব্যক্তির সম্মুখেই দরকষাকষি হয়ে থাকে। একজন হিন্দু বণিক যখন ব্যবসায় ফেল হয়, তখন সে মধ্যাহ্নে তার দরজায় একটি ঘি়ের প্রদীপ জ্বলে প্রকাশ্যে নিজের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা করে। আমার বিশ্বাস, সমগ্র ভারতে এই রীতি প্রচলিত। কিন্তু এখানকার দেউলিয়াপনার বিরল ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এ ধরনের প্রদর্শনী কদাচিৎ দেখা যায়। বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ ধরনের চারটির বেশি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না বলে জানা যায়।

আমোদ-প্রমোদ

এ দেশীয় প্রধান প্রধান আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে ঘুড়ি উড়ানো, বুলবুলির লড়াই, নাচগান, লীলা ও তাস খেলা ইত্যাদি। আগের দিনে নৌকা বিহার ছিল শহরের অত্যন্ত অবস্থানশালী শ্রেণীর লোকদের একটি প্রচলিত ও প্রিয় অবসর-বিনোদন ব্যবস্থা। সম্ভবত নবাবদের দ্বারা এর সূচনা হয়েছিল যাদের অনেকেই নৌকা বিহারে প্রচুর আমোদ লাভ করতেন। তাঁদের বিরাট বিরাট রাজকীয় প্রমোদতরী জাঁকালো করে সাজানো হত, এবং এসব তরীর অগ্রভাগের আকৃতি অনুসারে যেমন, ময়ূর থেকে “ময়ূরপঙ্খী”, মগর (হাক্কর) থেকে “মগর চেরা” ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নবাবদের অনুকরণে বণিক, তাঁতি ও রিকুণরগণ প্রমোদতরী রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং নানাবিধ সাদা পোশাকে সজ্জিত নাবিকদলসহ তাদের নৌকাগুলো শৌখিনভাবে সাজিয়ে তোলা হত। এ সময়ে চন্দ্রালোকে অনুষ্ঠিত নৌকা বাইচ ছিল লোকদের অন্যতম প্রধান আমোদ-প্রমোদ। দেশের বহু অঞ্চলে, বিশেষত ময়মনসিংহে রায়তদের বড় বড় ধর্মীয় উৎসবে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা এখনো জনপ্রিয় আনন্দানুষ্ঠান।

ঘুড়ি উড়ানো দেশের এ অংশে অত্যধিক প্রচলিত আমোদ-প্রমোদ বলে প্রতীক্ষমান হয়। এই শহরে শীতের মৌসুমে এবং গ্রামে প্রধানত বসন্তকালে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উন্নয়ন বয়সের লোক ও বালকেরা এতে যোগদান করে। এবং এই খেলায় তারা হাতের একপ কৌশল প্রদর্শন করে থাকে, যা সম্ভবত পৃথিবীর কোনো দেশের পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ঘুড়িগুলো সাধারণত ছোট এবং হালকা হয়। এগুলো খুব পাতলা কাগজ এবং বাঁশের লম্বা ও সরু টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়। ঘুড়িটা একগাছি খুব দীর্ঘ বেশমি অথবা সাধারণ সূতা দিয়ে বাঁধা থাকে। তারা এই ঘুড়ি দিয়ে পাখিদের উড়বার অনুকরণে কিছুসংখ্যক অভিব্যক্তি বা ভঙ্গির অভিনয় করিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের একে অন্যের ঘুড়ির সূতা কাটবার অভিপ্রায়টাই হচ্ছে মুখ্য এবং এতে পরাজিত পক্ষ তাদের ঘুড়ি হারায়। চড়ক পূজার প্রথম দিনে (১১ই এপ্রিল) আবালবৃদ্ধ মিলে বহু লোক ঘুড়ি উড়ানোর জন্য দেশের প্রধান প্রধান গ্রামের সন্নিকটে সমবেত হয় এবং মাঝে মাঝে এক স্থানেই তিন শ'রও অধিক লোককে এই খেলায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। এটা বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ দিনটিতে সারা দেশের হিন্দুগণ ভাতের পরিবর্তে 'ছাতু' নামে পরিচিত চূর্ণ করা ধব ধোঁয়ে থাকে।

এ দেশে আর একটি শ্রেষ্ঠ আমোদের দিন হচ্ছে মকরসংক্রান্তি বা পৌষ মাসের শেষ দিন (১৩ জানুয়ারি)। এইদিনে হিন্দু জমিদারগণ তাঁদের জমিদারিতে ব্রাহ্মণ ও প্রজাবৃন্দকে আতিথেয়তা প্রদান করেন। উনুত মাঠে ডোজ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এবং অভ্যাগতদের মধ্যে চাল, গুড় ও তেলের তৈরি পিঠা ও ডাকের পানি বিতরণ করা হয়। এটি বাসুপূজা নামে পরিচিত, এবং এ উপলক্ষে বিক্রমপুরে কুস্তি, লক্ষদান ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রধান খেলা 'আরুন্দা' নামে পরিচিত

এ জেলার খেলাধুলার মধ্যে প্রধান খেলা 'আরুন্দা' নামে পরিচিত। এই খেলা কিছুটা 'পলক' খেলার অনুরূপ। এটা বিশেষ দুটো দলের মধ্যে ছোট ছোট বংশলগ্ন ও কাঠের বলের সাহায্যে খেলা হয়ে থাকে। শীতের মৌসুমে এটি দেশের উন্নয়নের মধ্যে প্রচলিত ও শ্রীর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা।

জালের সাহায্যে হরিণ ধরা

হিন্দু জমিদারগণ নিজেরা জালের সাহায্যে হরিণ ধরার আনন্দ লাভ করেন এবং মুসলমানগণ সাধারণত গুলি করে শিকার করতে ভালবাসেন।

মৃগয়া বা গুলি ছোড়া

মুসলমানগণ এ কাজটি শীতকালে শহরের কাছাকাছিতে ব্যাপক হারে করে থাকেন।

মাহ ধরা

বর্ষার শুরুতে বুড়িগঙ্গায় হিপ কেলো মাহ ধরা বেশ প্রচলিত। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীগণ এই কৌশলটি ভালোভাবে রুও করতে পারে নি। তারা কেবলমাত্র অনিশূন্য ও অপোহমোডোবে এ কাজটি করে থাকে, তাতে এ খেলা সম্বন্ধে ড. জমসনের সুপরিচিত সংজ্ঞাটি আর বর্ধন যেন

হয়। হিন্দুগণ ভেড়া, বুলবুল, দোয়েল ও মুনিয়া পাখির লড়াই ভালবাসে। তারা প্রধানত দুর্গাপূজা উৎসবের সময় এ খেলার ব্যবস্থা করে থাকে। শেষোক্ত খেলাটির মাধ্যমে (অর্থাৎ মুনিয়া পাখির লড়াই) তারা মাঝে মাঝে প্রচুর টাকা-পয়সা হারে এবং জিতে।

গৃহাভ্যন্তরীণ আমোদ-প্রমোদ

তাদের অন্যান্য গৃহাভ্যন্তরীণ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রয়েছে পাশা খেলা, কড়ি ও তাস খেলা, ভিম ও নারকেল ভাঙা ইত্যাদি। তাঁতি ও অন্য বৈষ্ণবের মধ্যে নাচ ও লীলা বা মঞ্চে অভিনীত কৃষ্ণের লীলা বেশ প্রচলিত।

সঙ্গীতবিষয়ক বাদ্যযন্ত্র

হিন্দুদের ব্যবহৃত বেহালা বহুল প্রচলিত। কিন্তু এর স্থান সম্ভবত 'ভায়োলিন' দখল করতে পারে, এটি সম্প্রতি দেশের এ অংশে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভায়োলিন তৈরির জন্য শহরে কয়েকটি কারখানা আছে। এ ছাড়া, প্রতি বছরে নির্মিত যন্ত্রের বিপুল সংখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে এসব যন্ত্রের বিরাট চাহিদা রয়েছে। গোসাই ও বৈরাগীরা এর প্রধান বাদক বা বাজনাদার। মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীতবিষয়ক প্রিয় বাদ্যযন্ত্র সেতার। তাদের নিষ্ক্রিয় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে আছে নাচগান, আতশবাজি, মুরগির লড়াই, পাশা ও তাস খেলা ইত্যাদি। শেষের খেলাটিতে রানী বা বেগম নামাঙ্কিত তাস দখল করাই বেশিরভাগ খেলার মূল লক্ষ্য।

শিক্ষা

বাংলা ভাষা ও অঙ্ক পঠন ও লিখন বা কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাবপত্র সংরক্ষণের পদ্ধতি পঠন ইত্যাদি দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার বিভিন্ন শাখা।

হিন্দু বিদ্যালয়ের সংখ্যা

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গৃহীত জনসংখ্যা গণনার প্রাক্কালে শহরে ৩০২ জন শিক্ষার্থীসহ এ জাতীয় ১১টি হিন্দু বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। প্রতিজন শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত ছাত্র-বেতনের পরিমাণ গড়ে দু'আনা মাত্র; কিন্তু বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই অত্যন্ত সম্পদশালী অধিবাসীগণের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত। পার্শ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র অধিবাসীগণ বিনা খরচে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে এসব বিদ্যালয়ে পাঠাবার সুযোগ পেয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা দুপুরে খাওয়ার জন্য দু'ঘণ্টা বিরতি নিয়ে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। তারা মাসে ছ'দিন ছুটি পায়। নতুন চন্দ্রে চার দিন এবং পূর্ণচন্দ্রে দু'দিন।

মুসলিম বিদ্যালয়ের সংখ্যা

১৮৩৮ সালে শহরে মুসলমানদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৯টি। এতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১১৫ জন। সঠিকভাবে বলতে গেলে, এগুলো সবই প্রাইভেট স্কুল। কয়েকজন ধনী ব্যক্তি

কর্তৃক শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা হয়। পার্শ্ববর্তী ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। বিগত বিশ বছর যাবৎ শ্রীরামপুর মিশনারি সোসাইটির রেভারেন্ড মি. লিওনার্ড কর্তৃক কিছুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শহরের অধিবাসীগণ ঐ সময়ে তাদের পরিবারবর্গের শিক্ষার জন্য প্রধানত তাঁর কাছে ঋণী। এক সময়ে সেখানে এ জাতীয় ২৯টি বিদ্যালয়ের কম ছিল না। এসব বিদ্যালয়ে বাংলা, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় ১,৪০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু অর্থাভাবে ক্রমে ক্রমে এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং বর্তমানে ৫২৯ জন পুরুষ শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাতটিতে এসে ঠেকেছে। মেয়েদের জন্য আছে চারটি বিদ্যালয়। ১৮৩৭ সালে এগুলোতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৯৯ জন। একই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ‘কলকাতা বেনেভলেন্ট ইনস্টিটিউশনের’ একটি শাখা প্রতিষ্ঠান ‘খ্রিস্টিয়ান স্কুল’-টিও বিদ্যমান আছে; সেখানে লিখন, পঠন, অঙ্ক কষা এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদকরণ ইত্যাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ১৮৩৮ সালে এতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৭৮ জন।

বিক্রমপুর—সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র

দেশের এ অংশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বিক্রমপুর ; খ্যাতির দিক থেকে নদীয়ার পরেই এর স্থান। ১৮৩৮ সালে সাধারণভাবে এইস্থানে, সোনারগাঁও ও সমগ্র জেলাব্যাপী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ১২৫। এতে বিদ্যার্থীদের সংখ্যা ছিল ৮২৮ জন। উক্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৪৬৭ জন ছাত্রসহ ৬৮টি বিদ্যালয়ে “কলাপ ব্যাকরণ” বা সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। ৩০৬০টি পাতা সংবলিত মোট পুস্তকের সংখ্যা ২০ এবং শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা দশ বছর। ২২৭ জন শিক্ষার্থীসহ ৩৩টি বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কবিদ্যা হল জ্ঞানের একটি প্রধান শাখা, এসব এখানে অনুশীলিত হয়। এতে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা সাত, এবং যুক্তিকৌশলে পারদর্শী হওয়ার নিমিত্ত একজন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সময়সীমা ধরা হয় বার বছর। ১৩৪ জন ছাত্রসহ বাদবাকি ২৪টি বিদ্যালয়ে বেদ পঠিত হয়। ১২৪৩টি পাতাসহ গ্রন্থের সংখ্যা ৩০ এবং এগুলো পঠনপাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ধরা হয় আট বছর।

জ্যোতির্বিদ্যা

বিক্রমপুরে অনুশীলিত অন্যান্য শাস্ত্র হল জ্যোতির্বিদ্যা ও আয়ুর্বেদিক বা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐরা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় নিরূপণ করেন ও প্রতিবছর পঞ্জিকা লিখেন। আশর্গী ব্রাহ্মণগণ এসব পঞ্জিকা নকল করে শহরে বিক্রয় করেন। বাকেরগঞ্জের বাকলায় এ ধরনের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলোর কোনোটারই নদীয়া থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকার মতো এত ব্যাপক প্রচলন নেই। শেষোক্তটি এমন একটি পঞ্জিকা, যা প্রধান প্রধান উৎসবের তারিখ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

চিকিৎসাশাস্ত্র

সাধারণত জ্যোতির্বিদ্যা অপেক্ষা চিকিৎসাবিদ্যার অধিক অনুশীলন হয়ে থাকে। দেশের বেশিরভাগ জনপ্রিয় ও মূল্যবান চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থরাজি বিক্রমপুরেই লিখিত হয়েছিল বলে এ স্থান একটি বিশিষ্ট মর্যাদার দাবিদার। বিক্রমপুরের গুরুরা বিনামূল্যে শিষ্যদের জন্য আহর, বাসস্থান ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং নিজেরা ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ব্যক্তিদের মঞ্জুরিকৃত দানের সাহায্যে পরিবারের ভরণপোষণ করেন।

ইসলামি উচ্চশিক্ষার অবস্থা

ইসলামি উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে কোনো সরকারি বিদ্যালয় নেই। শেষ অধ্যাপক যিনি ঢাকায় শিক্ষাদান করেন, তিনি ছিলেন মৌলবি আসাদুল্লাহ নামের জনৈক ব্যক্তি। তিনি মুঘল সরকার থেকে মাসিক ৬০ টাকা বেতন লাভ করতেন। লালবাগে অবস্থিত একটি মসজিদে তাঁর বিদ্যালয় বসত। এখানে শহরের যুবকদেরকে আরবি ভাষা, যুক্তিশাস্ত্র, সাধারণ দর্শনশাস্ত্র ও আইন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হত। তিনি ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন এবং ঐ সময় থেকে এখানে উপরিউক্ত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য কোনো সরকারি শিক্ষক নিযুক্ত নেই।

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বিদ্যালয়

দেশের এই অংশের অধিবাসীগণ ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানার্জন করার জন্য বিরাট আগ্রহ প্রদর্শন করেছে; এবং সে অনুসারে অধুনা সরকার কর্তৃক শহরে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এতে ছাত্রদের উপস্থিতি সন্তোষজনক এবং মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়টির অবস্থা এখন উন্নয়নশীল ও আশাশ্রিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে এবং বর্তমানে শিক্ষকদের দক্ষতাপূর্ণ শিক্ষাদান কার্যের অধীনে শিক্ষার্থীদের কেবল পড়া, লেখা ও অঙ্ক বিষয়েই নয়, উচ্চ পর্যায়ের ভূগোল, ইতিহাস ও জ্যামিতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তারা বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে।

মামলা-মকদ্দমা, অপরাধ সংঘটন এবং এসবের বাস্তব কারণ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার অধিবাসীগণ অত্যন্ত কলহপরায়ণ এবং মামলাবাজ; এজন্য তাদের বদনাম আছে। শহরে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনবরত ঝগড়া-বিসংবাদ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকার কারণেই ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কমপক্ষে ছয়টি ‘কোর্ট অব্ জাস্টিস’ স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। হিন্দু-বিরোধের প্রতি তাদের এই চরিত্রগত স্বাভাবিক প্রবণতা ও বিভিন্ন আদালতে সংরক্ষিত দলিলদস্তাবেজ ইত্যাদি থেকে—সেই সময় হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত—তাদের এই জাতীয় প্রবণতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে শহরে মাত্র একজন মুসেফের কোর্টে রুজু করা মকদ্দমার নিম্নলিখিত বিবরণ থেকেই দেখা যাবে—কী কী ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ বিদ্যমান আছে যা সাধারণত দেওয়ানি আদালতের সামনে আনীত হয়।

১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মুলেফ আদালতে রুজু করা মামলার সংখ্যা

রুজু করা মামলার সংখ্যা	বিবাদের বিষয়	আদালতে নিষ্পত্তিকৃত	আদালত কর্তৃক তিসমিস করা	অপস নিষ্পত্তি কৃত	নথি থেকে হক্কিত কৃত
২০	অর্থকণ সংক্রান্ত	১২	৩	২	৩
৫৩৯	অঙ্গীকারপত্রে অর্থকণ	২৯৯	২৯	১১১	১০০
৩৫	জমা বা গচ্ছিত অর্থ আদায়	১৫	১০	৬	৪
১৯	বকেয়া সুদ	১১	২	৪	২
১১৯	কিস্তি বাবদ টাকা পাওনা	৬৪	৬	৩১	১৮
১৩	গৃহীত বিল বা হতি	৭	২	৩	১
১৬	বিল বা পাওনা হতি	১১	০	৩	২
১০	বন্ধকী সম্পত্তির পাওনা টাকা	৪	১	২	৩
৬২	রায়তের বকেয়া খাজনা	২২	১০	১০	২০
৭৫	মজুরি পাওনা	৪৩	১১	৮	১৩
৭	অগ্রিম প্রদত্ত টাকা	৫	১	০	১
১০	খোরপোশের দাবি	৪	১	১	৪
৬১	অলংকারের দাবি	৩২	৬	১০	১৩
২২	জমিজমা ও ঘরবাড়ির মূল্য এবং তালুকের দখলি	১৪	৩	২	৩
৪০	ঘরদোর, কুঁড়েঘর ও জমির দখল	২৮	৪	৪	৪
২	গৃহত্যাগের নোটিশ	১	০	১	০
৩১	বাড়িভাড়া	১৫	৫	৫	৬
৫	জমির খাজনা	১	১	১	২
৯	ইষ্টকাদি বিক্রি	৩	২	১	৩
৫	জুতা বিক্রি	৩	০	০	২
৮	শব্দ বিক্রি	৩	২	১	২
১৩	গরু বিক্রি	৭	৩	০	৩
৩	সূতা ও রেশম বিক্রি	২	১	০	০
১০	শব্দ কাটার করাত বিক্রি	৬	০	৩	১
৯	কাষ্ঠ বিক্রি	৩	০	২	৪
৩	আমগাছ বিক্রি	১	১	০	১
১১	দুধ বিক্রি	৪	১	৪	২

রক্ষা করা মামলার সংখ্যা	বিবাদের বিষয়	আদালতে নিষ্পত্তিকৃত	আদালত কর্তৃক ডিসমিস করা	আপস নিষ্পত্তি কৃত	মিথি থেকে খারিজ কৃত
৩	ঘাস বিক্রি	২	০	১	০
৩	বিবাহ চুক্তি খেলাপের দরম্মন বর কর্তৃক শ্বশুরকে প্রদত্ত অর্থ আদায়	৩	০	০	০
৪	উকিলকে প্রদত্ত অর্থ আদায়	২	১	১	০
২৯	চুক্তিনামা	২০	০	৩	৬
২	বেআইনি জরিমানা ধার্য	২	০	০	০
৩	অবৈধ বিক্রি	০	১	০	২
৫	বিক্রির অর্থ আদায়	১	৩	০	১
৬	বর কর্তৃক কনেকে প্রদত্ত কাবিনের ১/৩ অংশ আদায়	৩	০	০	৩
৫	বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার	৩	২	০	০
১৭	নৌকা ভাড়া	৭	৩	৫	২
২৯	বিবিধ	১৩	৬	১	৯
২	শঙ্খ কাটার জন্য করাত ভাড়া	১	০	০	১
১১	শস্যপাতির ব্যবসা সংক্রান্ত	৩	২	৩	৩
৬৯	বস্ত্রাদি বিক্রি ,, ...	৪২	৯	৯	৯
৭	শাল ,, ...	২	১	৪	০
১০	চামড়া ,, ...	৬	০	০	০
৬	সাবান ,, ...	১	১	২	২
২৫	ইউরোপীয় দ্রব্যাদি ,, ...	১২	২	৩	৫
৫	নৌকা বিক্রি ,, ...	৫	০	০	০
৩	ঘড়ি ,, ...	৩	০	০	০
৩	চিনি ,, ...	২	০	১	০
৫	মাংস ,, ...	৩	০	১	১
৪	সুবাসিত তৈল বিক্রয় সংক্রান্ত... ..	১	১	২	০
৪০৩	হিসাবে উদ্ভূত অর্থ পাওনা ...	১৫৫	২২	১৫২	৭৪
১৮১৫		মোট ৯১৫	১৫৯	৪০৩	৩৩৮

বিগত দশ বছরে বিক্রয়কৃত ট্যান্সের বার্ষিক পড়পড়তা সংখ্যা ছিল ১,১১,৭১৪টি।
এর মধ্যে—

১	আম্রা	মুন্সের	ছিল	১০,৯৬৭	টি
২	"	"	"	২৭,০২৭	"
৪	"	"	"	৬,৮৪৭	"
৮	"	"	"	৪৯,০১০	"
১২	"	"	"	১৯৭	"

এক টাকার অনধিক মুন্সের ট্যান্সের পড় পড়তা মোট সংখ্যা মাত্র ১,০৪,১১১।

অপরাধমূলক কাজ

সত্তাবহ ডাকাতি এবং অলঙ্কারস্বরূপ অন্য হেনোমেয়ে হত্যাকাণ্ডে অসহায় অসহায় শিশুরা
চোরে বর্তমানে কম সংঘটিত হচ্ছে। এক সময় পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো দেশ-ভিতরে পূর্ণ
ছিল। কোম্পানির সরকার লাভের পর থেকে কিছুকালের মধ্যে এই সকল পুট-ব্যাগের
মূল্যোৎপাদন করা হয়। জেলার পুরোনো মলিনপথে এসব দুর্ভেদ্য কর্তৃক প্রায় অসংখ্য লুটন ও
অগ্নিসংযোগ, রাস্তা ও ভাঙ্গার পরিবারবর্গের লোকজন হত্যা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে
অসংখ্য চালনা ইত্যাদি মাঝে মাঝেই হয়েছে।

সত্তাবহ ডাকাতি

তারা সত্তাবহ ডাকাতদল তৈরি করত। কোনো কোনো সময়ে ১,৫০০ জন লোকও পরিলক্ষিত
হত এবং এদের প্রধান নেতা থাকত একজন মুসাহসী সর্দার। এরা সাধারণ কিছুসংখ্যক
শক্তিশালী অশ্বারোহী হস্তাশ্রয় থাকত, আর ঐ সকল অশ্বারোহী এদের লুটের প্রভাব তুলে
পেত। সেই দিনে কলকাতা বা সুর্শিমাফলে হস্তাশ্রয় ছিল বিখ্যাত। এতে অসংখ্যক
অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হত। এককালে সিন্ধে প্রায় পঞ্চাশ সত্তাবহ
সিন্ধে বিরাট পার্কস পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে নানা সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়নের সময়ে
প্রমত্ত করা যায় এবং এর একমাত্র প্রকারে তাই কয়েক পায়ে ছাড়া অসংখ্য সিন্ধে প্রকারে
কুঁকি নিয়েছেন।

প্রচলিত অপরাধের মনুনা

প্রচলিত অপরাধগুলো হচ্ছে চুরি, নাল-হস্তাশ্রয় ও অসংখ্যক ইত্যাদি এবং এর সময়ে দূত
করা যায় বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য, স্বর্গদেব সম্পর্কিত অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড।
মুসাহসিক সিন্ধে চুরি এবং বিক্রয় ঘটন। কিছু খুব ভয়ঙ্কর যা হলেও পথে এসব পূর্ণ
দয়কা ভাঙার ঘটনা খুব বিরল নয়। সাধারণত অসংখ্যক প্রভাব মাঝে মাঝে সাধারণ কিছু
টাকা-পয়সা, অলঙ্কারস্বরূপ, কাপড়চোপড়, শিশুরা অসংখ্যক ও অসংখ্যক, ইত্যাদি।
এখানে ইল্যান্ডের পকেটমারদের অনুপ্রাণ একজন সাধারণ হস্ত-হস্তাশ্রয়কে সিন্ধে
আছে; এরা সন্তোষের লোকসম থেকে সাধারণ শিশুরা সিন্ধে সিন্ধে এবং সিন্ধে মাঝে
হেনোমেয়েদের কাছ থেকে অসংখ্য ইত্যাদি কেড়ে নেয়। এ ছাড়া শক্তিরে কল শক্তির
দর্শকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা অপহরণ করে। এটা ভয়ঙ্কর সিন্ধে যা সিন্ধে কেটে

সূচীপনে করে থাকে। কেননা, সাধারণত পিট বা কাসকেস খাঁড়নে দেখীর সেরেফা তাদের টাকা পরসা বেঁধে রাখে। এই ধরনের হুপি থেকে ভাষা শিখেরটা বা গীটারটা আলাদা সেমেয়ে। এরা প্রায় সকলেই জাতিতে মুলসমান এবং মাদকাস্ত্র ও দুর্ভাবনার আশ্রিত। মদ্য বস্ত্র ও কুখ্যাতির জন্য সাধারণত এসকল চোরকেই সম্বোধ করা হয়ে থাকে এবং বার্ষিক পক্ষে সহস্রে সংখ্যচিত সকল প্রকার হুপি-ভাক্যটিতে প্রায়শ এরা জড়িত থাকে।

উদ্ভটজনক দু'খানি

উত্তেজক প্ৰচাৰণৰ বাবে এই জেলায় অগ্ৰাৰ সংঘটনৰ প্ৰধান বাহ্যিক কাৰণ। ১৮৩০
সালে এ মহাৰেব মাছিক্টেট বেনিফিকাল বৰ্ণবোৰ্ডিত অগ্ৰাৰেৰ জন্ম এটাকেই মূল কাৰণ
হিসেবে চিহ্নিত কৰেন এবং উক্ত বিষয় সম্পৰ্কে বৰ্তমান নিম্নেও একই কথা কয় কয়।
এনেৰে প্ৰভাবাধীন ব্যক্তিয়েৰ দ্বাৰা বেনিফিকাল মহাৰেব, অগ্ৰাৰেৰ ও অগ্ৰা-হাৰাৰ
গংঘটিত হৈছে থাকে।

আকিম প্রধানত নহরাকলে ও মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং প্রায়শঃই চলে
গীয়া। ১৮২১ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত কালেক্টর কর্তৃক নহরে বিক্রি করা অকিমের
পড়পড়তা বার্ষিক পরিমাণ ছিল ৮৯২ পাউন্ড। কিন্তু প্রায়শঃই অন্য বিক্রি হয় আর ও
পাউন্ড। অবশ্য এই সঙ্গে আবার যুক্ত হবে সাধা বহর চৌহদ্দাসদারি করা ক্ষুদ্র পরিমাণ এ
জাতীয় উত্তেজক দ্রব্য; বাস্তবিক পক্ষে এই পরিমাণ সরকার কর্তৃক বিক্রিত দ্রব্যের ½ অংশের
কম নয়। সুতরাং নহরের ৩২,৪৬৩ জন অধিবাসীর মধ্যে এই দ্রব্যাদি হৈল ও অকিম
ব্যবহারের মোট পরিমাণ প্রতি বছরে ১৫৬০ পাউন্ড করা হেতে পারে, এটা হিসেবে এক
বছরে ব্যবহৃত পরিমাণের প্রায় ১/১ ভাগ।

आश्विन दशहरादेव नवरात्रि

আকিম মাঝে মাঝে সেবন করা হয়; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা সারসংক্ষেপ পাঠের সঙ্গে
সম্মিশ্রিত করে খাওয়া হয়। এভাবে প্রস্তুত প্রদান করা হয় "কমল"। এ সকল প্রস্তুত প্রদান
এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত দোকানগুলোতেই বিক্রি করা হয়। পছন্দে এর জন্য প্রায় ১৫টি
দোকান রয়েছে। এটা উদ্ভবের সঙ্গে তখনো পান দিয়ে সম্মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয় এক
আকিমের সঙ্গে মিলিয়ে ছোট ছোট করে কাটা হয়। তারপর কচি পিঠা দিয়ে প্রস্তুত প্রদান
মতো ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত অল্প অল্প আতনের উপর রাখা হয়। অতঃপর তা থেকে ছোট
ছোট বড়ি বামনো হয়। এর এক একটি বড়ির ওজন ৮০ গ্রাম বা ৮০ বর্টি। এই বড়ি তার
এক পরস্পর মূল্যে প্রায় করা যায়। গাভী এবং এর জন্য প্রস্তুত প্রদান প্রায় ১৫
ব্যবহৃত হয়। উদ্ভবের পূর্ণাঙ্গুল একটি বিশেষ যৌগে সঞ্চারিত ও তর করা হয়ে গাভীর
পরিণত হয়; আবার বকল সবুজ বা নবীন পাতাগুলো খর্বন করে প্রস্তুত প্রদান উপর
দুধ, চিনি, ঘোঁরা, এলাচ ও পিপুল ইত্যাদি মিশ্রিত করা হয়, তখন সেই প্রস্তুত প্রদান
ভাংগা বা সবজি গাভী বা ভাংগা ঘি, দুধ ও চিনি ইত্যাদি মিশ্রিত করে প্রস্তুত প্রদান হয়; এই
মিশ্রিত প্রদান প্রায় ১৫টি দোকান দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট প্রদান প্রস্তুত প্রদান করা হয়।

অতঃপর তা থেকে ছোট ছোট চ্যাপটি বরনের পিঠা বাসানো হয়ে থাকে (কিউটিং আকার বা পরিমাণ আর কনশার এক টাকার মতো)। এক পরশা মানে এর দুটো বক মাত্রই করা যায়।

[illegible][illegible]

এ সেশনের উদ্দেশ্যক মুদ্রণের জন্য এই বৈধ সেশনের একটি বা কয়েকখানা প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় যেটি অনুসন্ধান করা হয়, ১,০০০ পিপিট (১ পিপিট প্রায় ১০ মিলিগ্রাম) মাত্র।
কিন্তু যেহেতু প্রোগ্রাম : এই পরিমাণ ১,০০০ মিলিগ্রাম অতিরিক্তের বিধান অনুসরণে অনুসন্ধান প্রোগ্রাম করা হয়েছিল।

Abstract

[illegible]

1990

এখানে কখনও কখনও উদ্ভেদক জালপত্রের কথা আসে । কিন্তু : কখনোবা এটা : এ
 মতো ভিড়ের কথা : কখনো এটা বিক্রির কথা : কখনো এটা কল্যাণকামের কথা : কিন্তু
 পৌরী, বিদ্যা, জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞান : কখনো এটা : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো :
 কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো :
 কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো : কখনো :

[illegible]

কয়েক প্রকার বৃক্ষ : যেমন কতবেল, গাৰ, লাউ ইত্যাদির ছাল ও মূল থেকে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এসব উপকরণ পানিভর্তি একটি বিরাট মাটির কলসিতে পুরে কিছুকালের জন্য মাটির নিচে ঢেকে রাখা হয় এবং এভাবেই উক্ত মদ্য তৈরি হয়ে থাকে। গাঁজিয়ে ওঠার সময়ে এই মদ্য পান করা হয়। কলসি থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু তুলে আনা সুরার সমপরিমাণ পানি কলসির মূল উপকরণাদিতে ঢেলে দেওয়া হয়। এভাবে প্রায় তিন মাসব্যাপী অনবরত সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। এটা প্রধানত মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে পাশাপাশি বসবাসরত কিছুসংখ্যক পরিবার একত্রে মিলিত হয় এবং মদের কলসি নিয়ে বসে। ভাউকার ও অনুরূপ উপকরণ ইত্যাদির সাহায্যে প্রস্তুত কাথ পানের ফলে প্রায়শই মাতলামি শুরু হয়। হোলি উৎসবের সময় সাধারণত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এটা পান করে থাকে।

জুয়াখেলা অপরাধের একটি উৎস

জুয়াখেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও শহরে এটি খুব প্রচলিত এবং উদ্বেজনাপূর্ণ মাদকদ্রব্যের পরেই এই খেলা এ জেলায় অপরাধের সবচেয়ে বড় উৎস। মদের দোকানগুলোতে ব্যাপকভাবে জুয়া খেলা চালানো হয়; কিন্তু এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত জুয়াখেলার আড্ডাও রয়েছে। সেখানে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য পুলিশদেরকে ঘুষ দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই খেলার প্রতি আসক্ত হলেও, বিশেষ করে মুসলমানরাই এ বিষয়ে অগ্রণী। এদের অনেকে প্রায়শই এতে দিনরাত মেতে থাকে। তাস, পাশা ও ঘোলই (কড়ি খেলা) ইত্যাদি হল এসকল জায়গার প্রচলিত খেলা। মাঝে মাঝে বেপরোয়া জুয়াড়ীগণ আরো সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। মেঝের উপর বৃত্তাকারে বসে তারা তাদের স্ব স্ব চিনি মাঝানো কাঠিগুলো সামনে রেখে দেয়। অতঃপর জুয়াড়ী দলের মধ্যে, যে ব্যক্তির টাকার উপর কোনো মাছি বা পোকা প্রথম উড়ে এসে পড়ে, সেই ব্যক্তিই সন্তটার বিজয়ী বলে স্বীকৃত হয়।

পতিতালয়

শহরের প্রচুরসংখ্যক পতিতালয়ও অপরাধ সংঘটনের আর একটি উৎস এবং এখানে খুন-জখম, চৌর্যবৃত্তি ও নরহত্যার দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। এ ছাড়া, ছোটখাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায় সব সময়েই ঘটে থাকে। সাধারণত আফিম বা গাঁজাখোর ব্যক্তির নেশাশ্রুত অবস্থায় এসব খারাপ কাজ করে থাকে। এ ধরনের ঝগড়া-বিবাদ সাধারণত বাসাবাড়ি ও সীমানা, পায়েহাঁটা ছোট পথের মালিকানা, একে অন্যের আঙ্গিনায় অনধিকার প্রবেশ এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যকার ঝগড়া ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সূচী বা চিকন কাজের কর্মীর পক্ষে কাসিদার কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সময়নিষ্ঠার অভাবহেতু এবং ওস্তাগার এবং ওস্তাগারনী বা এ জাতীয় কাজের তত্ত্বাবধানে বণিক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে বিরাট বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত ঘটায়। এই ধরনের সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘ একটানা তর্কযুদ্ধ চলে এবং এতে মেয়েলোকেরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এর ফলে সাধারণত প্রকাশ্য মারামারির সূত্রপাত হয়ে থাকে। অবশেষে বিবদমান পুরুষগণ আফিম বা গাঁজা খেয়ে তাদের সাহস সঞ্চয়পূর্বক সহসা দ্রুতবেগে বের

হয়ে এসে একে অন্যকে লাঠি বা বাণদণ্ড নিয়ে আক্রমণ করে এসে মারামারি করতারা দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং সাধারণ রক্ত দেখামাত্র ধোরে যায়। অত্যাচার কর্তৃক বা অত্যাচারিত দারোগা বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের মামলা দৃশ্যে ধরাদ প্রদর্শিতবস্থায় ফরাসী সন্তান কাগড়চোপড়ে রক্ত মাখাতে যত্নবান হয়ে ওঠে।

১৮৩৬ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারকৃত মামলা

১৮৩৬ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারকৃত মামলাসমূহের নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে সাধারণত এই জেলায় সংঘটিত অপরাধগুলো কিছুটা নতুন দৃশ্য দাঁড়ে।

বাদানুবাদ থেকে উদ্ধৃত অপরাধের মামলা

জায়গাজমি সম্পর্কিত বাদানুবাদ

থেকে উদ্ধৃত মারামারি বা অত্যাচারজনিত	...	...	...	১৬৭
অনুরূপ " " (এজমালি সম্পত্তি)	...	...	...	১২
টাকা-পরস	"	"	:	২৩
জলকর	"	"	"	১১
বাজার	"	"	"	৬
নৌকা ভাড়া	"	"	"	২
জমিদার ও তালুকদারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত	...	...	...	৩৯
জমিদার ও এজাদার মধ্যে বাজনার জন্য	...	...	...	৬৬
এলোভাস ও এগরীদের সঙ্গে ব্রহ্মীদের	...	...	...	৪৩
পল্লারনের ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি	...	...	...	১৪
হিসাবনিকাশ ও নিকাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত	...	...	...	১৪
বাদানুবাদ থেকে উদ্ধৃত দাঙ্গা-হাঙ্গামা	...	...	...	৬৪
গৃহভৃত্যদের বিভিন্ন বকেয়া মাস	...	...	...	১০
মাহিনার জন্য অভিযোগ	...	...	...	১০
বর্ণ-সম্পর্কিত বাদানুবাদ থেকে উদ্ধৃত	...	...	...	১০
মারামারি বা অত্যাচারজনিত	...	...	...	১০
ধামের অন্যান্য অঙ্গনে কসতি ছাপনের নিষিদ্ধ	...	...	...	১
এজাদার এলুক করার কারণে	...	...	...	২৬
ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়ভাবে আটক রাখার কারণে	...	...	...	২৬
অনুরূপ গরু বাছুর ধরা	...	...	...	৩২
ঘরবাড়ি, দেওয়ান ও পরগণাদী সম্পর্কিত	...	...	...	৩৩
অনুরূপ গার-হাটা গরু বন্ধ করা থেকে	...	...	...	৪
বেআইনি জরিমানা আদায়	...	...	...	

রাযত ও অন্যান্যকে স্বীকারোক্তির দলিলে				
জোরপূর্বক সহি দিতে বাধ্য করার ফলে	...	...	...	২৯
সম্পত্তির বেআইনি দখল	...	...	...	১৭
গাছগাছড়া ও শস্যহানি এবং নীল গাছ নষ্ট করার ফলে	...	...	...	১০
বেআইনি মদ বিক্রি	...	...	...	৩
অভ্যাত ও মারপিটের ফলে গর্ভপাতজনিত	...	...	...	৪
বাড়িঘর নির্মাণ সংক্রান্ত	...	...	...	৯
বেআইনিভাবে অর্থ কেড়ে নেওয়া	...	...	...	১০
টাকা-পয়সা নিয়ে গা-ঢাকা দেওয়া বা পলায়ন	...	...	...	৫
গহনাপত্র নিয়ে পলায়ন	...	...	...	৩
বেআইনি সম্পত্তি ক্রোক ইত্যাদিজনিত	...	...	...	২
ঘুম সংক্রান্ত	...	...	...	৪
জালিয়াতি	...	...	...	২
বলাৎকার	...	...	...	৩
ঈর্ষাবশত সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ	...	...	...	১
ব্যভিচার	...	...	...	১
চৌর্যবৃত্তি ও রাহাজানি	...	...	...	৪৪
জোরপূর্বক খাজনা আদায় ও বেআইনিভাবে				
জমি থেকে লোকদের উৎখাত ও অন্যান্য	...	...	...	৫
ছোটখাটো অভ্যাত ও দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ				
নানাবিধ ঘটনা ইত্যাদি	...	...	...	৫৬১

মোট : ১৩০৭

মিথ্যা সাক্ষ্যদান

আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদান এখানে অতিমাত্রায় প্রচলিত এবং এসব কাজ এমন লোকেরা করে থাকে যারা সর্বদা এটর্নি ও উকিলদের ছত্রছায়ায় বসবাস করছে। আদালতে কী সাক্ষ্য দিতে হবে তাও উকিল-এটর্নিরা তাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে থাকেন। দলিলপত্রাদির ক্ষেত্রে সহি, শপথ ইত্যাদি দ্বারা সমর্থনের জন্য এবং অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ আকর্ষণকারী ছোটখাটো মামলা-মকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্যদান খুবই ঘন ঘন চলে।

ঈর্ষাবশত অগ্নিসংযোগ

ঈর্ষাবশত অগ্নিসংযোগের ঘটনা সাধারণত খড়কুটা ও বাঁশের ব্যবসায়ীদের দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং গিটকাটা ব্যক্তিরও এ কাজ করে থাকে—যারা শহরে অগ্নিকাণ্ডের সুযোগে তাদের পেশাকার্য চালায়।

ব্যভিচার

আগের দিনের অপেক্ষা বর্তমানে ব্যভিচারের ঘটনা অনেক বেশি ঘটেছে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জোর দিয়ে বলছে এবং উক্ত অপরাধের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের শিথিলতাকেই তারা এর কারণ বলে উল্লেখ করে। এই সকল ঘটনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, গর্ভপাত ঘটানোর নিমিত্ত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং এ ব্যবস্থা জমিদারগণের অধীনস্থ দাসী-বাঁদীদের মধ্যে এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অনূঢ়া বা অবিবাহিতা কন্যাদের মধ্যেও প্রচলিত।

নরহত্যা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঈর্ষা থেকে ইচ্ছাকৃত নরহত্যার ঘটনা ঘটে থাকে, এবং মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চেষ্টাও একই সঙ্গে করা হয়।

সতীদাহমূলক অপরাধের সংখ্যা

সরকার কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার পর থেকে একজন সতীকেও জোরপূর্বক দাহ করার চেষ্টা করা হয় নি। ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে এ জেলাতে এক শ পঁচানব্বই জন বিধবা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীদের চিতায় আরোহণ করে। এই সংখ্যার মধ্যে—

২০	বছরের	কম	বয়স্ক	ছিল	১০	জন
২১	থেকে	৩০	বছর	বয়স্ক	৪৩	"
৩১	"	৪০	"	"	৪৯	"
৪১	"	৫০	"	"	৪৬	"
৫১	"	৬০	"	"	৩৪	"
৬১	"	৭০	"	"	১২	"
		৭০	বছরের	উর্ধ্বে	১	"

এদের আবার ২৮ জনের কোনো সন্তানাদি ছিল না, এবং ২৪ জনের ছিল না কোনো শিশু সন্তান।

জমিদারগণের পীড়ন বা অত্যাচার

ইতঃপূর্বে জমিদারদের মধ্যে রায়তদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রদান ও তাদেরকে খাজনা দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সম্ভবত সরকারের হাতে তারা নিজেরা যে নিগ্রহ ভোগ করত তারই প্রতিশোধ তারা নিত প্রজাগণের উপর। বিশেষত মুর্শিদকুলি খানের আমলে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রাজকর্মচারীগণ বলপূর্বক খাজনা আদায় করতে গিয়ে মাঝে মাঝে অত্যন্ত ঘৃণ্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করত। মাঝেমাঝে সাংঘাতিক ধরনের শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে জমিদারগণ তাদের রায়তদেরকে বন্দী করা ছাড়া, অন্য কোনোরূপ শাস্তির ব্যবস্থা কদাচিৎ করে থাকে। তারা বা তাদের পাটোয়ারী ও নায়েবগণ তাদের জমিদারিতে সংঘটিত বেশিরভাগ ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদ ও হন্দুকলহ নিষ্পত্তি করে ফেলে। এ উদ্দেশ্যে তারা

জেলাখানার অবস্থা

পুরাতন দুর্গ এলাকায় অবস্থিত এই জেলার দেওয়ানি ও অপরাধ সৎকাজ জেলসমূহ একই দালানের অধর্ভুক্ত। এতে দু'টি ডিয়ার্ট আছে। একেকটির মাঝেই উল্লুকে আঁড়না আছে এবং সমস্ত দালানটি বেশ কিছু পরিমাণ জমি দ্বারা একটি উচ্চ আঁটন দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। এখানে দেওয়ানি আদালতে সাক্ষাৎ কয়েকদিন সন্ধ্যা ৩০, এবং অপরাধ সম্পর্কিত জেলে আটককৃত বন্দীদের সন্ধ্যা ৮০০। গড়ে এদের সন্ধ্যা হল ৫২৬ জন। গতায় কর্মরত একজন অপরাধ সৎকাজ বন্দীর জন্য দৈনিক বরাদ্দের পরিমাণ হল দু'পয়সা মূল্যের আদায়বা; আর ১৭৯০ সালে এর পরিমাণ ছিল দৈনিক এক আনা।

অপরাধের বিবরণ ও মোতায়েনকৃত, সাক্ষাৎ ও খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা

ঢাকা জেলার মধ্যে সংঘটিত অপরাধের সর্বাঙ্গ বর্ণনা এবং ১৮৩০ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মোতায়েনকৃত, সাক্ষাৎ ও খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ।

অপরাধের বিবরণ		অপ- রাধের সংখ্যা	মিচনারে আনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা	সাক্ষা ৎ ব্যক্তি দের সংখ্যা	খালাস প্রাপ্ত ব্যক্তি দের সংখ্যা	মিচনা- মীন
মৃত্যু		৩৯	১৫৭	৭১	৭২	৭৪
মৃত্যু - জখম;	মৃত্যুর সময়কাল নয় এমন	১৩	৪৪	২০	১৩	১১
	অত্যাচারিত	১	১৫	৬	৯০	
	আইন বা ব্যক্তিগত আদালত	১	৬	০	০	৬
	অবস্থার পরিবর্তিত					
	অনুপস্থিত	৩৪	৪৭২	৯৯	২২৮	১৪৪
	ডাকাতের চেষ্টা করা	৩	৩	১	২	৩
	অবস্থার পরিবর্তিতজনিত					
ডাকাত	কারণে জাতিরায় অক্ষম	৭৫	৭৭	২১	৮	৪৮
	পক্ষাঘাত টাকার উৎস	১৫	২২	১৪	৮	০
রাষ্ট্রজানি	দল	৩৫	৪৬	২৩	১৬	৩
	দল নিম্নে	৭৪	৪৬	৩১	১১	০
	রাষ্ট্রজানির চেষ্টা করা	১	১	১	০	০
	মৃত্যু, অলঙ্কারাদির জন্য					
	জেলেমেমে মৃত্যু	১	০	০	০	০

অপরাধের বিবরণ	অপ রা/মর মহামা	বিচার/সি কসি-৬ বাতি/মর মহামা	নং কসি বাতি /মর মহামা	কমান কসি বাতি /মর মহামা	বিচার কসি

কক্সতর পরিষিদ্ধি/৩০

অনুপস্থিতি ...	১০৬	২৫৭	১৬৭	৭৭	১৭
পদার্থ টাকার ফ/সি ...	২৭	৭৬	২৭	২৬	৬
দল ,, ,, ...	৩৭	৭৬	৬৭	১৬	৬
দল ,, নিয়ম ...	২৮	১১১	৮৮	৩১	৬
II গৃহীত সম্পত্তি গ্রহণ...	৪৭	১৫৬	৭১	২৭	২৬
নলক্যান্ড ...	৬	১৭	৮	১১	৬
কোনন নিয়ম ...	১	৭৬	৮	৩৬	২৬
আইডে বা সাংসাদিক					
মানসন করা ...	৪	৮৬	৬৬	১৭	২৬
চলমানের শাস্তিজনক	৩১	৩১	১৬	১৭	৬
সাধারণত ...	৬	৮৬	৬৬	৬৬	১৬
দেহে আঘাত বা আঘাত হওয়ামহ					
অভ্যাস ...	৩৩৯	৩৬৬	৬৩৬	১৬৬	৮৬
অপরের সম্পত্তিতে বা বীমা করা					
নিজের সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ	৬	৬	১	১	৬
জালিয়াতি বা মুদ্রা জালকরণ	৬	৮	১	১	৬
আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদান ইত্যাদি	৬	২৬	৩	১১	৬
ধর্ষণ ...	৬	৬	১	১	১
বাতিচারণ ...	১	৬	৬	৬	৬
বিবিধ অপরাধসমূহ	২৯২৭	৪৭৬৬	৩৬১৬	৮৭৬	২৬৬

মোট : ৪,০২৪ ৭,২৩৮ ৪,৮৯০ ১,৬৬৯ ৬৭৮

দশম অধ্যায়

[খাদ্যদ্রব্য—প্রাচুর্য এবং অভাবের কারণ ও ফলাফল—শ্রমের মজুরি—দরিদ্র ও দাসদাসীদের অবস্থা]

বাংলার পূর্বাংশ প্রদেশের শস্যভাণ্ডার

বাংলার পূর্বাংশকে সব সময়ই সমগ্র প্রদেশের শস্যভাণ্ডাররূপে গণ্য করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকের প্রায় শেষ পাদে ঢাকা পরিভ্রমণ করে হ্যামিলটন লিখেছেন যে, “এখানকার খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য আর সস্তামূল্য অবিশ্বাস্য”। প্রায় প্রত্যেক লেখক হয় তাঁর পূর্বে অথবা তাঁর সময় থেকে কিছুটা একই রকমের বিবরণ^১ দান করে গেছেন। অবশ্য সঠিকভাবে বলতে গেলে এই অবস্থা ঢাকার জন্য নয়, বরং চতুষ্পার্শ্বস্থ সিলেট, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ ও ত্রিপুরা জেলার প্রতি প্রযোজ্য—যা ইতঃপূর্বে প্রদেশের প্রধান অংশরূপে গঠিত ছিল এবং ঢাকা নামে পরিচিত ছিল এবং এগুলো তখনকার মতো এখনো দেশের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শস্য উৎপাদনকারী জেলা। ঢাকা জেলায় এর অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনমাত্মক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না এবং এ কারণে উপর্যুক্ত স্থানগুলো থেকে এ জেলায় প্রায় সমপরিমাণ খাদ্যসত্তার সরবরাহ করতে হয়। ফলে, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল অপেক্ষা চাল এখানে দুর্মূল্য।

বিভিন্ন সময়ে শহরে খাদ্যশস্যের গড়মূল্য

কালেক্টরেট অফিসে সংরক্ষিত ‘সাপ্তাহিক মূল্য তালিকা’

(Weekly Price Current) থেকে উদ্ধৃত

টাকা	আনা	পাই	আমন চাল মনপ্রতি
১ —	০ —	১৫ $\frac{১}{২}$	২৩ বছরের গড় বাইজল চাল মনপ্রতি
০ —	১৫ —	৮ $\frac{১}{২}$	২৩ বছরের গড়
০ —	১৩ —	১৫ $\frac{১}{২}$	মশাকারী চাল মনপ্রতি ১৮ বছরের গড়

১ সিজার ফ্রেডারিক ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সন্দ্বীপের খাদ্যশস্যের সস্তামূল্যের উল্লেখ করে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন যে, তিনি বার শিলিং ৬ পেন্স দিয়ে ২টা লবণ মাখানো গরুর চামড়া এবং ঐ একই দামে ৪টা শূকর, এক পেনিতে একটা মোটা তাজা মুরগি এবং অনুরূপ সস্তা দামে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করেন, তথাপি লোকেরা বলল—তিনি দ্বিগুণ মূল্যে এগুলো ক্রয় করেছেন। পুরকাসের কলেকশন অফ ট্রাভেলস।

টাকা	আনা	পাই	
০ —	১৩ —	১২ $\frac{১}{২}$	আউশ চাল মনপ্রতি ৮ বছরের গড়
২ —	৪ —	০	অড়হর ডাল মনপ্রতি ২৩ বছরের গড়
০ —	১৩ —	১৩ $\frac{১}{২}$	খেসারির ডাল ২৩ বছরের গড়
১ —	১১ —	৪	মুগ ডাল মনপ্রতি ২৩ বছরের গড়
১ —	১ —	৪ $\frac{৩}{৪}$	কলাই-এর ডাল মনপ্রতি ২৩ বছরের গড়
০ —	১০ —	১৩ $\frac{৩}{৪}$	মটর ডাল মনপ্রতি ২৩ বছরের গড়
১ —	৪ —	১৬ $\frac{১}{২}$	মতুরির ডাল মনপ্রতি ১৯ বছরের গড়
১ —	৮ —	১২ $\frac{৩}{৪}$	বুট মনপ্রতি
১ —	৮ —	১৩	গম মনপ্রতি ২৩ বছরের গড়

উপরের বিবরণ থেকে ১৮১০ এবং ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শহরে সাধারণভাবে একই ধরনের খাদ্যশস্যের গড়মূল্য পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন সময়ে শহরে খাদ্যশস্যের গড়মূল্য

এই বিবরণ অনুযায়ী এখানে আমন চাল বিক্রি হয় মুগডাল, বুট ও গমের প্রায় $\frac{২}{৩}$ ডাল দামে এবং অড়হর ডাল অপেক্ষা প্রায় অর্ধেকেরও কম মূল্যে। বিভিন্ন বকম ডাল জাতীয় শস্যের চাষাবাদের স্বল্পতাহেতু দেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানকার দরিদ্র শ্রেণী কর্তৃক ডাল কম ব্যবহৃত হয়, এবং একমাত্র মাছের বিক্রয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অড়হর ও মুগডাল খেয়ে থাকে। খেসারি হল সমস্ত বকম উঁট জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা এবং হিন্দুগণ এটাকে বিতর্ক বলে গণ্য করেন। ধর্মের বিধান অনুসারে যাদের মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ, তাদের নিকট ডালের পরেই খেসারির ডাল খাদ্যের প্রধান উপাদান।

গমের ব্যবহার

এ জেলায় গমের ব্যবহার প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় লোকজন ও অধিক সম্পদশালী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা এখানে চাল কিছুটা দূর্মূল্য হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য—যেমন, মাছ, শাকসব্জি, লবণ ও তেল ইত্যাদির গ্রাহুকের দ্বারা সম্ভবত এ দামের পার্থক্যের কিছুটা কতিপূরণ করা হয়েছে। এ সকল দ্রব্যের কোনো কোনোটি অনেক দূরবর্তী জেলাগুলো অপেক্ষা এখানে অধিকভর সস্তা।

মাছ

সমস্ত নদী ও জলাভূমি মাছে পরিপূর্ণ, এবং বলা যেতে পারে ভাতের পরেই এটা অধিবাসীদের খাদ্যসামগ্রীর প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারা বছর শহর ও গ্রাম উভয়স্থানে বাজারগুলোতে মাছের প্রচুর সরবরাহ থাকে, এবং কয়েক মাস ধরে তারা বিশ বকমেব মাছের আমদানি করে থাকে; এবং কলকাতায় সাধারণত যে দাম হোক, তার অর্ধত অধিক দামেই এখানে তা ক্রয় করা যায়। মাছ কখনো আস্ত, কখনো টুকরো করে, আবার কখনো বা ভাণ্ডা হিসেবে বিক্রি হয়। পুঁটি হল সবচেয়ে সস্তা দামের মাছ। এক পাউন্ডের ১/২ ভাগ পুঁটি মাছ ৪০ কড়িতে বা এক পয়সার এক-চতুর্থাংশ মূল্যে বিক্রয় হয়ে থাকে। এই মূল্য এক ফার্মিং এর ১/২ অংশ অপেক্ষা কিছু বেশি।

শাকসবজির প্রাচুর্য

আবাদকৃত ও অনাবাদী উভয় বকম শাকসবজিই—মূল ও অপরিপক্ব ফল এবং এর পাতা ও ডাঁটা ইত্যাদির দুটো বিরাট শ্রেণী নিয়ে গঠিত; এসব দ্রব্যের প্রাচুর্য মাছের চেয়ে কম নয় এবং দামেব দিক থেকেও সস্তা। বাজারে ৮৩ প্রকারেরও বেশি শাকসবজি বিক্রি হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে সারা বছর ১৯ প্রকার, ৬ মাস ধরে ১৫ প্রকার, ৪ মাসের জন্য ২০ প্রকার, ৩ মাসের জন্য ২২ প্রকার, এবং ২ মাসের জন্য ৬ প্রকার শাকসবজি সংগ্রহ করা যায়। দু'বেলায় জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মরিচ, বেতুন, কচু বা মিঠা কুমড়া এক পয়সার ১/২ ভাগ বা এক ফার্মিংয়ের এক-পঞ্চমাংশ মূল্যে পাওয়া যায়।

মসলা ইত্যাদি

মসলা হিসেবে ব্যবহৃত বিবিধ উপকরণ—যেমন, তেল, লবণ, পৈয়াজ, রসুন, হলুদ ও আদা ইত্যাদি সবকিছুই প্রচুর এবং দামে সস্তা। তুলনামূলকভাবে লবণ খুব সস্তা এবং গোটা পরিবারের এর নিমিত্ত খরচও সামান্য। এই জেলায় আমদানিকৃত বীজ থেকে উৎপন্ন সরিষার তেলের দামে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং মাঝে মাঝে দুর্মূল্য হয়ে পড়ে। কিন্তু রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত নানাবিধ খাদ্যযুক্ত অন্ন ও তেঁতুলসহ অন্য সকল দ্রব্য মাঝাতিরিজ সস্তা।

লবণ ও তেলের দশ বছরের গড়মূল্য

নিম্নলিখিত বিবরণে লবণ ও তেলের দশ বছরের গড়পড়তা মূল্য পাওয়া যায় :

	ঢাকা			সিলেট			চট্টগ্রাম		
মনপ্রতি	টাকা	আনা	পয়সা	টাকা	আনা	পয়সা	টাকা	আনা	পয়সা
লবণ	৪	—	১৫	—	৫	—	২	—	২
সরিষার তেল	৭	—	১৩	—	৮	—	৮	—	৯

জ্বালানি প্রচুর এবং সস্তা

পার্ব্বতী জঙ্গল থেকে মলখাগড়া ও ঝোপ জঙ্গল ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো ছোট ছোট আঁটিতে বিক্রি হয়ে থাকে এবং মাসে এক ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানি তিন আনায় ক্রয় করা যায়। শহরগুলোতে বেশিরভাগ শ্রমিক

মাটির তৈরি রান্নাবান্নার বাসনকোসন

এখানকার মাটির তৈরি রান্নাবান্নার বাসনকোসনগুলো নিম্নমানের এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহ অপেক্ষা কিছুটা দুর্বল। হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীতলোব মধ্যে পাথরের পাতাবাটি ও দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে কাঠের বারকোণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রস্তুত করা খাদ্যসামগ্রী বিক্রি

প্রধান প্রধান খাদ্যসামগ্রী যা প্রস্তুত অবস্থায় বিক্রি করা হয়, তা হল খই, চিড়া, চিতই পিঠা, ফুলরি ও বড়া ইত্যাদি। খই তো 'তধু ধান' (তুষযুক্ত চাল) যা গরম বালুর উপর ঝলসানো হয়, এবং অতঃপর পাতলা চালুনিতে হাত দিয়ে চালা হয়, এর ফলে লসাদানা^১ থেকে তুষটা আলাদা হয়ে যায়। ওড়ের সঙ্গে মিশ্রিত খই 'মুড়কি' নামে পরিচিত। ধান থেকে চিড়া তৈরি হয়ে থাকে এবং এটা তৈরির জন্য ধান অনেককাল পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর সেই ভিজা ধান একটি মাটির পাত্রে করে ভাজা হয়; অতঃপর, তা চাপটা না হওয়া পর্যন্ত, টেকিতে কোটা হয়ে থাকে। চালে লবণমিশ্রিত অল্পস্বল্প পানি ছিটিয়ে দিয়ে এবং খইয়েব মতো একইভাবে গরম বালুতে ঝলসে নিয়ে যা তৈরি হয়, তাই 'মুড়ি' নামে পরিচিত। হিন্দুদের যখন রান্নাবান্না করার কোনো সুযোগ থাকে না, বিশেষত মাঝে মাঝে তাবা যখন মুসলমান বা বিভিন্ন বর্ণের লোকদের সঙ্গে একত্রে জলপথে ভ্রমণ করে তখন তাবা এই সকল খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য দ্রব্য যেমন, চিতই পিঠা, ফুলরি ও বড়া ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। ফুলরি হচ্ছে পিণ্ড, বসুন, সরিষাব তৈল ও লবণ ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত ঊঁড়া করা বুট বা মটর ডাল। বড়া হচ্ছে একই বকম জিনিসের সংমিশ্রিত দ্রব্য; অবশ্য এর সঙ্গে কিছু শাকসবজি, যেমন মরিচ, বেতন ইত্যাদিও মেশানো হয়। এ জাতীয় কয়েকটি খাওয়ার দ্রব্য মুদি বা শসাপাতিব ব্যবসায়ীদের দোকানে পাওয়া যায়; এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় যে দাম থাকে তা অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশি দামে ক্রয় করা যায়। উপরি উক্ত দ্রব্যগুলো ছাড়া, অধিক বায়সাধা আবো কয়েক প্রকার খাদ্যদ্রব্য যেমন, খিরসা বা নতুন পনির ইত্যাদি শহরের বাণ্ডায় বাণ্ডায় ফেরি করে বিক্রি করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে এটি একটি প্রিয় খাদ্য। ছাগলের মাংসের কাবার, কুটি, পনির ও বিভিন্ন বকমের মিষ্টান্নদ্রব্য মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে। শেবোক্তটির মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রীমণ্ডিত দ্রব্য ফলদা কেক বা পিঠা, যা চাল, চিনি, মাড় ও গোলাপ জল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয় এবং কিছুটা পাটলবর্ণ বা হলদে রঙের দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রণে তা রঞ্জিত করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে একত্রে কালুদা, পরবত ও তৈরি-পান ইত্যাদি প্রতিদিন অপরাহ্নে চকবাজারে বিক্রি হয়; সেখানে প্রস্তুত করা ইঁকাও কিনতে পাওয়া যায়।

১ তুষযুক্ত চাল বা ধানের সুমাত্রীয় নাম।

২ একপাত্রে গরম পানিতে ঝলসানো লসাদানা ইহুদিদের সাধারণ খাদ্যদ্রব্য ছিল যারো ভ্রমণ উপলক্ষে বা সহসা জরুরি অবস্থায় পথে হিন্দুদের দ্বারা খই ইত্যাদি ব্যবহার করত (Leviticus XXVIII-14) (Samuel XVII. 17 and XXV. 18)।

বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষিত ফলমূল যেমন, আনারস, লেবু, আম, আদা, ও ছাতুর মল্লিও (asparagus racemosus) শহরের বিক্রি হয়ে থাকে।

খাদ্যদ্রব্য সস্তা হওয়ার প্রধান কারণ পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্যের পরে, বাজারজাতকরণের সুযোগ-সুবিধাই হল এসব দ্রব্যের সস্তামূল্যের আর একটি কারণ। এ জেলার অধিবাসীরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জিনিসপত্র বহন করার ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং নৌবহনযোগ্য নদ-নদী বিদ্যমান থাকায় প্রজারা অত্যন্ত সামান্য খরচে ও অল্প পরিশ্রমে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

হাটবাজারের সংখ্যা

শহরের বাজারগুলো বাদে, হাট বা সাপ্তাহিক বাজারের সংখ্যা হচ্ছে ৮১। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অত্র জেলায় আবাদী অংশের ১ থেকে ১২ বর্গমাইল পরিমিত এলাকা। এসব হাট বা বাজার সপ্তাহে দুবার কি তিনবার বসে; এবং বিক্রির জন্য নিয়ে আসা দ্রব্যাদির মধ্যে মাছ ও অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, নানাবিধ কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য, দেশীয় প্রস্তুত জিনিসপত্র যেমন, চাল, বিভিন্ন রকম শস্যপাতি, গুড়, ঘি, লবণ, তেল, তামাক, হলুদ, মরিচ, আদা, পান, সুপারি, মাদুর, তুলা, লোহা, তামা ও পিতলের বাসনকোসন ইত্যাদি থাকে।

একজন মজুরের দৈনিক খোরাকির ন্যূনতম ব্যয়

একজন শ্রমিকের দৈনিক খোরাকির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন আড়াই পয়সা, কিন্তু একটি পরিবারে বা যেখানে দুই বা ততোধিক লোক একত্রে বসবাস করে, সেখানে দু পয়সার কিছু কম খরচ পড়ে। শহরে বহু হিন্দু তাঁতি আখড়ায় বসবাস করে এবং তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য দৈনিক বা মাসিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তারা বৈরাগীদেরকে দিয়ে থাকে; এর সাধারণ হার হল দৈনিক এক আনা, যার জন্য তারা দুবেলা ডাল-ভাত খেতে পায়। এ সকল আখড়া বা সন্ন্যাসাশ্রমগুলো সরাইখানার অভাব পূরণ করে থাকে এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য কৃষ্ণ-পূজারীগণ শহরে এলে তারা এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় পেয়ে যায়। এ জেলায় কোনো সরাইখানা নেই। সুতরাং যে অল্প কয়েকজন লোক স্থলপথে ভ্রমণ করে, তারা এসব আখড়া বা মুদিখানা কিংবা শস্য ব্যবসায়ীদের দোকানপাটে থাকা খাওয়ার সুযোগ পায়।

প্রাচুর্য ও অভাবের কারণ এবং ফলাফল

এই জেলায় প্রচুর ফসল উৎপাদনে যা প্রধানভাবে কাজে লাগে তা হচ্ছে পূর্ববর্তী বছরের ব্যাপক জলমগ্নতা ও শীত মৌসুমের পরিমিত বৃষ্টিপাত। এর ফলে কৃষক সহজেই তার জমি চাষ করতে সক্ষম হয়। এরপর বসন্তের মাসগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত এবং পরবর্তী সময়ে নদ-নদীতে ক্রমান্বয়ে পানি বৃদ্ধি ইত্যাদি ধান্য উৎপাদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। এই জেলার অসাধারণ প্রাচুর্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত রেকর্ডে পাওয়া যায় এবং এসব ক্ষেত্রে চালের সর্বনিম্ন মূল্য এক টাকায় ৮ মন বা ৬৪০ পাউন্ড ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত দরে চাল বিক্রয় হয়েছিল; এ সময়ে নবাব শায়েস্তা খান এরূপ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে স্বরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে শহরের

পশ্চিম দরজা নির্মাণ করেন এবং সেখানে এই মর্মে একটি নিষেধাজ্ঞা থাকে যে, চালের দর পুনরায় অনুরূপ সস্তা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত দরজা কারো খোলা উচিত হবে না। কথিত আছে, ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সরফরাজ খানের সহকারী যশবন্ত রায়ের সময়ে অনুরূপ প্রাচুর্যমণ্ডিত ফসল পুনরায় না-ফলা পর্যন্ত উক্ত দার বন্ধ থাকে। বিপুল প্রাচুর্যের মৌসুম হিসেবে ১৭৭২, ১৭৯৫, ১৭৯৬ এবং ১৭৯৭ ইত্যাদি বছরগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী বছরে ফসল এত প্রচুর ফলেছিল যে, এ জেলায় কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজারের অভাবে সবকাবি রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই সময়ে এক টাকায় আট মন চাল বিক্রয় হয়। কালেক্টর কর্তৃক উল্লিখিত হয় যে, মরিচ প্রতিমন $২ \frac{১}{২}$ থেকে ৩ টাকায় বিক্রি হত, এখন তা বাজারে নেওয়ার মতো খরচে কদাচিৎ বিক্রি হয়। প্রতিমন গুড়ের দাম ৪ টাকা থেকে ১২ আনায় নেমে আসে এবং সাধারণ ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য দ্রব্যের প্রায় প্রত্যেকটি সমান সস্তামূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। ফসল উৎপাদনের এই প্রাচুর্য থেকে যারা সর্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হয়, তারা হচ্ছে বণিক সম্প্রদায়। এরা রপ্তানির জন্য শস্য ক্রয় করে। তাদের হাতে পুঞ্জির কর্তৃত্ব থাকায়, তারা বাজারে শস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। কেননা, প্রজারা সাধারণত চড়া সুদে তাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ফলে, তারা তাদের ঋণ পরিশোধনার্থে ও জমিদারের খাজনা প্রদানের প্রয়োজনে সাধারণত ফসল কাটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মাঠের উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়; তাদেরকে এমন এক দরে বিক্রি করে দিতে হয়—যাতে খুব সামান্যই লাভ হয়ে থাকে। শহরের অধিবাসীরাও ফসলের প্রাচুর্য থেকে বেশ লাভবান হয়ে থাকে; কিন্তু খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পেলেও, জেলার অন্যান্য কৃষিজ পণ্যদ্রব্য কিংবা যে-কোনো সাধারণ শিল্পদ্রব্যের দাম কখনো কমে নি। প্রজারা যারা ঋণের জালে আবদ্ধ নয়, তারা এক বছর ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য রেখে দিয়ে, সাধারণত বাদবাকি মজুদ চাল তাদের প্রতিবেশীদেরকে ধার দিয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস, সমগ্র ভারতবর্ষে এটা একটা সাধারণ রীতি এবং নক্স (Knox) কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে যে, তাঁর সময়ে এই পদ্ধতিতে সিংহলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লাভ নেওয়া হত। প্রতিমন খাদ্যশস্যের জন্য বছর শেষে দেড় মন খাদ্য ঋণদাতাকে ফেরত দিতে হয়। মাঝে মাঝে ছ মাস অন্তে ঋণ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। শস্যের মান ও প্রকার অনুসারে সুদের হারের তারতম্য ঘটে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে পরিশোধের পদ্ধতি ও তারিখ লেনদেনের সময়ে লিখিতভাবে উল্লেখ করা থাকে।

প্লাবন ও প্রবল বৃষ্টিপাত থেকে অভাবের সূত্রপাত হয়

অপ্রাচুর্য বা অভাব প্রায়শই ব্যাপক প্লাবন থেকে কিংবা মৌসুমের প্রথমেই অত্যধিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত থেকে দেখা যায়। অতিবৃষ্টি মাঝে মাঝে আউশ ধানের বীজের বর্ধনক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং আউশ ফসলের ছোট ছোট চারা গাছের ব্যাপক ক্ষতিসাধনও করে থাকে। কয়েকটি কারণে আর্থনিক বা স্থানীয় অভাবের সৃষ্টি হয়। জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে, বিশেষত বাকেরগঞ্জে কাঁকড়া মাঝে মাঝে ধান গাছের বোঁটা বা ডগা কেটে দিয়ে আউশ ফসলের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বুজের্গ উমেদপুর পরগনা ও এর পার্শ্ববর্তী আরো সাতটি জমিদারি এলাকা এই কারণে এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে, এ জন্য সরকার কর্তৃক ৪২,২৬৪ টাকার রাজস্ব আদায় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দেশের ঐ একই অঞ্চলে একই রকমভাবে অর্ধেক পরিমাণ ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়।

আগাছাজনিত ক্ষয়ক্ষতি

জলাভূমির উপরিভাগ থেকে ভেসে আসা স্বতন্ত্র আগাছা ও জলজ উদ্ভিদ যেমন, পানা এবং হিঙ্গা মাঝে মাঝে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এগুলো অনেক সময় একত্রে ব্যাপক আকারে মাঠে ভাসতে থাকে এবং মরে না যাওয়া পর্যন্ত ফসলের গাছগুলোকে পানির নিচে ডুবিয়ে রাখে।

গুঁয়াপোকার আক্রমণ

মাজরা ও বিছাপোকা নামে পরিচিত গুঁয়াপোকার দুটো প্রজাতি ধান্য ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকারক বলে জানা যায়। পূর্বোক্ত পোকা শস্যের সারাংশ খেয়ে ফেলে, আর পরবর্তী পোকাটি গাছের পাতা খেয়ে থাকে। এক প্রকার ক্ষুদ্র কালো রঙের গুবরে পোকাও ফসলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই পোকা সাধারণত আচমকা এবং ব্যাপক আকারে দেখা দেয় ও এর গুঁড়ের সাহায্যে দুধালো রস (ক্ষীর) নিংড়ে নিয়ে শস্যদানা ধ্বংস করে ফেলে; অতঃপর ধানের খোসা বা তুষটা শুধু শূন্য ও চ্যাপটা অবস্থায় পড়ে থাকে। পঙ্গপাল বিরল এবং ফসলের ব্যাপক ধ্বংসসাধনকারী উপসর্গ হিসেবে এর নাম প্রজাদের নিকট প্রায় অজ্ঞাত।

শিলাবৃষ্টি

শিলাবৃষ্টি গ্রীষ্মকালে আউশ ও বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে; এবং এখানে শিলাবৃষ্টির এত ভয় যে, ক্ষয়ক্ষতি থেকে রায়তদের ফসলের ক্ষেতগুলো রক্ষা করবার ভান করে, একশ্রেণীর লোক চাষীদের মধ্যে জীবিকার সন্ধান পেয়ে থাকে। শূকর, হাঁদুর এবং পাখি ইত্যাদিও ফসলের ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং এ কারণে বছরের এ মৌসুমে ফসলের ক্ষেত পাহারা দেওয়াও রায়ত পরিবারের জন্য কম পরিশ্রমের ব্যাপার নয়।

অনাবৃষ্টি

অনাবৃষ্টি (মাত্রাতিরিক্ত না হলে) এখানে সাধারণভাবে অত্যধিক বৃষ্টিপাত অপেক্ষা কম ক্ষতিকারক। ১৭৬৯-৭০ সনের দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত এই কারণ থেকেই দেখা দিয়েছিল। ঢাকা জেলার বুকে পরবর্তী পর্যায়ে আসে আকস্মিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্লাবন, যার ফলে বেশিরভাগ ফসলই অকালে ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখা দেয় ভীষণ গরম ও প্রবল বাতাস। এ সময়ে বৃষ্টি হয় নি। খাল-বিল, পুকুর-নালা সব শুকিয়ে যায়, বাঁশ ও অন্যান্য গাছপালার ঘর্ষণ থেকে অনবরত বন জঙ্গলে ও গ্রামের ধারে কাছে অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে থাকে।

দুর্ভিক্ষের ফলে গরিবদের শোচনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতি

বর্ষার মৌসুমে দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে গরিব লোকেরা প্রধানত শাপলা বা জলপদ্মের বোঁটা ও জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে; অথচ যারা বেঁচেছিল তাদেরও বীজ ও বলদ থাকে নি; ফলে জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে তাদেরও সাধারণ জঙ্গলা উদ্ভিদরাজির চাষ করতে হয়। পরবর্তী বছর মি. মিডল্টন ঢাকা পরিদর্শন করেন; তাঁর রিপোর্ট থেকে অবশ্য প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহ অপেক্ষা এ অঞ্চল কিছুটা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দেশের এ অংশে অভাব সৃষ্টির কারণসমূহের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় নদ-নদীগুলোতে আকস্মিক পানি বৃদ্ধি হল বরাবরের ঘটনা। এ জেলার নিকট থেকে মেঘনার উৎস পর্যন্ত এ পথে নদী সাধারণত ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক।

১৭৮৪ সালের খাদ্যের দুস্প্রাপ্যতা এবং ১৭৮৭-১৭৮৮ সালের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এ সকল নদীর আকস্মিক পানি বৃদ্ধিজনিত কারণে সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরে মৌসুমের প্রথমেই মেঘনার পানি বৃদ্ধি ঘটে এবং আউশ ধান কাটার মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এটা এমন এক সময়ে ঘটে যখন রপ্তানির কারণে জেলার খাদ্যশস্যের ঘাটতি বিরাজ করছিল।

১৭৮৪ সালে চালের মূল্য

পূর্ববর্তী বছর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে দুর্ভিক্ষের ফলে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য দর্শনে প্রলুদ্ধ হয় রায়তগণ। তাদের ভাণ্ডারজাত ধান বিক্রি করে দেয় এবং নিজেদের ব্যবহারের জন্য তারা গ্রীষ্মকালীন ফসলের উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু তাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত ফসল বিনষ্ট হয়ে পড়ল। আকস্মিকভাবে চালের দাম বেড়ে গেল এবং এমনকি এক টাকায় ষোল সের চাল সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। এই উচ্চমূল্য অনেকটা বোরো ফসল পানির নিচে চলে যাওয়ায় এবং এই ফসলের ভাগ্য অনিশ্চিত থাকায় চাল ব্যবসায়ীগণ একমাত্র রাতের বেলায় তাদের দোকান খুলত এবং একেবারে এক ব্যক্তির নিকট এক সেরের অধিক চাল বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাল। শীতকালীন ফসলের বিপর্যয় সম্বন্ধে যখন আর কোনো সন্দেহ থাকল না, তখন অক্টোবর মাসে দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করল। এই সময়ে গরিব অধিবাসীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল ও তাদের নিজেদের আরোপিত শর্তে বাজারে খাদ্যশস্য লাভের দাবি জানাল। অবশেষে দোকানপাট লুট করার জন্য তারা অগ্রসর হল। এ সকল প্রকাশ্য বলপ্রয়োগ দমন করার জন্য কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডে বাজারগুলো রক্ষার্থে কোম্পানির সিপাই নিয়োগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরে এই নির্দেশ জারি করেন যে, যেহেতু চালপাতি বিক্রি করার জন্য কোনো নির্ধারিত মূল্য ঠিক করা নেই, সেহেতু চাল ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব শর্তে তা বিক্রি করতে পারবে এবং যে ব্যক্তি এর অন্যথা করবে সে শাস্তি পাবে। এই সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় আকস্মিক ফল পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাজারে চালের আমদানি হল এবং দুর্ভিক্ষের শুরুতে যে দাম ছিল সেই দরে অর্থাৎ টাকায় ১৭ সের চাল বিক্রি হতে লাগল।

প্লাবনে সিলেট ও ত্রিপুরা জেলার অবস্থা

এই প্লাবনের ধাক্কা সর্বাপেক্ষা মারাত্মকভাবে অনুভূত হয় সিলেট ও ত্রিপুরা জেলায়। মানুষ ও গরুসহ গ্রামগুলো ভেসে গেল এবং দুর্ভিক্ষ এত ব্যাপক আকারে দেখা দিল যে, চাউল সাধারণ মৌসুমে যেখানে টাকায় ৪ মন বা ৩২০ পাউন্ড সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল, এখন তা শহরের মতো একই দামে টাকায় ১৭ সের বিক্রি হতে লাগল। এই প্লাবনের ফলে এক শ বিশটি পরগনা ও তালুক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মি. ডে উল্লেখ করেন, “অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা অবর্ণনীয়। ক্ষয়ক্ষতি যদি শুধু তাদের ফসলের ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে তা অল্প সময়ের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হত। কিন্তু তাদের গরু-বাছুর ও সহায়-সম্পত্তি ভেসে গেছে, প্রজারা বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় লাভের আশায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; ফলে গ্রামগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কদাচিৎ কষিত জমির সন্ধান মিলছে।”

১৭৮৭-৮৮ সালের প্লাবন

১৭৮৭-৮৮ সালে এই জেলা আবার একই রকম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়, যা পূর্ববর্তী প্লাবনের প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি মারাত্মক পরিণতি বহন করে আনে।

মাঠ মাসের প্রথমেই বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং এ সময় থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা একটানা অব্যাহত থাকে। অতঃপর এ সময়ে নদ-নদীগুলোর পানির অদ্ভুত উচ্চতা পরিলক্ষিত হয় এবং সমগ্র দেশ এত ব্যাপক পরিমাণে প্রাবিত করে ফেলে যে, প্রবীণতম অধিবাসীদের কেউ কোনোদিন তা চোখে দেখে নি। ঢাকার রাস্তাগুলো, সাধারণ মৌসুমের প্রবনের সময় পার্শ্ববর্তী নদীসমূহের উচ্চতম লেভেল থেকে কয়েক ফুট উপরে থাকে; এখন তা এমনভাবে প্রাবিত হল যে, সেখানে স্বচ্ছন্দে নৌকা চালানো সম্ভব হয়ে উঠল। অন্যদিকে, সমগ্র গ্রাম-বাংলার অধিবাসীরা তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল ও কলাগাছের তৈলায় বা বাঁশের তৈরি উচ্চমঞ্চ আশ্রয় গ্রহণ করল। জেলার দক্ষিণ বিভাগে এই প্রাবনের ফল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। অধিকাংশ জায়গার প্রথম দিককার ফলন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল। মৌসুমের শুরুতে প্রবল বারিপাতের ফলে আউশ ধানের ছোট ছোট চারা গাছ বিনষ্ট হয়ে গেল এবং পরবর্তী সময়ে আমন ফসলও এর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

জেলার পরগনাসমূহের মধ্যে রাজনগর, কার্তিকপুর ও রসুলপুর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। মি. ডে নভেম্বর মাসে দেশের এই অঞ্চল পরিদর্শন করে লিখেছেন, “এ স্থানে দুঃখ-দুর্দশার একরূপ দৃশ্য চোখে পড়েছে, যা তিনি সারা জীবনে কোথাও কখনো দেখেন নি। সমগ্র ভূভাগ সম্পূর্ণরূপে প্রাবিত হয়েছে; গ্রামাঞ্চলের কোথাও চাষাবাদের সামান্য চিহ্নও পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং অধিবাসীরা পানির উপরে উচ্চমঞ্চে বসবাস করছে।” এখানে এবং পার্শ্ববর্তী পরগনাসমূহে প্রজাগণ নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যে পতিত।

দুর্ভিক্ষ

প্রচণ্ডভাবে দুর্ভিক্ষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তখন শত শত লোক প্রতিদিন খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করতেন।

১৭৮৭ সালের জুলাই মাসে শহরে খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস পেয়েছিল এবং তখন প্রাথমিক ফসলের নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা ও শীতকালীন ফসলের অসুভ সম্ভাবনার করাল ছবি চারিদিকে বিরাজ করতে শুরু করল। খাদ্যদ্রব্যের দাম সাধারণ মৌসুম অপেক্ষা শতকরা ৩০০ থেকে ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পেল। শহরের ধনী অধিবাসীরা যতটা সম্ভব শস্য সংগ্রহ ও জমা করার চেষ্টা করল এবং যে কোনো দামে তা ক্রয় করে নিল; অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা সাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে একত্রে একবারে মাত্র সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য প্রকাশ্যে বের করত। গরিবদের দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত মি. ডে সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে, বিহারের কান্টনমেন্টদেরকে ঢাকায় খাদ্যশস্য রপ্তানি করার নির্দেশ প্রদান করা হোক; এবং এই খাদ্যশস্য ক্রয়ের আসল খরচ ও পরিবহনের ব্যয়ভার পূরণ করার মতো মূল্যে বাজারে বিক্রি করা হোক। এই ধরনের একটি সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ ও খাদ্যশস্যের উপর শুদ্ধ মণ্ডকুফের দ্বারা ব্যবসায়ীদের নিকট সাধারণ আমদানির প্রতি উৎসাহবর্ধনের উপর তিনি জোর দেন ও এর দ্বারা জেলার অভাব পূরণ করতে যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ লাভের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বেঁধে দিলে কোনো ফল হবে না; বরং এ জাতীয় যে কোনো রকম হস্তক্ষেপের দরুন সাধারণ দুঃখ-দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসায়ীদের হাতে যা কিছু শুদামজাত করা রয়েছে, তাও তারা গোপন করতে প্রলুব্ধ হবে।

বিগত বছরের আমদানি করা খাদ্যদ্রব্যাদি অতীতে যে কোনো সময় অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল, তথাপি জনসাধারণের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এটা অপরিপূর্ণ ছিল। এতে ফল হল এই যে, ১৭৮৮ সাল আরম্ভ হবার পূর্বেই কয়েক হাজার লোক দুর্ভিক্ষের কবলে মৃত্যুবরণ করল। এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত কোনো সরবরাহ ঢাকাতে পাওয়া যায় নি; এ সময়ে ৭,২৫০ মন চাল ঢাকায় এসে পড়ে; কিন্তু তখন শহরে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় এবং তাতে ৭,০০০ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এর ফলে খুচরা বিক্রেতাদের বিপুল পৰিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কালেক্টর তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ১০০ জন লোক এ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারায়। দুর্ভিক্ষ এই মাসে সর্বাপেক্ষা চরম আকার ধারণ করে বলে প্রতীয়মান হয়। জেলার বহু অংশে এক টাকায় এমনকি ৪ সের চাল সংগ্রহ করাও কনট্রিং সম্ভব হত। এর পরিণতি হল এই যে, গ্রামগুলো উজাড় হয়ে গেল এবং গরিব বুড়ো হাজার হাজার মানুষ খাদ্যের সন্ধানে শহরে এসে ভিড় জমাল, এবং ধনী অধিবাসীদের নান ও স্বর্থ সম্পদের সাহায্যে যতদূর সম্ভব তাদের অভাব মিটানোর চেষ্টা করা হল। জনসাধারণের সাহায্যে প্রত্যহ ন থেকে দশ হাজার লোককে খাওয়ানো হতে লাগল; কিন্তু সকলের ক্ষুধা নিবৃত্তি নিবৃত্তি অসম্ভব হওয়ায়, বিপুলসংখ্যক নিরন্ন মানুষ রাস্তাঘাটে, শহরে ও তার আশপাশ এলাকায় মৃত্যুবরণ করল। এ সম্পর্কে মি. ডে দুঃখ করে বলেন : “এ দৃশ্য অবলোকন করা বেননাদায়ক।”

প্রাণহানির সংখ্যা

এই বিষম বিপর্যয়ের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই ভদ্রলোক কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্য থেকে জানা যায় যে, প্রাচুর্য ও পরবর্তী পর্যায়ে, দুর্ভিক্ষের সময়ে ৬০,০০০ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ইনি লিখেছেন, “রাজনগর ও কার্তিকপুরের মতো আর কোনো পরগনাই এত ভয়ানকরূপে এবং ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। অধিবাসীরা যে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছিল—সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে তা বর্ণনা করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দুর্ভিক্ষের দাবানল একরূপ প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, কয়েক হাজার বুড়ো শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যদিকে সকল পরিবার মৃত্যুর হাত থেকে বেহাই পাওয়ার জন্য তাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু অনেকে ক্ষুধা ও অসুস্থতাজনিত কারণে এত বেশি দুর্বল ও কৃশ ছিল যে, খাদ্যের সন্ধানে বেরতেই তাদের জীবন-প্রদীপ নিভে যায়।”

সন্তান বিক্রি

অন্যরা তাদের দুঃখ-দুর্দশা কিছুটা লাঘবের আশায় বুক বেঁধে ঢাকা শহরে গমন করে, এবং সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসের মুখে মাঝেরা এতদূর দুঃখ-কষ্ট ও হতাশাবশ্রাস পতিত হয় যে, সমস্ত রকম মাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়ে তারা একমুষ্টি চালের জন্য তাদের আপন সন্তানসন্ততিদের বিলিয়ে দেয়। সব রকম সাহায্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু যে হারে শহরে ক্ষুধার্ত ও নিরন্ন মানুষের মিছিল ছুটে এসেছিল তাতে সকলকে সাহায্য করার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

ফলে হাজার হাজার দুঃখী হতভাগ্য লোক শহরে ও তার আশপাশের এলাকায় শোচনীয়ভাবে মরে পড়ে থাকে। এই দুর্ভিক্ষের ফলে সহায়-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ছিল ব্যাপক। জমিদারগণ তাঁদের রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হন। এবং অসংখ্য প্রজা ও তাদের গরু বাছুর বিনষ্ট হওয়ায় বেশ কিছুকাল তাদের জমিজমা অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। কয়েকটি

পরগনা থেকে প্রায় $\frac{3}{8}$ ভাগ পরিশ্রমী অধিবাসী অদৃশ্য হয়ে যায়। এরা হয় মৃত্যুবরণ করে, অথবা অনাত্র চলে যায়, এবং এর পরিণতিস্বরূপ জমি-ক্ষেত, মাঠঘাট শিগগিরই বনে-জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে ও বন্যশূকর, বাঘ ইত্যাদির আবাসভূমিতে পরিণত হয়ে যায়।

শ্রমের মজুরি

(১৭৮৮ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষিসংক্রান্ত কার্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি)

জেলার কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের পারস্পরিক অবস্থার ক্ষেত্রে, ১৭৮৮ কে সেই সকল পরিবর্তনের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেগুলো কার্যত পরবর্তী পর্যায়ে সকল শ্রেণীর অধিবাসীদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৭৮৮ সালের পূর্বের অধিক লাভজনক পেশা তন্তুবায় ও সুতা কাটা কাজের তুলনায় জায়গাজমির চাষাবাদের কাজ অবহেলিত ছিল। কিন্তু শোচনীয় অবস্থার দরুন এ জেলা এখন দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হওয়ায় কায়িকশ্রমের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং এভাবে কৃষির প্রতি উৎসাহ বেড়ে যায়, যা বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর শুষ্ক ভারী বোঝাস্বরূপ থাকায় খাদ্যশস্যের রপ্তানির উপর শুষ্ক রহিতকরণ, আর্কট মুদ্রা বাতিলকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ বহুপূর্বেই জরুরি ছিল। জমিদারগণের সঙ্গে সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিল্পদ্রব্যের দ্রুতহ্রাস এবং বিদেশী বাজারের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য হিসেবে নীল ও কুমকুম বা জাফরান চাষের প্রবর্তন—এসব কিছুই চাষাবাদের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং কৃষি ও সাধারণ শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে।

শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি

পরপৃষ্ঠার প্রদত্ত তালিকায় ১৮০৩ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ জেলার একটি পরগনায়, শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের অনুরূপ বৃদ্ধি

একই সময়ে রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণের বেতনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত বিবরণটি এ জেলার ১৭টি এস্টেটের হিসাব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

গড়পড়তা বার্ষিক মজুরি

				১৮০৪			১৮৩৭		
ইতিমামদারগণ	...	...	...	৩১	৩	০	৪১	১০	০
মণ্ডলগণ	...	...	...	১৮	১৪	০	২৬	২	০
নায়েবগণ	...	...	...	৬৪	০	০	৭৬	০	০
পিয়ন	...	...	...	২৪	০	০	৩৬	০	০
মোহরারগণ	...	...	...	৩১	০	০	৩৪	৮	০

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস

অন্যদিকে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাসের বিষয়টা একই সময়ের ঘটনা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৮১ সালে ব্রিটেনে মসলিন বোনা শুরু হয়; আর্করাইটের কৃতস্বত্ব বা আবিষ্কৃত

কৃষিক্ষেত্রে কার্যরত শ্রমিক বা ঘরামি	বার্ষিক		মজুরি		মাঝিমাল্লা	বার্ষিক		মজুরি		ভাণ্ডারী বা গৃহভৃত্য	বার্ষিক		মজুরি
	১৮০৩	১৮৩৭	টাকা	টাকা		১৮০৩	১৮৩৭	টাকা	টাকা		১৮০৩	১৮৩৭	
১ম শ্রেণী	৮৫	৮৪			১ম শ্রেণী	২৪	২৪	২৪		১ম শ্রেণী	১২	২৪	১৮৩৭
২য় শ্রেণী	১৫	৩৬			২য় শ্রেণী	২১	৩৬	৩৬		২য় শ্রেণী	৯	১৮	১৮
৩য় শ্রেণী	১২	২৭			৩য় শ্রেণী	১৮	৩৩	৩৩		৩য় শ্রেণী	৬	১৫	১৫
					৪র্থ শ্রেণী	১৫	২৪	২৪		৪র্থ শ্রেণী	৩	১২	১২
কুলি					সাধারণ মাঝি								
১ম শ্রেণী	১২	২৭			১ম শ্রেণী	১৫	২৭	২৭		কুলি ও ভাণ্ডারীরা			
২য় শ্রেণী	১০	২১			২য় শ্রেণী	১২	২১	২১		তাদের পারিশ্রমিকের			
৩য় শ্রেণী	৯	১৬			৩য় শ্রেণী	১০	১৮	১৮		সঙ্গে খাদ্য পেয়ে থাকে			
৪র্থ শ্রেণী	৬	১২			৪র্থ শ্রেণী	৬	১২	১২					

দ্রব্য তৈরির বা বিক্রির অধিকার শেষ হওয়ায় এবং ১৭৮৫ সালে সুতাকাটা যন্ত্রে সুতা তৈরির কাজ শুরু হলে সেখানে শিল্পের এই শাখা গিগনিবই বিরাট উৎকর্ষ লাভ করে। ১৭৮১ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের সুতি-নির্মিত শিল্পদ্রব্যের মূল্য ২০,০০,০০০ পাউন্ড—থেকে ৭৫,০০,০০০ পাউন্ডে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এবং ১৭৮৫ সালে ৫,০০,০০০ খণ্ড মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় যা ভারতীয় মসলিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলে প্রতীয়মান হয়। এ সময় থেকে ঢাকার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে এখানকার সুতা বা কাঁচামালের উপর শতকরা ৭৫ ভাগের মতো অত্যধিক পবিমাণ শুষ্ক আরোপ করার সময় থেকে, ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার অনুপাতে এটা হ্রাস পেতে থাকে; এবং অবশেষে ১৮১৭ সালে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির পদ বাতিল করা হয়।

যন্ত্রে তৈরি সুতা দেশীয় সুতার স্থান দখল করে নেয়

পরবর্তীকালে ব্রিটেনের তৈরি সুতা ও বস্ত্র আমদানির ফলে এখানের সাধারণ উন্নতি আরো বেশি করে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ব্রিটেনে তৈরি করা সুতার প্রথম বড় চালান ভারতে আসে ১৮২১ সালে; কিন্তু ১৮২৮ সাল থেকেই এর প্রভাব তীব্রভাবে অম্ম জেলায় অনুভূত হতে শুরু করে। ঐ সময় থেকে এটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে দেশী সুতার স্থান দখল করে নেয় এবং এভাবে সকল শ্রেণীর অধিবাসীরা কাজ থেকে বঞ্চিত হয়; অথচ এটাই তাদেরকে একদিন ব্যাপক পরিমাণে জীবিকা অর্জনের পথের সন্ধান করে দিত।

সুন্দর সূচীকর্ম করা বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস

কাসিদা (Kussedas) নামে পরিচিত তাদের সুন্দর সূচীকর্ম করা বস্ত্রের জন্য বার্ষিক হ্রাসকৃত চাহিদার ক্ষেত্রে, আরো পরবর্তীকালে ঢাকার অধিবাসীরা আর একটি ক্ষতিগ্রস্ত বিষয় পরিচেন্ত হয়। ১৮৩৫ সালে ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের 'কাসিদা' বস্ত্র কলকাতায় বিক্রি করা হয়। ১৮৩৬ সালে বিক্রির পরিমাণ ছিল আড়াই লক্ষ টাকা, ১৮৩৭ সালে দেড় লক্ষ টাকা এবং ১৮৩৮ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকা। পোশাকের পরিবর্তনের ফলে এই হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছে। কন্সটান্টিনোপলের সুলতান ও মিসরের পাশা সাম্প্রতিককালে তাঁদের সেনাবাহিনীতে নতুন পোশাক প্রবর্তন করেন। এই সকল বস্ত্র যা এখন বসরা ও জেম্মায় রপ্তানি করা হচ্ছে, তাই এতকাল পর্যন্ত মিসর ও তুরস্কে পাঠানো হত। এসব বস্ত্র সেসব দেশের সৈন্যগণ কর্তৃক পাগড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে প্রতীয়মান হয়। ইউরোপীয়গণ কর্তৃক এই জেলায় প্রবর্তিত একমাত্র বাণিজ্য দ্রব্য এবং যা এখানকার শিল্পদ্রব্যের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করে তুলেছে বলে ধরে নেওয়া যায়—তা হল নীল ও জাফরান। ১৮০০ সাল থেকে বৈদেশিক বাজারের জন্য এ দুটি রঙের চাষ করা হচ্ছিল; কিন্তু এ দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টিগত মূল্য (এ জেলার সীমানার মধ্য থেকে লব্ধ) বছরে ৪ লাখ টাকার অনূর্ধ্ব বা ১৭৮৭ সালে ব্রিটেনের বাজারের জন্য বস্ত্রাদি ক্রয়ে নিয়োগকৃত পুঁজির এক-অষ্টমাংশ মাত্র।

কৃষিভৃত্য, দিনমজুর ও তাদের পারিশ্রমিকের হার

কৃষিকাজে নিয়োজিত ভৃত্য ও দৈনিক মজুররা নগদ টাকায় বা নগদ টাকা ও খাদ্য উভয় আকারে পারিশ্রমিক লাভ করে থাকে। চাষাবাদ করা, কাঠ ও ঘাস কাটা এবং কৃষিক্ষেত্রে আশপাশে সাধারণত কাজ করা ইত্যাদিতে নিয়োজিত প্রজারা গৃহভৃত্য, মাসিক এক টাকা

থেকে এক টাকার আট আনা পর্যন্ত পারিশ্রমিক ও খাদ্য দেয়া থাকে। অন্যান্যক ছাড়া বাকী
এক পক্ষ চরানোর কাজে নিযুক্ত থাকে, তাহলেও তাদের বয়স অনুসারে ৪, ৮ বা ১০ আনা
হায়ে বেতন দেওয়া হয়। দাতব্যসভা সাধারণত তাদের কর্তৃত্ব থাকে এক-পক্ষতন্ত্রে দেয়া
থাকে। এই হার কসদের অবস্থা ও পুষ্টির চাহিদা অনুসারে কমবেশি হয়ে থাকে এবং এই
হার সর্বনিম্ন এক-সত্তরতম এবং সর্বোচ্চ এক-চতুর্দশ হয়ে থাকে। যখনইসিহ ও হিন্দুদের
বেখানে শ্রম এই জেলা শহর অপেক্ষা সস্তা, সেখানে এক-সত্তরতম অনুপাত অনুযোজিত।
কসল কাটার মৌসুমে নিয়োজিত লোকদের একটি কিরাট সাংখ্য হচ্ছে 'মেরেসের' এবং এরা
সাধারণত পুরুষের সমান উপার্জন করে থাকে। কাজে ব্যবহারে সর্ব একজন কর্তব্য মজুর
এক দিনে ১০০ খাঁটি (পাঁজা) ধান কাটতে পারে। যখনইসিহের সর্বনিম্ন হার অনুসারে এতে
তার অংশ আসবে ১৫ সের ধান বা দু' আনা। দাতব্যস বা ধান কাটার মজুরের প্রতিদিনের
কাজের শেষে তাদের কর্তৃত্ব কসদের ভাল পেয়ে থাকে, এবং অত্যন্ত ভাল তাদের ৭ ৮
গৃহে কিংবা ঘর। ধান কাটা ছাড়াও জমির আগাছা সাফ করা, কুমকুম বা জাকফান কুল
তোলা এবং গাছ থেকে সুগারি পাড়া ইত্যাদি কাজে প্রায়শঃই বেশ কিছুসংখ্যক লোক
নিয়োজিত হয়। এর পূর্ববর্তী কাজ দুটি বিশেষভাবে গ্রীষ্মক ও হেমন্তকালে করে থাকে।
শহরে প্রায় ৩০০০ মুসলমান পরিবার আছে, যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং বাল্যশিক্ষা
পরিচালনা করে। ১৭৮৭ সালের পূর্বে বাল্যশিক্ষার সৈনিক সরকার দাতব্যস থেকে টাকা শহর
সম্পূর্ণরূপে পার্শ্ববর্তী হাটবাজারগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এই বছরের দুর্ভিক্ষের পর
মহান্ন অবস্থার পতিত কিছুসংখ্যক পরিবার শহরে আসার প্রবণ করে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা
বাজারগুলোতে খাদ্যশস্য সরকার হাতে আসে। এই শ্রেণী বা দুর্ভিক্ষের হাতের অধিক
সম্পদশালী ব্যক্তিরা চালের ব্যবসা করে এবং এ কাজে যতদূরই বৌদ্ধ সরকারের হস্তক্ষেপ করে
থাকে। এসব বৌদ্ধ তারা খাদ্যশস্য ও ভারী জিনিসপত্র পরিবহনের কাজে জড়ান থাকে।
কেউ কেউ কেতমজুর, মজুরী, নিয়ম ও ভিত্তিভাবে কাজ করে, কিন্তু অধিকাংশতক লোক
কাজমিস্তি, হোলানি ও নিমজুর হিসেবে নিয়োজিত। সাধারণত মজুরসমূহ কুল কসল ও
কুঁড়েঘরের মাটির সেতুরান তৈরি ইত্যাদি কাজ করে থাকে। খাদ্যশস্য পরিবহনকর্ম বা কুল
হাড়ানোর কাজও কেবল এই সকল পরিবারদ্বারা গ্রীষ্মকালেই করে থাকে। মূলত গ্রীষ্মক
ঠেকি চালার এবং একজন কুল হাড়ার কাজে নিয়োজিত থেকে একদিনে প্রায় দু' হান ধান
পরিবহন করতে পারে; এতে দেড় হান চাল হয়ে থাকে।

সরিষার তেল উৎপাদনের কারখানা

শহরে কয়েক বছর পূর্বে খাদ্যচালিত কুল জ্বালানি সরিষার তেলের উৎপাদন করার জন্য ও
খাদ্যশস্য তুষাকৃত করার কাজে বসানো হয়। কিন্তু তার সময়ের মধ্যে পরিবহনসমূহ সেতুরান
বে, তারা দেশীয় প্রযুক্তিকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ঠোঁট উঠতে পারেন না; ফলে
পরিবহনসমূহ পরিভ্যস্ত হয়।

দাঁড়ীমাঝি

দেশের এই অংশে দাঁড়ীমাঝিদের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু অধিকাংশ কসলিই দেশের বাইরে যায়,
কিন্তু ঢাকার মুসলমান দাঁড়ীমাঝিরা বাইরেও পছন্দ করে থাকে। এদের অনেকে দেশের অভ্যন্তরীণ
দৌ-চালনার নিয়োজিত আছে এবং এদের কেউই জাহাজে কসলান, বৌদ্ধিকতার ও
পেশাজীবনের মধ্যে থাকসামান্যিত্য চালান।

নৌকা ভাড়া '

বছরের মৌসুম অনুসারে, এ জেলার পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য ঘটে; ফসলের মৌসুমে ও নিকটবর্তী স্থানে বড় বড় মেলা চলাকালীন সময়ে এই হার সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। এখানকার নৌকা ভাড়া অবশ্য পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহ অপেক্ষা বেশ সস্তা।

সড়ক-কুলি

শহরে প্রায় ৩০০ সড়ক-কুলি আছে; পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের অধিবাসী। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রায় ১৫০ বছর ধরে এখানে বসতি শুরু করেছে। তারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং একজন সরদারের নিয়ম-নির্দেশের অধীনে প্রায় বিশ জনের এক একটি দল থাকে। এই সরদার তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাস-শেষে তাদের মধ্যে তাদের আয়-উপার্জন বণ্টন করে দেয়।

কারিগর

কারিগর শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক সারাদিন কাজ করে। পূর্বে তাঁতিরা তাদের নিজস্ব পুঁজি দিয়েই মসলিন তৈরি করত। মি. বোন্টস্ উল্লেখ করেছেন যে আলীবর্দী খানের আমলে একজন তাঁতির পক্ষে কোনো বণিকের নিকট একই সময়ে ৮০০ খণ্ড মসলিন বস্ত্র বিক্রয়ার্থে আনয়ন করা অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। বর্তমানে তারা শর্তাধীনে কাজ করে থাকে। ব্যবসায়ী বা তাদের প্রতিনিধি পাইকারদের নিকট থেকে তারা সুতা ও অগ্রিম টাকা গ্রহণ করে। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যারা দৈনিক বা মাসিক হিসাবে কাজ করে, তাদের গড়পড়তা পারিশ্রমিক হল, (নিয়মিত কার্যকালের বাইরে শর্তাধীন কাজ ব্যতিরেকে) মাসে ২ টাকা ৮ আনা। কেননা নাটাইয়ে বা কাঠিমে সুতা গুটানো এবং তাঁতের টানাপড়েন ইত্যাদি কাজে অতিরিক্ত দশ আনা উপার্জন হতে পারে। একজন তাঁতির শিক্ষাধীন ১০ বা ১২ বছর বয়সের বালক শিক্ষানবিসি কার্যে দু বছর কাটানোর পর মাসে ৪ আনা পারিশ্রমিক লাভ করে।

সাধারণত প্রতি বছরই এই হার বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে তার শিক্ষা গ্রহণের শেষ বছরে সে ১২ আনা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে সুতা কাটার কাজে সামান্যই লাভ হয়ে থাকে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সবচেয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ী সুতাকাটারগণ প্রতিদিন তাদের কাজ করে চলছে তথাপি তারা বছরে সূক্ষ্মতম সুতার ২ সিক্কার (৩৬০ খেন ওজনের বা ১৪,৪০০ গজের) অধিক সুতা তৈরি করতে পারে না; এতে সিক্কাপ্রতি ৮ টাকা হারে মাত্র ১৬ টাকা বা ৩২ শিলিং উপার্জন করা যায়। এতে এক দিনে মাত্র এক পেনির মতো সামান্য অর্থ হাতে আসে, যা কাঁচামালের মূল্যের বার শত গুণ অপেক্ষাও বেশি।

সূচীশিল্পীর পারিশ্রমিক

সূচীকর্ম বা চিকনের কাজকে শুধু একটি সাময়িক কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরা হয়। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উপার্জনের পরিমাণ সহজে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী কর্তৃক এটা নিরূপিত হয়েছে যে, উপকরণাদি ব্যতিরেকে কাসিদা বস্ত্রের সমগ্র ভাণ্ডারজাত দ্রব্যের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ, তাদের সূচীকর্মের উপর ব্যয়িত হয়। উক্ত হিসাব অনুসারে এই খাতে বিগত চার বছরে বার্ষিক ব্যয় হয়েছে ৪৭,৫০০ টাকা। এই অর্থের সবটাই শহরে ব্যয় করা হয় এবং সুতার কাজে নিয়োজিত (অনুমিত) প্রতিটি মুসলমান রমণী কর্তৃক উপার্জিত অর্থের পরিমাণ বছরে ৬ টাকার অধিক নয়। ওস্তাগর ও ওস্তাগরনী নামে পরিচিত পুরুষ ও

মেয়ে-প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সকল কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। এরা সিলমোহরকৃত কা ছাপমারা বস্ত্রাদি, রেশমি সূতা এবং অর্থ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে; এবং কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য দায়ী থাকে। এ সকল বস্ত্রের সিলমোহরকারীরা তাদের প্রস্তুত করা কাপড়চোপড়ের সংখ্যানুসারে পারিশ্রমিক লাভ করে। বিয়ুগর, চিকনদাজ ও ভবিদারগণ কর্তৃক উৎকৃষ্ট ধরনের সূচীকর্ম সম্পাদিত হয় এবং এটা শর্তাধীনে করা হয়ে থাকে। নারদিয়া ও অন্যান্য শ্রমিকেরা বস্ত্রে ছাপমারা, ভাঁজ করা ও গাঁটরি বাঁধার কাজে নিয়োজিত। এরা দৈনিক গড়পড়তা দু আনা হারে মজুরি পায়।

শুল্ককরণের খরচ

ধোপারা তাদের ধৌত করা বস্ত্রের দৈর্ঘ্য ও গুণাগুণ অনুসারে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে; এবং প্রতি ১০০ খণ্ড বস্ত্রে ৪ থেকে ১৪ টাকা পর্যন্ত এই হারের তারতম্য ঘটে। গ্রামাঞ্চলে কিছুসংখ্যক ধোপা রয়েছে। আরঙ্গ (Aurang) তৈরি করা ব্যতিরেকে, এরা নগদ অর্থ ও খাদ্যশস্য পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

শাঁখা প্রস্তুতকারী শাঁখারু

শঙ্খদ্বারা শাঁখা তৈরির কাজে তিন ধরনের লোক নিয়োজিত আছে। যারা শঙ্খকে বিভিন্ন অংশে ভেঙে পৃথক ও পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত তাদেরকে ৪২০টি শঙ্খের জন্য এক টাকা হারে মজুরি প্রদান করা হয়। এরা মাসে তিন থেকে চার টাকা উপার্জন করতে পারে। শাঁখের করাতিরা প্রতি ১০০ শঙ্খের জন্য ২ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত আয় করে। ঘর্ষণ দ্বারা মসৃণ ও চিকন করা এবং খোদাই করা ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত কর্মীদেরকে চুক্তিভিত্তিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয়ে থাকে।

গৃহভৃত্যদের মজুরি

বিগত চল্লিশ বছর পর্যন্ত গৃহভৃত্যদের বেতন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮০৮ সালে বাণিজ্যিক কারখানাতে বাহক বা শ্রমিকদেরকে মাসে ২ টাকা ৪ আনা প্রদান করা হত। সে সময়ে এই হার উচ্চহার হিসাবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে তারা ৩ টাকা ৮ আনা পর্যন্ত পেয়ে থাকে। চাটা (Chattah) বহনের কাজে স্থানীয় অধিবাসীগণ কর্তৃক নিয়োজিত হলে তারা ২ টাকা ৮ আনা হারে পারিশ্রমিক পায়। হিন্দু পরিবারে কার্যরত একজন ভাণ্ডারী ভৃত্য—যে হাট-বাজার করে, বাসনকোসন পরিষ্কার করে, পান ও ইঁক্কা সাজায় এবং নদী থেকে পানি তোলে, সে ভৃত্যও বছরে একখানা বা দুখানা কাপড় এবং আহাৰ্য ছাড়াও মাসিক এক থেকে দু টাকা পর্যন্ত মাহিনা পেয়ে থাকে। মুসলমান পরিবারে রান্নাবান্নার কাজে সাধারণত স্ত্রীলোকদেরকে নিয়োগ করা হয়। এরা আহাৰ্য, পান, তামাক, বস্ত্রাদি ছাড়াও মাসিক দশ আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত বেতন পায়। দেশীয় পরিবারের নিযুক্ত খেদমতগাররা মাসিক এক টাকা থেকে দু টাকা পর্যন্ত মজুরি পায়। গ্রামাঞ্চলে নাপিতদেরকে খাদ্যশস্য এবং শহরে নগদ অর্ধে বছরে চার টাকা হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়ে থাকে।

দরিদ্রশ্রেণী ও দাসদাসীদের অবস্থা

দরিদ্র সম্প্রদায়কে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথমে, বেকার ও ক্লগ্ন অবস্থার কারণে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি; দ্বিতীয়, আশ্রয়হীনা বিধবা ও অনাথ ছেলেমেয়ে, তৃতীয়, যারা

দৈহিকভাবে অক্ষম বা রোগব্যাধিগ্রস্ত—যেমন, খজ, অক্ষ ও কুষ্ঠ ইত্যাদি হওয়ার দরুন জীবিকা অর্জনে অসমর্থ। প্রথমোক্ত শ্রেণী প্রধানত ভূত্য, দাঁড়ীমাঝি এবং শহরের নানা ধরনের কারিগরদের নিয়ে গঠিত। রুগ্ন ও কাজ করতে অসমর্থ হলে এরা সাধারণত রৌপ্য অলঙ্কারাদি, কাপড়চোপড় বা তাম্র ও পিতলের ঘটিবাটি ইত্যাদি বন্ধক রেখে অর্থ ঋণ করে। শহরাঞ্চলে ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রায় প্রত্যেকটি লোক বন্ধকী কারবারি। মাসিক সুদের হার শতকরা আড়াই থেকে ৬ ভাগ পর্যন্ত তারতম্য ঘটে থাকে। ১৭৭০ সালে মাসপ্রতি সুদের প্রচলিত হার ছিল শতকরা ৬ টাকা ২ আনা; কিন্তু পরবর্তী সময়ে ৩ টাকা ৮ আনায় হ্রাস পায়। বর্তমানে যে সকল ক্ষেত্রে মোটা পরিমাণ অর্থ ঋণ করা হয়, সেসব ব্যাপারে সরকারি বিধিনিষেধ দ্বারা সুদের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশেষত দলিলে নিয়ন্ত্রিত হারে সুদের পরিমাণ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা নিঃসন্দেহে ঋণ-করা অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করে থাকে। ঋণচুক্তি ও সম্মতিজ্ঞাপন সাক্ষীদের সামনে সম্পন্ন হয় এবং ঋণগ্রহীতাকে সঠিকভাবে অর্থপ্রদান করা হয়ে থাকে। দলিল যথাসময়ে ফেরত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীরা অব্যাহতি পায় এবং ঋণগ্রহীতা তখন ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃত অর্থ ঋণদাতাকে ফিরিয়ে দেয়।

সঙ্ঘ বা সমিতির অভাব

অসুখবিসুখ ও দুঃখ-দুর্দশার কালে পারস্পরিক সাহায্যের নিমিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কোনোরূপ সঙ্ঘ বা সমিতির অস্তিত্ব নেই। ঋগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা, পারিশ্রমিকের হার স্থির করা ও পূজার জন্য চাঁদা প্রদান ইত্যাদি কাজের উদ্দেশ্যে তারা সমবেত হয়ে থাকে। কিন্তু বেকার অবস্থায় পরিবারবর্গ বা নিজের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত তহবিল গঠন তাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাদের অনেকেই মাঝে মাঝে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এবং খাদ্যদ্রব্য সস্তা হওয়া সত্ত্বেও তারা এবং তাদের পরিবার পরিজনরা সময় সময় দিনে একবেলার আহার জোটাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। শহরে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ডের ফলেও অনেক দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য অবস্থা দেখা দেয়। সাধারণত শীতকালেই এসব অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং প্রতি বছর গড়পড়তা তিন থেকে বার শত ঘরবাড়ি (বিশেষত কুঁড়েঘর) ভস্মীভূত হয়ে যায়। অধিকাংশ অধিবাসীরাই এসব ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে; তারা তাদের অর্থকড়ি ও অধিক মূল্যবান জিনিসপত্র হয় তাদের কুঁড়েঘরের মেঝেতে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখে কিংবা সিন্দুকে জমা রাখে এবং অগ্নিকাণ্ডের সংকেত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে আনার জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও এসব ঘটনার সময়ে বেশ কিছু পরিমাণ সহায়-সম্পত্তি চুরি হয়ে যায়। এ সকল ক্ষয়ক্ষতির বোঝা বহন ও ঘরদোর পুনর্নির্মাণের খরচপত্র করা ইত্যাদি অবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণের উপর বিরাট দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দরিদ্র

দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আশ্রয়হীন বিধবা ও অনাথরা গ্রামাঞ্চল থেকে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। পূর্বোক্তরা সুতা কেটে, আগাছা পরিষ্কার করে ও মাঠ থেকে শস্য কেটে, এবং পরবর্তীরা মাঠে গরু বাছুর চরিয়ে ও জাফরান ইত্যাদি ফুল আহরণের কাজ করে কোনোমতে জীবিকার সংস্থান করে নেয়। শহরে বিধবারা সাধারণত তাদের স্বামীদের বা গোত্রীয় কোনো ঘরে কাজ পেয়ে যায়। তাঁতিরা এদেরকে ‘কাসিদা’ বস্ত্রের আঁচলের সুতা ও গামছা বা কোমরে বাঁধবার মোটাবস্ত্র তৈরির কাজে নিয়োগ করে

থাকে। শাঁখারীরা এদেরকে শঙ্খ পরিষ্কার করানো ও সিপাইদের হারের জন্য পুঁতিতে চিহ্ন বসানো ইত্যাদি কাজে এবং লোহার কামাররা টিনের থালা-বাসন বং করানো পুতুল সজ্জিতকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিধবাদের কাজে লাগায়। এদের অনেককে হিন্দু পরিবারে পাচিকা হিসেবে নিয়োগ করে। আবার অন্যান্যরা বন-জঙ্গল ও বিলঝিল থেকে সংগ্রহ করে আনা শাকসবজি ও ফলমূল ইত্যাদি বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেয়।

মুসলমানদের মধ্যে বিধবাদেরকে ধানভাঙা ও গমভাঙার কাজে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এদের অনেকে বিভিন্ন পরিবারে কলসি দিয়ে নদী থেকে পানি সরবরাহ করে থাকে। অন্যান্যরা কাসিদা বস্ত্রে সূচীকাজ করে, ছেলেমেয়েদের জন্য টুপি ও পোশাক-পরিচ্ছদ বানায় কিংবা চক ও অন্যান্য বাজারে ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও তেলের ভাজা পিঠা ইত্যাদি বিক্রয়ের কাজের মাধ্যমে দিন গুজরান করে থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল খঞ্জ, অন্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা। এদের মধ্যে আবার কুষ্ঠরোগীদের সংখ্যাই বেশি। এরা সবাই রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে জীবিকার সন্ধান করে। বাস্তবিক এরা সকলের করুণার পাত্র এবং দান-খয়রাত পাওয়ার যোগ্য। মুঘল সরকারের আমলে খালসা বা সম্রাটের নিজস্ব মালিকানাধীন ভূসম্পত্তির আয় থেকে এই শ্রেণীর লোকদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং কিছুকাল আগেও 'লঙ্গরখানা' নামে এগুলো অব্যাহত ছিল। ১৭৬৯ সালে মি. সিকস্ এবং মুর্শিদাবাদের দেশীয় মন্ত্রীবৃন্দ কর্তৃক নির্ধারিত ঢাকা জেলার বার্ষিক খরচপত্রের দ্রব্যগুলোর মধ্যে আমরা দাতব্য বিষয়ের আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সন্ধান পাই :

	টাকা	আনা
১. গরিব লোকদের জন্য ভাতা	২,৮২৩	— ১৪
২. দেশীয় চিকিৎসা ও হাসপাতালের ব্যয়ভার, পীড়াগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্য ওষুধপত্রসহ	১,৫১৮	— ১০
৩. অন্ধ ও খঞ্জ ব্যক্তিদেরকে দেয় ভাতা	৩,৬০০	— ০
৪. কয়েক শত রকমারি লোকদের জন্য ভাতা; এসব তারা তাদের সম্রাট বা নবাবদের আদেশ-বলে পেয়ে আসছিল	৪৪৮	— ০
সর্বমোট	৮,৩৯০	— ৮

মুঘল আমলে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতাল

টেনান্ট, মিল ও অন্যান্য লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, কোম্পানি কর্তৃক এদেশ দখল না হওয়া পর্যন্ত দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য এখানে হাসপাতাল জাতীয় কোনোরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ধারণা। পঞ্চদশ শতকের প্রায় শেষদিকে, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে দরিদ্র, অসহায় ও রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রম বা আশ্রয়স্থান স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, “সমগ্র সাম্রাজ্যে সকল বড় বড় শহরে হাসপাতাল স্থাপন

করা হোক এবং এর সেবাসুশ্রুশা ও ঔষধপত্রের ব্যয়ভার খালসা^১ থেকে নির্বাহ করা হোক।” এ ছাড়াও “খালসা ভূ-সম্পত্তির মতোই জায়গীরের প্রত্যেক শহরে সে স্থানের আয়তন অনুসারে ভোজনালয় স্থাপনের নির্দেশ দান করা হয়েছিল; এসব স্থানে দরিদ্র অধিবাসীদের প্রতিপালনের জন্য এবং পরিব্রাজকদেরকে^২ আহার্য পানীয় যোগানোর নিমিত্ত প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হত।” নিঃসন্দেহে উপরি-উক্ত আদেশের বশবর্তী হয়েই ঢাকা হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রম স্থাপন করা হয়েছিল। মুঘল সরকারের প্রতি সুবিচারার্থে এটা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, এরূপে তারা দাতব্যকার্যে যে ৮,৩৯০ টাকা ৮ আনা ব্যয় করেছিলেন, তা বর্তমান সময়ে শহরের কয়েকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষা (মুঘলযুগে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত সস্তা দামের কথা বিবেচনায় রেখে) অনেক বেশি।

এই সরকারি ভাতা ছাড়াও মহররমের সময় হুসেনী দালানে এবং ঈদ উপলক্ষে জুমা মসজিদে গরিবদের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হত। কিন্তু অনুরূপ চাঁদা এখনো আদায় করা হলেও, ফরায়েজী নীতি প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে তা ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে একে বদান্যতার উৎস হিসেবে খুব সামান্যই বিবেচনা করা চলে। শহরের মুসলমান অধিবাসীরা বৃহস্পতিবার দীন-দরিদ্রদের মধ্যে দান-খয়রাত ও পাকানো নাশতা বিলিয়ে দেয়, অন্যদিকে হিন্দুরা রোববার দিনে ও চান্দ্রমাসের দ্বাদশ তারিখে ভিক্ষা প্রদান করে।

দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ

আখড়াগুলোতে এবং অনেক সম্পদশালী অধিবাসীদের গৃহে প্রত্যহ দরিদ্র লোকদের খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়। রেভারেণ্ড মি. শেফার্ডের হিতৈষী উদ্যোগের মাধ্যমে শহরে একটা দাতব্য ফান্ডের ব্যবস্থা হয়েছে এবং চার বছরেরও অধিক কাল ধরে তা চালু রয়েছে। এটা কেবল এখানে অবস্থানকারী ইউরোপীয় অধিবাসীদের দানে পরিচালিত এবং এই তহবিল থেকে গরিব লোকদের মধ্যে মাসে ৮০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা হয়ে থাকে।

দাসত্ব প্রথা বাংলার পশ্চিমাঞ্চল থেকে এখানে অধিক প্রচলিত

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো অপেক্ষা এখানে ব্যাপক পরিমাণে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে। ঘন ঘন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের জন্য সম্ভবত একটি ঘটনাই বিশেষভাবে দায়ী এবং তা হল অকস্মাৎ প্রাবনের দ্বারা সৃষ্ট দুরবস্থা। দেশের এ অঞ্চল সাধারণত উপরি-উক্ত অবস্থার অধীন। পুরুষ-ক্ৰীতদাসরা হিন্দুদের মধ্যে ভাগরী ও মুসলমানদের মধ্যে গোলাম নামে পরিচিত। মেয়ে-ক্ৰীতদাসরা প্রথমোক্তদের মধ্যে দাসীরূপে এবং পরবর্তীদের মধ্যে বাদীরূপে অভিহিত হয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান পরিবারে প্রায় সকল মেয়ে-ভৃত্যই ক্ৰীতদাসী। মুসলমানদের গৃহে এরা পাচিকা হিসেবে কাজ করে, কিন্তু হিন্দুর মধ্যে এ পদে তাদেরকে কখনো নিয়োগ করা হয় না। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র চিড়া, খই ও মুড়ি ইত্যাদি তৈরির কাজে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। পুরুষ ক্ৰীতদাসদের কৃষি শ্রমিকরূপে নিয়োজিত করা হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে তারা আগাছা সাফ করা, শস্য কাটা, মাছ

১ টেনথ রেগুলেশন অব জাহাঙ্গীর গাউউইনকৃত হিন্দি অব হিন্দুস্থান দ্রষ্টব্য।

২ গাউউইনকৃত লাইফ অব জাহাঙ্গীর।

ধরা, ঘাস কাটা ইত্যাদি নানা জাতীয় কাজ করে থাকে। হিন্দু পরিবারে তারা গৃহভৃত্য হিসেবে কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে; যেমন নদী থেকে জল তুলে আনে, ইঁক্কা ও পান সাজায় এবং বাসনকোসন, থালাবাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে। একজন ভাণ্ডারী বা গোলাম প্রায়শই প্রতিবেশী পাড়ার ছয় বা আটজন কৃতদাসীর স্বামী হয়ে থাকে। অবশ্য তার অধিকাংশ বিয়েই মিথ্যা বা ভাঁওতাবাজি; মেয়েদাসীদের মালিকরাই নিজেদের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্ক ঢাকা দেবার জন্য এসব বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা করে। একজন দাসের বিবাহ সাধারণত একজন গরিব রায়তের ন্যায় একইভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভূমিদাসের মালিক কর্তৃক এসব ব্যয়ভার বহন করা হয়। কিন্তু মিথ্যা বিয়েগুলোতে মেয়েদাসীদের মালিকগণ বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচপত্রের যোগান দেয় এবং বরকে সামান্য কিছু অর্থও প্রদান করে থাকে। বেশিরভাগ দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যে, দাসদাসীদের প্রতি তাদের প্রভুরা দয়া ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। এদের থেকে আদায়কৃত কাজকর্ম কদাচিৎ পীড়াদায়ক। সাধারণত মজুরিতে নিযুক্ত ভৃত্যকে যতটা কাজ করতে হয়, এ কাজ তার চেয়েও কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রীই তারা গ্রহণ করে থাকে এবং পান, সুপারি ও তামাক ইত্যাদি সাধারণ বিলাসদ্রব্যও তাদেরকে ভোগ করতে দেওয়া হয়। অধিকতর সম্পদশালী লোকের গৃহে যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী অবস্থায় জন্ম নিয়েছে, তাদের অনেককে পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে লিখতে পড়তে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। দাসত্ব প্রথার অধীনে আগের দিনে যেমন ছিল, ঠিক তেমনিভাবে দাস ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বর্তমানে ততটা প্রচলিত নয়; তথাপি এটা স্বীকার্য যে, এ ব্যবসা এখনো বেশ চলে। পূর্বে ভূসম্পত্তির সঙ্গে দাসদাসীদের বিক্রয় করা হত এবং হস্তান্তর বিষয়টি সাধারণত একটি স্বতন্ত্র বিক্রয় দলিলের সাহায্যে অনুমোদন করা হত।

এক একজন দাসদাসীর মূল্য

বর্তমানকালে একজন পুরুষ দাসের উর্ধ্বতম মূল্য ১৪০ টাকা এবং মেয়েদাসীদের মূল্য ১০০ টাকা। পরবর্তীদেরকে সর্বদা অল্প বয়সে বিক্রয় করে দেওয়া হয় এবং স্পষ্টত ক্রেতারাই তাদের কন্যা সন্তানদের সেবা-যত্ন করার জন্য এদেরকে ক্রয় করে। এদের অনেককে ঘৃণ্যভাবে শহরের পতিতালয়েও বিক্রয় করে দেওয়া হয়। দেশের এই অঞ্চলে অধিকাংশ দাসদাসীরা সরকার কর্তৃক তাদের রক্ষার অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এটা দাবি করে থাকে। তাদের অনেকে এভাবে মুক্তি লাভ করেছে এবং দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি গ্রামে এদের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যারা স্বাধীনতা লাভ করেছে কিংবা যারা মনিবদের পরিত্যাগ করার পথ বেছে নিয়েছে তাদের সকলের জন্য এই সম্প্রদায়গুলো একত্রে সমাবেশ হওয়ার ও আশ্রয় পাওয়ার স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সাধারণভাবে ক্রীতদাসরা 'সিং' পদবি দ্বারা পরিচিত, কিন্তু যারা লিখতে পড়তে জানে তারা তাদের মুক্তিলাভের পর কায়স্থ পদবি ধারণ করে। এ জেলায় বহু ক্রীতদাস বছরে মাত্র কয়েক মাস কিংবা কয়েক দিন কাজ করে, তথাপি বাদবাকি সময়ের জন্য তাদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়ে থাকে। এই জেলার ১৭৭৭ সালের দলিলদস্তাবেজে উল্লিখিত আছে যে, ময়মনসিংহে অবস্থিত তরফের জমিদারের ক্রীতদাসেরা একত্রে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং গোটা পরিবারকেই হত্যা করে।

একাদশ অধ্যায়

[চিকিৎসা বিষয়ক বিবরণ—রোগব্যাধি—দুর্ঘটনা—হাসপাতাল—মানবেতর
জীবজন্তুর রোগ]

রোগব্যাধি ও প্রতিকার, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি

প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত এ জেলার প্রাকৃতিক ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে দেশের এ অংশের মাটিতে উদ্ভিদরাজির বর্ধনক্রিয়া, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা প্রভৃতির এরূপ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের পক্ষে খুবই অনুকূল। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, ম্যালেরিয়ার এ বিষ সর্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে এখানে সৃষ্টি হয়, এবং রোগের সমস্ত রকম জীবাণুর মধ্যে এটি এমন একটি, যা সবচেয়ে ব্যাপক হারে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ছড়ায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমগ্র দেশেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অত্যধিক, কিন্তু কোনো কোনো স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ম্যালেরিয়া বিস্তারের পক্ষে বেশি সহায়ক। সুতরাং এই সমস্ত স্থানের একটি সঠিক ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ বিষয়ের উৎপত্তি হয়, সে সম্বন্ধে অবগত করানোর জন্য জেলার মাটির বিভিন্নতা, এবং প্রাকৃতিক গঠনের বিবরণ দান বা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

দেশের আকৃতি-প্রকৃতি চার ভাগে বিভক্ত

- ১। নিম্ন পলল-ভূমি অঞ্চল—যার সমগ্র এলাকা জল-প্রাবিত হয়ে থাকে।
- ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল-নালা ও জলাশয় দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, কৃত্রিমভাবে উচু-করা পলল স্থানসমূহ এবং আংশিক প্রাবিত স্থান।
- ৩। খাল, নালা ও জলাভূমি দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত জল-প্রাবনিক বা কাঁকরমিশ্রিত ভূভাগ এবং আংশিকভাবে প্রাবিত অঞ্চল।
- ৪। শহরাঞ্চল।

প্রথম ভাগ

বিভিন্ন চর বা বড় বড় নদীগর্ভে অবস্থিত দ্বীপগুলোসহ প্রথম ধরনের ভূভাগ অন্য সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ। জেলার উভয় ভাগে অবস্থিত ভূমির একটা বিরাট অংশ নিয়ে এটা গঠিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় অংশটি বুড়িগঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত দক্ষিণাংশের অন্তর্ভুক্ত

অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে, যেখানে এর গতিপথ ডাঙ্গা পর্যন্ত ৪০ মাইল বিস্তৃত। এ দিকটি বিভিন্ন নদ-নদীর তীরভূমি থেকে এর কেন্দ্রাঞ্চল পর্যন্ত কিছুটা ঢালু। এটি দেশের নিম্নতম সমতল ভূমি এবং নদী দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। বর্ষাকালে এখানকার বহু জায়গা ৮ থেকে ১৪ ফুট গভীরে এবং বছরেব অধিকাংশ সময় এর সমগ্র এলাকা আংশিক পরিমাণে জলমগ্ন থাকে। বিক্রমপুর পরগনার চরান বা আড়িয়াল জলা এ ধরনের একটি। জেলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এ ঝিলটির পরিধি প্রায় ১৫ মাইল। এমনকি, সবচেয়ে শুকনো মৌসুমেও এখানে পানির বেশ গভীরতা পরিলক্ষিত হয়। এটি নানাবিধ ঘাস ও নলখাগড়ার জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং একপ্রকার পাখি, কুমির, মাছ ও নানা কীটপতঙ্গের ডরা। এ এলাকার আমন ধান অটোবর ও নভেম্বর মাসে কাটা হয় এবং প্রধান ফসলটি সাধারণত এই জলাভূমির চতুর্দিকে এবং সাধারণভাবে এ ভূভাগের সব জায়গায় চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। কৃত্রিমভাবে উঁচু করা মাটির টিপির উপর গ্রামগুলো গড়ে তোলা হয়েছে এবং এ ভূভাগের উপরিভাগে এসব গ্রাম বিক্ষিপ্তভাবে বিরাজমান। জলমগ্নতার সময় গ্রামগুলোকে বেশ গভীর জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত অসংখ্য দ্বীপমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় ভাগের আকৃতি বা গঠন প্রণালীতে কৃত্রিমভাবে উঁচু করা মাটির স্থপ পরিদৃষ্ট হয়, যা এ জেলার ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে বহু গ্রাম ও শহরের অবস্থান-স্থল ছিল। এ ধরনের স্থান বিক্রমপুরে অবস্থিত রামপাল এবং সোনারগাঁওয়ের পাইনাম প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পলিমাটি দ্বারা গঠিত; এবং প্রথমোক্ত ভূভাগের ন্যায়, এগুলো প্রথমে বহু স্বতন্ত্র টিপি নিয়ে গঠিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, এসবের পরিমাণ এত বেড়েছে যে, সেগুলো এখন কৃত্রিমরূপে উঁচু করা দেশের বিস্তৃত অংশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন আকারের ১০ থেকে ২০ ফুট গভীর অসংখ্য খাল-নালা ও জলাশয় দ্বারা এ সকল স্থান বিভক্ত এবং এসব খাল-নালা ও জলাশয়গুলো কোথাও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, আবার অন্যান্য জায়গায় প্রশস্ত মাটির বাঁধের আকারে বিস্তৃত হয়েছে। বছরে কয়েক মাস এগুলো পানিতে পূর্ণ থাকে এবং জোয়ার-ভাঁটায় পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়ে খাল-নালাগুলোতে পালাক্রমে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে এবং এর কর্দমাক্ত এঁটেল মাটিসদৃশ তটভূমিসহ বহু স্বল্প গভীর খাদ দৃষ্ট হয়। উঁচুস্থানের উপরিভাগ কুঁড়েঘর ও উদ্যানরাজিতে আচ্ছাদিত এবং এর মধ্যে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বাঁশবন, আম, সুপারি, নারকেল ও হরেক রকম গাছের ঘন বন-জঙ্গল দেখা যায়। এসব বন-জঙ্গল এত নিবিড় ও ঘন যে, সতেজ ও অতিবর্ধনশীল শ্যামলিঙ্গ পল্লবরাজির অভ্যন্তরে একদিকে যেমন সূর্যালোক প্রবেশাধিকার পায় না, তেমনই অন্যদিকে উহা নিম্নস্থ খাল-নালা ও ডোবা ইত্যাদি থেকে উঠে আসা বাষ্প ও নির্গত পুতিগন্ধ আবদ্ধ করে রাখে। এভাবে উক্ত বনজঙ্গল ঠাণ্ডা, অথচ স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর ছায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করে থাকে।

তৃতীয় বা জল প্রাবনিক ভূভাগ

তৃতীয় বা জল-প্রাবনিক ভূভাগটি কিছুটা লৌহময় ও চূনের শুণবিশিষ্ট কাঁকর মাটির সমন্বয়ে গঠিত এবং এর উপরের স্তরটি ছোট ছোট উদ্ভিদ ও তৃণজন্ম ইত্যাদির আশ্রয়ে আবৃত। এ অঞ্চলটি বিভিন্ন খাল-নালায় বিভক্ত হয়ে এর কেন্দ্রস্থলে এসে প্রশস্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এসব নিম্ন সমতল ভূমির গর্ভভাগ প্রধানত প্রাবনমুখী নদীসমূহের নৈকটা অনুসারে কমবেশি নদীবাহিত পলি-মিশ্রিত শক্ত কাদা দ্বারা গঠিত এবং বেশিরভাগ এলাকা প্রচুর

বর্ধনশীল ঘাস ও ঝোপ-জঙ্গল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। উচু কাঁকর মাটি অঞ্চল ও ঝোপঝাড়ো আচ্ছন্ন এবং অভ্যন্তর ভাগের বনাঞ্চল বিরাট বিরাট বৃক্ষ সমাকীর্ণ। কুম্ভকারের মৃত্তিকাসদৃশ শোষণ পদার্থ বিদ্যমান থাকায়, এ ভূভাগের মাটি পললভূমি অপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের জন্য আর্দ্রতা ধরে রাখতে সক্ষম। এখানে বর্ষার সমাপ্তিতে ও শীতকালে ভারী কুয়াশা দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ ভাগ বা শহরাঞ্চল

শহর ও শহরতলির প্রাকৃতিক গঠন প্রণালী অনেকটা পূর্বস্থিত অঞ্চলের ন্যায় একই রকম উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বলা যেতে পারে। পূর্বদিকে বিস্তৃত পলি সন্নিবিষ্ট সমতল ভূমি এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘন বৃক্ষরাজি ও ঝোপঝাড়বিশিষ্ট জঙ্গল অঞ্চল অবস্থিত এবং খালনালা ও ভালাভূমির দ্বারা নানা অংশে বিভক্ত, যা বর্ষাসমাগমে জলমগ্ন থাকে এবং বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এর ফলে, বর্ষাকালে শহরটি সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত হয়ে পড়ে। লাল কাঁকর মৃত্তিকার উপর শহরটি নির্মিত এবং এর নদীর দিকটি নদী প্রবাহিত তলানি বা পলিমাটিতে আবৃত। কিন্তু উত্তরে ক্যান্টনমেন্ট বরাবর ধরাপৃষ্ঠ অনাবৃত। ধোলাইখালের একটি শাখা শহরটিকে বিভক্ত করেছে এবং তা থেকে প্রচুর শাখা-প্রশাখা বের হয়ে বিভিন্নদিকে প্রবেশপূর্বক অবশেষে চতুর্দিকস্থ খাল-নালায় সঞ্চে মিলিত হয়েছে। বর্ষার মৌসুমে এগুলো বেশ কিছুটা গভীর ও প্রশস্ত হয় এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট জলপূর্ণ গর্ত বা দিঘির রূপ ধারণ করে। অবশ্য শুকনোর দিনে, উক্ত নালা প্রস্থে অনূর্ধ্ব ১৫ ফুটের একটি খালে পরিণত হয় এবং একমাত্র ভরা জোয়ারের সময় ছোট ছোট নৌকা চলাচলের উপযোগী হয়। শহরের অভ্যন্তরভাগ অসংখ্য কূপে পরিপূর্ণ; এগুলো থেকে পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরের ভিটি ও দেওয়াল নির্মাণ করতে মাটি খনন করা হয়েছিল। অধিকাংশ গর্তের গভীরতা ১৫ থেকে ৩০ ফুট এবং এক একটি ৫০ থেকে ৫০০ ফুট পর্যন্ত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এ ধরনের অনেকগুলো কূপ বিভিন্ন খালে রূপান্তরিত হয়ে ধোলাইখালের কেন্দ্রীয় শাখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী এলাকার ময়লা আবর্জনা, শাকসবজির খোসা এবং মরা জীবজন্তু ইত্যাদি স্তুপীকৃত করার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কিছুসংখ্যক সারা বছর পানি থাকে, কিন্তু অধিকাংশই এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আংশিকভাবে পানিপূর্ণ থাকে এবং ঐ সময়ে এ সকল কূপ ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উৎপত্তিস্থলে পরিণত হয়।

সমাধি

মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই শহরের অভ্যন্তরে, তাদের বাসগৃহের সন্নিহিতে বা সংলগ্ন স্থানে মৃতদেহ কবরস্থ করে থাকে। কবরগুলো কদাচিৎ সাড়ে চার ফুট অপেক্ষা অধিক গভীর হয়। ফরায়েজীগণ সমাধির স্থান স্মরণীয় বা চিহ্নিত করে রাখার জন্য, কখনো মাটির উচু মঞ্চ তৈরি করে না এবং মৃতকে কবরস্থ করার কিছুকালের মধ্যেই তারা সাধারণত এসব কবরের উপর বাড়িঘরও তুলে থাকে। এখানকার কিছুসংখ্যক মুসলমান গোরস্থান শহরের পশ্চিম দিক জঙ্গলে অবস্থিত। এ স্থানের কবরগুলো প্রায় ৬ ফুট গভীর করে খনন করা হয়ে থাকে; দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যারা কফিন বা শবাধারের খরচপাতি বহন করতে অক্ষম, তারা বাঁশের তৈরি কাঠামো শবের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দেয়; কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও শৃগাল ইত্যাদি মাঝে মাঝে শবদেহ কবর খুঁড়ে বের করে ফেলে।

চিতা

হিন্দুগণ শহরের সন্নিহিতে শবদেহ পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু অধিকতর দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে কোনোরূপ চিতা তৈরি করা হয় না; তারা শবদেহ নদীতে ফেলে দেয়।

ম্যালেরিয়া রোগের কারণসমূহ

যে সমস্ত নদনদী সব কটি অঞ্চলের নিম্নাঞ্চল প্রাণিত করে, সেগুলো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গা নদীর শাখা-প্রশাখা। মে মাসে এসব নদনদীতে সর্বনিম্ন উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় যে, ঐ সময়ের পূর্বে কয়েক সপ্তাহব্যাপী, আংশিক পরিমাণে জলপূর্ণ হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, বছরের অধিকাংশ সময় বহু স্থান শুষ্ক অবস্থা থেকে স্রোতস্রোতে অবস্থার দিকে পরিবর্তনের মুখে সন্ধিক্ষণের পর্যায়ে থাকে। এটা বেশি করে ঘটে, যখন মৌসুমের প্রথম দিকেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, কিংবা হ্রদ নদীর স্রোতে বাধা সৃষ্টি করে প্রবলভাবে বাতাস বইতে থাকে। এভাবে পশ্চাদিকে প্রবাহ ঘটায়, অথবা সেখানেই ইতোমধ্যে জমে থাকা পানির বহির্গমন পথে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ মৌসুমে ইতঃপূর্বের যে বারিপাতই হয়ে থাক না কেন, প্রথমোক্ত বিভাগের কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ জুনের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে পানিতে ভরে যায় এবং সাধারণত জুলাইয়ের দশ তারিখের মধ্যে, দেশের বিপুল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রাবনের (জেলার আয়তনের প্রায় $\frac{2}{3}$ ভাগ পরিমিত জায়গা) মুখে পড়ে, এবং ২ থেকে ১৪ ফুট গভীর পানিতে ডুবে যায়। এই সময়ে ভুলেস্থলে অতিবর্ধনশীল উদ্ভিদরাজির চূড়ান্ত প্রাচুর্য চোখে পড়ে এবং সমগ্র দেশ একটা বৃহৎ বিস্তৃত সতেজ-শ্যামল মাঠের রূপ পরিগ্রহ করে। পানির মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে ধানের চারাগুলো আশ্চর্য ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বর্ধিত হয়ে পানির ওপরে উঠে আসে; অন্যদিকে অনুরূপ বর্ধনশীল, হালকা ও কমণীয় কমল, কম্বুজ ও শিঙ্গরের প্রশস্ত পাতা ও সুশোভিত রঙিন পুষ্পরাজি পানির ওপরে ভাসতে থাকে। জলাভূমির উপরিভাগে প্রচুর পানি ও অন্য জলজ উদ্ভিদরাজির সমন্বয়ে একটি নিবিড় ঘন উদ্ভিজ্জ গালিচার মতো সৃষ্টি হয় এবং তা শত সহস্র কীটপতঙ্গের আশ্রয়স্থল ও সুন্দর ইকানা (iacana) এবং হরেক রকম পালকশোভিত পাখির নিবাসে পরিণত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষাংশে সময় না-আসা পর্যন্ত পানির উচ্চতায় কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ব্যতিরেকে দেশের এরূপ প্রাণিত অবস্থা অব্যাহত থাকে। অতঃপর বন্যার পানি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং নদ-নদীর উচ্চতা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কেন্দ্রাঞ্চল থেকে পানি নিষ্কাশিত হয়ে যেতে থাকে। ধানক্ষেতের পানি সাধারণত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে জলাভূমির পানিতে দেখা দেয় কালো রং। এটা বিশেষ করে জেলার উত্তর ভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানে, বিশেষত, শহরের কাছাকাছি অবস্থিত খাল-নালা ইত্যাদির নির্গত পানি রঙের দিক থেকে দেখতে চায়ের তরল কৃষ্ণের বা তলানির অনুরূপ। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে বিলঝিলে উদ্ভিদ ধারক পদার্থসমূহের উপর মাটির লৌহজাতীয় দ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়া। এর ফলে, বিশেষত, পাকস্থলীতে অসুস্থতার আকারে পীড়া দেখা দিতে শুরু করে, এবং শহরের স্থানীয় অধিবাসীরা এর জন্য একান্তভাবে বুড়িগঙ্গার পানির সংমিশ্রণকেই দায়ী করে থাকে। অতঃপর বিভিন্ন জায়গার পানি বের হতে শুরু করে এবং স্রোত যত ক্ষীণ হয়ে আসে, পানির রং ততই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করতে থাকে। অবশেষে ধানগাছ ও অন্য জলজ উদ্ভিদ, আগাছা ইত্যাদি মাটিতে পড়ে গিয়ে সংযুক্ত জড়ো স্তূপে পরিণত হয় এবং শেষোক্ত বস্তু থেকে উৎকট দুর্গন্ধ নির্গত হয়, যা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরের জন্য দেয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের শেষ অবধি ম্যালেরিয়া রোগ

ব্যাপক আকারে বিরাজ করতে থাকে। এ সময়ে পচা গলা নানা বস্তু, বা দুর্গন্ধযুক্ত কাদা পানি ও মরা উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা ইত্যাদি—এ রোগের উৎপত্তির পক্ষে অতিরিক্ত অভিসম্পাতরূপে দেখা দেয়। অতঃপর, আর্দ্রতার সঙ্গে মাটির সম্পৃক্তির ফলে এবং তা পচনশীল ও ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থের ঘনস্তর দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ায়, এ সময়ে একটি নিস্তর আবহাওয়া বা গুমট পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা জলাভূমি, বিলঝিল ইত্যাদির গলিত পদার্থ থেকে নির্গত দূষিত বাষ্পাদি ছড়ানোর কাজে ব্যাপক পরিমাণে সাহায্য করে। সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময়, মাঝামাঝি ধরনের ঝড় বা ঝড়ো আবহাওয়ার কিছু সময় পূর্ব থেকে, বাতাস হালকা ও পরিবর্তনশীল হয় এবং বছরের অন্য যে-কোনো সময় অপেক্ষা অধিক শান্ত থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। দিনের বেলা আকাশ সাধারণত মেঘমুক্ত থাকে, উত্তাপ প্রচণ্ড হয় এবং ক্ষিপ্ততার সঙ্গে মাটিস্থ পানির বাষ্পীভবন শুরু হয়। অন্যদিকে, ঘনীভূত বাষ্প থেকে সৃষ্ট প্রচুর শিশিরকণা রাতের বেলায় ঝরতে থাকে; ফলে রাতিকাল কুয়াশাচ্ছন্ন ও অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা হয়। এসব কিছুর ফলে, অন্যান্য সময় অপেক্ষা তখন এমন একটি মুহূর্তের সৃষ্টি হয় যখন ম্যালেরিয়া তার প্রচণ্ডতম শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে ক্রিয়া করতে থাকে।

সোনারগঞ্জ ও ভাওয়াল অস্বাস্থ্যকর স্থান

চারটি ভূভাগ বা অঞ্চলে বিভক্ত করা জেলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূভাগদ্বয় সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। বিশেষ করে সোনারগঞ্জ ও ভাওয়াল—এ জায়গা দুটিতে ম্যালেরিয়া থেকে উদ্ভূত রোগব্যাধি চরম আকারে দেখা দেয়। বললে অত্যাুক্তি হবে না যে, এসব স্থানের অধিবাসীরা অনবরত জ্বরের কবলে জীবন যাপন করে চলেছে। এখানে সর্বপ্রকার পালাজ্বর বা কম্পজ্বর সারা বছর বিরাজ করে; এবং এর ফলে এখানে প্লীহার নানাবিধ সম্প্রসারণের পরিণাম ও পাকস্থলীস্থ নাড়িভূঁড়ির দীর্ঘস্থায়ী পীড়ার প্রাদুর্ভাব জেলার যে কোনো স্থান অপেক্ষা অনেক বেশি। মেঘনার পূর্বতীরে অবস্থিত ত্রিপুরা জেলার গুবাকবুঞ্জ ইত্যাদিতে এই একই রকম ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, যা সোনারগঞ্জ ও ভাওয়াল অপেক্ষা আরো অধিক অস্বাস্থ্যকর। এখানে গুবাক তরুর সারি একত্রে এত বেশি ঘন সন্নিবিষ্ট করে রোপণ করা হয় যে, তাদের উপরিস্থিত ঘন-পল্লবরাজির সৃষ্ট আচ্ছাদন ভেদ করে সূর্যালোক কখনো মাটি স্পর্শ করতে পারে না। এ বৃহৎ বিস্তৃত অঞ্চলের সর্বত্র ভূমিভাগ আংশিকভাবে অর্ধ-বর্ষব্যাপী জোয়ারের সময় প্রাবিত হয়ে থাকে এবং তা ম্যালেরিয়া রোগের একটি উর্বর উৎসরূপে পরিগণিত হয়। ম্যালেরিয়া এখানে চরম আকারে কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকার জলবায়ুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; তাদের পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট চোখের মৃতবৎ বিবর্ণ দৃষ্টি, শরীরের অংশবিশেষে ক্ষীতি ও কোঁচকানো দুর্বল হাঁটাচলা, বিষাক্ত আবহাওয়ায় তাদের শ্বাসনিশ্বাস ফেলা ইত্যাদি থেকে অনুমান করা চলে যে, কত শিগগির তারা ম্যালেরিয়ার সার্বগ্রাসী বিষবৎ ছোবলের নিকট পরাজয় বরণ করে।

ধান্যক্ষেত্র বিশেষভাবে অস্বাস্থ্যকর

ধান্যভূমিগুলোকে কয়েকটি দেশে, যেমন, রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা করা হয়; ফলত সেখানে এ জাতীয় খাদ্যশস্যের ফলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ জাতীয় উৎসগুলো থেকে উদ্ভূত রোগব্যাধি প্রধানত আড়িয়াল বা চড়ান জলাভূমির নিকটস্থ জায়গায় পরিলক্ষিত হয়, যেখানে ভূভাগটি নিচু এবং সাধারণত প্রাবনের সময় নিমজ্জিত হওয়ায় আমন ধানের

ফসল সিন্ধু অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে থাকে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন মাঠ থেকে উত্তম বাষ্প উঠিত হয় তখন এখানে ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং অধিবাসীদের ভাষায়—জ্বর ও চক্ষুপ্রদাহ বা চোখ ওঠা রোগের উৎপত্তি ঘটায়। সম্ভবত ধানের চাষাবাদ অপেক্ষা, পতিত ও জঙ্গল ভূমি আবাদ করার বা ভাঙার সময় রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটে। মি. কাসান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারণভূমি পরিষ্কার করার দরুন সৃষ্ট কয়েকটি সাংঘাতিক ধরনের পীড়ার কথা উল্লেখ করেন। অধুনা একটি ঘটনা মি. ল্যাম্বের গোচরীভূত হয়েছে, যাতে কিছুটা একই রকমের কাজে অনুরূপ বিপদ ঘটতে দেখা গেছে। বেশকিছুকাল যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় এখন তা জঙ্গলে ভরে উঠছে। এরূপ একটি গ্রাম পরিষ্কার করাতে, ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি পার্শ্ববর্তী এককয় তাঁর কৃষকদের একটিতে ৩০টি রায়ত পরিবারের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এপ্রিল মাস শেষ হওয়ার আগেই জ্বরে ও কলেরায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়; ফলে তিনি উক্ত স্থান পরিত্যক্ত করে চলে যেতে বাধ্য হন।

সন্নিহিত পাট ও শণ পচানো পুকুর অনেক সময় জ্বরের কারণ

গ্রামের সন্নিহিতে পুকুরের পানিতে শণ ও পাট ভুবিয়া পচানো ও সম্ভবত জ্বরের অন্যতম কারণ হওয়া বিচিত্র ঘটনা নয়। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে একজন ইটরোপীয় ভ্রমণকারকে আমার ব্যক্তিগতভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি এ ধরনের একটি কূপের নিকটই তাঁর ফেলে বাস করছিলেন এবং তাঁর যকৃতে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চারণ সহ তরলক ক্ষতিকারক অবিরাম জ্বরের একটি ঘটনা ঘটে—যা নিঃসন্দেহে ঐ কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। শণ বা দড়ির সাহায্যে পদমর্যাদাসূচক দণ্ড প্রস্তুতের সময়, এর অস্বাস্থ্যকর বিষয় অনুমান করে উক্ত কার্য পরিত্যক্ত হয়, এবং নেপোলিয়ান সরকার নেপালের সন্নিহিত এই দুবোয় সকল উৎপাদককে, শহর থেকে কিছুটা দূরে নির্দিষ্ট করা একটা ছোট নিষিদ্ধ উক্ত শণ বা পাট গাছ পচাতে বাধ্য করেন।

নীল গাছ পচানো

শণের মতোই প্রায় সমান ক্ষতিকারক মনে করা হলেও আমি যতটা জানি তাতে নীল গাছ পানিতে পচানো ততটা অস্বাস্থ্যকর নয় কিংবা এ কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের জন্যও বিশেষ ক্ষতিকারক নয়। জেলার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থান হচ্ছে বিভিন্ন চর ও নদী তীরভাগে। ম্যালেরিয়া থেকে এসব স্থানের তুলনামূলক অব্যাহতি লাভ থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা হয় যে, অনবরত বায়ু চলাচলের দরুনই এরূপ ব্যতিক্রম ঘটে; নদনদীর বাতুলো স্পর্শ বা পরিপাক করে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং এরূপ পার্শ্ববর্তী স্থানে বিষ জাতীয় কোনো কিছু জমে বা আটকে থাকলে তা বাতাসে সরিয়ে ফেলে; ফলে, ম্যালেরিয়া বাধ্যপ্রাপ্ত হয়।

বদ্ধ পানি ব্যবহার ও পান করা রোগব্যাধির বড় উৎস

ম্যালেরিয়ার পরেই বদ্ধ পানির ব্যবহার ও পান করা সম্ভবত এ জেলার রোগ-ব্যাধির সবচেয়ে বড় উৎস। যে সমস্ত অধিবাসী স্রোতস্বিনী নদী থেকে কিছুটা দূরে বসবাস করে, তারা নিঃসন্দেহে রান্নাবান্না ও খাওয়ার জন্য কিল বা জলার পানি ব্যবহার করে থাকে। শহর ব্যতিরেকে কূপের সন্ধান কদাচিৎ মেলে। এর উত্তরাংশ ও শহরতলিতে যেখানে কাঁকরখাটি পলি মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত নয়, সেখানে ১৮ থেকে ২২ ফুট গভীরে বেশ ভালো পানির সন্ধান

পাওয়া যায়। কিন্তু শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালটির দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত কূপসমূহের পানি সাধারণত নিকৃষ্ট ও অরুচিকর। কারণ এতে নিকটবর্তী অসংখ্য বেসিন বা গর্ত, নর্দমা ইত্যাদি থেকে তরল আকারের পলিজ মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে চ্যুয়ানো-পচনশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত পশুপাখি, নানাবিধ শাকসবজির পরিত্যক্ত অংশ ও পচাগলা উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি মিশ্রিত চরম দূষিত পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে বলে প্রতীয়মান হয়। বর্ষাকাল ব্যতিরেকে শহরের এ অংশে কেউই কূপের পানি ব্যবহার করে না। ঐ সময় এসব কূপের পাড় প্রাণিত করে নদীর পানি ঢুকে পড়ে; ফলে খাল-নালার মধ্য দিয়ে অবাধে প্রবাহিত স্রোতধারার সঙ্গে শহরের অভ্যন্তরের বহু দূষিত পদার্থ, ময়লা আবর্জনা ভেসে যায়। অধিকাংশ ইউরোপীয় ও স্থানীয় সম্পদশালী অধিবাসী অতীতে বহু বছর যাবৎ শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। স্থানীয় লোকেরা উদরাময়, প্লীহা ও শ্লীপদ বা গোদের সম্প্রসারণ ইত্যাদিজনিত রোগব্যাধির জন্য বদ্ধ জলাভূমির পানির ব্যবহারকেই দায়ী করে থাকে। মনে হয়, যে সমস্ত জায়গায় পানীয় হিসেবে এরূপ পানির ব্যবহার হয়, সে সমস্ত এলাকায় ঐ সব রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। কিন্তু ব্যাধির কারণ ও এর ফলাফলের ক্ষেত্রে একই প্রকার ঘটনা ঘটে কি না, তা অবশ্য নির্ণয় করা সহজ নয়।

রোগব্যাধির কয়েকটি সাধারণ উপসর্গ

রোগব্যাধির অন্য কয়েকটি সাধারণ উপসর্গ হল নতুন চাল ও অপরিপক্ব শাকসবজি গ্রহণ এবং শীতকালের উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণ কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্রের অভাব ইত্যাদি। বৃষ্টির মৌসুম শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আউশ বা গ্রীষ্মকালীন ফসল কাটা হয় এবং নিয়মমাফিক না শুকিয়েই অনেক সময় গরিব শ্রেণীর লোকেরা উক্ত খাদ্যশস্য ব্যবহার করে থাকে। এ অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ খুবই অপাচ্য এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত নানাবিধ রোগব্যাধির পক্ষে উত্তেজক ও পূর্ব লক্ষণ। নানা ধরনের অপরিপক্ব শাকসবজি, যেমন অরণ্য, জঙ্গল ও বিলস্থিত কয়েকটি প্রজাতি যা এ সময়ে বাজারে বিক্রয় হয় এবং কয়েক প্রকার মৎস্য যেমন, বোয়াল ইত্যাদি নাড়িভুঁড়িতে পীড়ার সৃষ্টি করে ও অন্ত্রকীটের জন্য দেয় বলে প্রতীয়মান হয়। এই জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব এখানে সাধারণ ঘটনা। অত্যধিক দরিদ্র শ্রেণীর খুব কম লোকই শীতের মাসগুলোতে স্নাতসেঁতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাপড়চোপড় বা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে। কেবল ধনী অধিবাসীরা কম্বল ও তুলার তৈরি লেপ ব্যবহার করে। দরিদ্র ব্যক্তির একমাত্র আচ্ছাদন পুরোনো বস্ত্র ও তালি দেওয়া শতছিন্ন কাপড়চোপড়ের তৈরি কাঁথা বা কম্বল এবং এর সঙ্গে থাকে শিমূল তুলা ভরা একটি তৈলাক্ত বালিশ ও একটি মাদুর বা বিছানোর জন্য কিছু খড়কুটা ইত্যাদি। মোটামুটি এই হল তার সম্পূর্ণ বিছানাপত্র।

১৭৮১ সালের মহামারী

দেশের এ অংশে মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জেলার দলিলপত্রে আমি দুটি ঘটনার সন্ধান পেয়েছি। কোনো রোগের বর্ণনা ব্যতিরেকেই, ১৭৮১ সালে একটি সাংঘাতিক ধরনের পীড়ার প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে কলকাতার বেশ কিছু পরিমাণ লোক প্রাণ হারায়; এবং সেপ্টেম্বর মাসে সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট মি. লিভসে লেখেন, “বর্তমানে সিলেটে মহামারী চরম আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। জমিদার ও নায়েবদের অনেকে এ মহামারীর কবলে প্রাণ হারিয়েছেন এবং বাদবাকিরা একত্রে শহর ছেড়ে চলে গেছেন।”

১৭৯৭ সাল

১৭৯৭ সালে কালেক্টর তাঁর একটি রিপোর্টে বর্ণনা প্রসঙ্গে বাকেরগঞ্জের একটি পদগনায় রোগব্যাধি ও মৃত্যু সংখ্যার উল্লেখ করে বলেন, “সন্মতিক্রম চান ব্যবসার্যাব এক বাড়িতেই এগার দিনে ১৭ জন লোক প্রাণ হারিয়েছে। আমি যে হিসাব পেয়েছি তা থেকে অনুমিত হয় যে, এ মহামারী ইতিমধ্যে চার থেকে পাঁচ শ লোকের জীবন কেড়ে নিয়েছে যা এখনো অবদমিত হয় নি।”

১৮১৭ সালের কলেরা মহামারী

১৮১৭ সালে সম্ভবত কলেরা মহামারী একই সময়ে এ জেলা, যশোর ও নাটোরে দেখা দেয়। এখানে এর প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে সোনারগঞ্জ পদগনায়। কিন্তু এ সময়ে কিংবা পরবর্তী সময়েও, আমি এর ধ্বংসের ব্যাপকতা সম্পর্কে কোনো সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হই নি। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও এই ব্যাপকতা একটি অনির্দিষ্ট বিরতিতে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে চলেছে; সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য এর নিম্ন কিছটা হ্রাস পেয়েছে এবং পূর্বাশ্রয় এখান এসব ব্যাধির প্রকোপ কিছুটা কম। দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের সামরিক হাসপাতালে প্রায় ৩০ জন গোলন্দাজ সৈনিকের একটি ক্ষুদ্র দলসহ ১৮২৮ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ রকম ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮। ১৮২৫ সালে কলেরা মহামারীতে শহরে ৪২৭ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে।

সবিরাম জ্বর

দেশের এ অংশে সবিরাম জ্বরের (Intermittent fever) প্রাদুর্ভাব একটি সাধারণ ঘটনা। বিশেষত বর্ষা ঋতুর শুরুতে ও সমাপ্তিতে এ রোগ দেখা দেয় এবং একবার এ ব্যাধি প্রশ্রয় পেলে তা চন্দ্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ফিরে ফিরে আসে। অবিরাম জ্বরও (Remittent fever) সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আবির্ভূত হয় এবং সমগ্র শীতকালে অব্যাহত থাকে। তখন প্রায়শই শরীরের স্থানবিশেষে অস্বাভাবিক রক্ত-সঞ্চয়ের আকার ধারণ করে ও মাঝে মাঝে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়।

গোদ ও গলগণ্ড

সবিরাম ও অবিরাম জ্বরের পরেই ব্যাপক আঞ্চলিক রোগ হল গোদ ও গলগণ্ড। পূর্বোক্তটি এখানে বিশেষভাবে শহরের উপকণ্ঠে ও বিক্রমপুরের আড়িয়াল জলাভূমির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দেখা যায়। ব্যাধিটি শরীরের বিভিন্ন অংশে, যেমন, নিম্নাংশে অণ্ডকোষে ও মাঝে মাঝে বাহ্যিকভাবেও পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে যে জ্বর দেখা দেয়, তার নাম সাউজহার (Sawjhar)। এ জ্বরের শুরুতে শরীরে ভীষণ কাঁপুনি দিয়ে হঠাৎ শীত অনুভূত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সঙ্গে পিত্তাধিক্যজনিত বমন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চন্দ্রের পরিবর্তনের সময়ে এ রোগের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণত জ্বরের তীব্রতা ও সময়ের পরিধি যতটা হ্রাস পেতে থাকে ততই প্রতিটি রোগাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ফোলাও বেড়ে যায়।

গলগণ্ড

জেলার উত্তর বিভাগে, বিশেষত, শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার তীরভূমি অঞ্চলে এবং ময়মনসিংহের যমুনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ বিভাগের

বিক্রমপুর ও রাজনগর এলাকায়ও এ রোগের অস্তিত্ব কম নয়। দেশের এ অংশে অবস্থিত দুটি থানাধীন ১০৬টি গ্রামের মধ্যে উত্তর ভাগের অন্তর্গত ৭২টি গ্রামে এবং ধলেশ্বরী ও মেঘনার দক্ষিণে ২৭টিতে গোদ ও গলগণ্ড উভয় ব্যাধির সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত বানার ও লক্ষ্যার নদীগর্ভের ন্যায়, চুনের গুণবিশিষ্ট ও কাঁকরমিশ্রিত খাতের উপর দিয়ে প্রবহমান ব্রহ্মপুত্রের পানি থেকে গোদের উদ্ভব হয়ে থাকে। তথাপি যে স্থানগুলোতে রোগটি প্রায়ই দেখা দেয় তার প্রকৃতি বিচার করে এই কারণ অপেক্ষা, বরং এটাকে ম্যালেরিয়া জাতীয় রোগের কারণ বলেই মনে হয়। বেশিরভাগ দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, গ্রামগুলোতেই এর প্রাদুর্ভাব ঘটে; এসব স্থান স্রোতস্বিনী নদী থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত, এখানকার অধিবাসীরা বদ্ধ পানি ব্যবহার করে থাকে এবং উক্ত স্থানসমূহ ম্যালেরিয়ার উর্বর উৎস। গলগণ্ড পৃতিগন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি এ অভিমত এখন ইউরোপে বেশ ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি, যা অধুনা আমার পর্যবেক্ষণের আওতায় এসেছে এবং তাতে বহুল পরিমাণে উক্ত অভিমত সমর্থিত হয়। ঘটনাটি ছিল তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের। এদের একজনের ছিল গলগণ্ড এবং আর একজনের ছিল গোদ বা শ্লীপদ। যে বাড়িটিতে তারা বসবাস করত, তা ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মাত্র কয়েক গজ দূরেই ছিল ময়লা-আবর্জনাযুক্ত একটি অন্ধকার পুকুর। এরই সঙ্গে সংযুক্ত একটি নালা শূন্য অবস্থায় ছিল; আর তার নিকটেই আগাছা ও ময়লা-পচায় রুদ্ধ হয়ে যাওয়া গভীর ও উন্মুক্ত একটি নর্দমা বিরাজ করছিল। উক্ত পরিবার রান্নাবান্নার কাজে ও পানীয় জল হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করত এবং বহু বছর যাবৎ তাদের এ অভ্যাস চলে আসছিল। আট জনের অন্য একটি পরিবার যারা এই গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল এবং উপরি-উক্ত পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বসবাস করছিল, তাদের চার জনই সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারি মাসের মধ্যে গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয়। ব্যাধিগ্রস্তরা সবাই ছিল ছ থেকে পঁচিশ বছরের বালিকা ও মহিলা এবং এর পূর্বে তারা এ রোগের সামান্যতম আভাস কিংবা কোনোরূপ লক্ষণও দেখে নি। স্ফীতি অবস্থাটা মাংস গ্রন্থির সবটাই আক্রমণ করে বসে। কেবল একটিমাত্র ঘটনায় উক্ত ব্যাধি একটিমাত্র কর্ণের নিম্নভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। হাইড্রিয়ো পটাশ বা স্কারের সাহায্যে তাদের সকলের ব্যাধিই নিরাময় করা হয়, কিন্তু তাদের গৃহত্যাগের পর কিছু সময় অতিবাহিত না-হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নি। স্থানীয় লোকেরা এখানে অত্যধিক পরিমাণে লেবুর আরকের ব্যবহারকেই গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী করে থাকে। এটি এমন একটি দ্রব্য যা, বিক্রমপুর ও সোনারগঞ্জ এলাকার অধিবাসীরা তাদের রান্নাবান্নায় অধিক পরিমাণে ব্যবহারের পক্ষপাতী।

প্লীহা

এ জেলায় প্লীহা-বর্ধনজনিত অল্প সম্বন্ধীয় ব্যাধি খুবই ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী; এবং স্থানীয় অধিবাসীরা পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত বদ্ধ জলাভূমির পানিকেই উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী করে থাকে। এ রোগ সাধারণ সবিরাম জ্বরের মাধ্যমে আরম্ভ হয় এবং এতে ঠাণ্ডা লাগানো খুবই মারাত্মক; বহু ক্ষেত্রে যদিও জ্বরের পরিমাণ সামান্য থাকে, তথাপি আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে অজীর্ণতার সাধারণ লক্ষণগুলো ছাড়াই রোগীর অজান্তে অথবা কোনোরূপ শারীরিক বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়ে এই রোগ মন্ত্রর অথচ কপট গতিতে আক্রমণ করে থাকে। বয়স্ক লোকজন অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই অত্যধিক পরিমাণে এ রোগের শিকার হয়। এদের অনেকের বেলায় ব্যাধির সঙ্গে অন্ত্রকীটের সন্ধান মেলে এবং বেশ কিছুসংখ্যক

ক্ষেত্রে রক্ত আমাশয় পরিলক্ষিত হয়। অল্প বয়স্ক তরুণদের রোগের বেলায় চিবুক ও ঠোঁটের ক্ষতাদি থেকে শুষ্ক খোলস খসে পড়তে দেখা যায় এবং সামান্য ছুর ও পাকে, যাতে সে অল্প দিনের মধ্যেই অবসন্ন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে মৃত ও জীবন্ত অংশের মধ্যে একটি সীমারেখার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতাদির শুষ্ক অংশ খসে পড়তে ছোট ছোট দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে যেখানে আমি এ জাতীয় বলবর্ধক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি, সেসব ক্ষেত্রে একটি ঘটনাও দেখি নি, যাতে ক্ষত সারানোর পরে ক্ষতের নাগ সম্পূর্ণ মুছে গেছে কিংবা রোগী নিরাময় হয়েছে। শারীরিক লক্ষণাদি ও অবস্থানদৃষ্টে তার উপযোগী অনুপাত অনুসারে বিশোধক ও উদ্ভিদ জাতীয় বলকারক ঔষধপত্রের সঙ্গে সর্গমিশ্রিত হিরাক্ষ হচ্ছে প্রতিষেধক, যা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বহু ক্ষেত্রে অস্ত্রাদির শ্লেষ্মার ন্যায়, তুক বা ঝিল্লির যুগপৎ অবস্থানরত প্রনাস প্রকার ফলে, এর দর্শনীয় বস্তুর আপাতবিরুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

রক্ত আমাশয় ও উদরাময়

রক্ত আমাশয় ও উদরাময় উভয় রোগেরই প্রাদুর্ভাব বর্ষা ও শীতকালেই হয়ে থাকে। রক্ত আমাশয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জলে ভেজা ও ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদির ফলে দেখা দেয়; অন্যদিকে উদরাময় ব্যাধিটা প্রধানত নতুন চাল, অপরিপক্ব শাকসবজি, জলার পানি ও তৈলাক্ত মাছের কয়েকটি প্রজাতি ইত্যাদি ব্যবহারের ফলেই দেখা দেয়। উদরাময় সবচেয়ে অদম, ও অনারোগ্য একটি ব্যাধি এবং এতে প্রতি বছর বেশ কিছুসংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী প্রাণ হারায়।

বাতরোগ

পুরোনো ও অল্প-পুরোনো বাত রোগের প্রাদুর্ভাব বর্ষা ও শীত ঋতুতেই অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। শীতকালে নদীতে স্নান করার ফলে এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে সর্বান্তে ভিজে কাপড়চোপড় জড়ানো, কিংবা ভিজে কোমরবন্ধ বা গামছা পরার অতি প্রচলিত অভ্যাস থেকে এ রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। ব্যাধিটা অত্যধিক হলে পারদঘটিত ঔষধপত্র ও আফিম ছাড়া, দেহে ক্রিয়া করার জন্য অল্প শক্তিসম্পন্ন প্রতিষেধক খুব কমই ক্রিয়া করে থাকে। পারদের অপব্যবহার কিংবা যৌনব্যাধির ক্ষেত্রে দেশীয় হাতুড়ে চিকিৎসক কর্তৃক পারদের ব্যবহার ইত্যাদি প্রায়ই এ রোগের একটি পূর্ব লক্ষণ। এখানে হিঙ্গুল বা সিন্দূরের ধূম ফুসফুসের মধ্যে গুঁকে গুঁকে গ্রহণ করানোর দ্বারা সাধারণত এর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। সাধারণত এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনের ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে রোগীর মুখ থেকে সাংঘাতিকভাবে লাল নিঃসৃত হতে থাকে। এভাবে পারদ জাতীয় ঔষধপত্র গ্রহণের দরুন সচরাচর দেশীয় লোকদের মধ্যে দুরারোগ্য বাতরোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ফলে গ্রহণের দরুন সচরাচর দেশীয় লোকদের মধ্যে দুরারোগ্য বাতরোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ফলে অস্থি-গ্রন্থিদ্বয়ের চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়ে এবং অস্থিসমূহ পচন ধরতে দেখা যায়; অনেক ক্ষেত্রে চোয়ালটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়; এতে তার মুখ খোলার আর উপায় থাকে না এবং গ্লেনয়েড গহ্বরের চতুর্দিকে প্রদাহের সৃষ্টি করে।

গুটিবসন্ত ও অন্যান্য চর্মরোগ

গুটিবসন্তের আবির্ভাব ঘটে সাধারণত ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে এবং এই সমস্ত ঋতুতে যখন বাতাস প্রবল হয় এবং আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। এ সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদের

মধ্যে চরম আকারে যক্ষ্ম ও অস্ত্রের প্রদাহজনিত ব্যাধির আবির্ভাব একেবারে অজ্ঞাত নয়। বর্ষাকালে সর্দি, হুপিং কফ ও শ্বাসনালীর প্রদাহ ইত্যাদি ব্যাধি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শেষোক্তটি ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারাত্মক রূপ ধারণ করে থাকে। এতে ত্বরিত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তুলনামূলকভাবে কাশ রোগ ও স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালীর প্রদাহ বিরল। কিন্তু হাঁপানি (Asthma) ও পুরোনো শ্বাসনালীর প্রদাহ শীতঋতুতে বৃদ্ধলোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চোখ ওঠা রোগ

চোখ ওঠা রোগ, বিশেষত পলি-অধ্যুষিত নিম্ন এলাকায় এবং প্রথমোক্ত ভূভাগের আড়িয়াল জেলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়ে থাকে। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাধিটা এখানে বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজনদের মতে, ভিজ়ে ফসলের গন্ধ থেকে উক্ত রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে; অবহেলা ও যথাযথ চিকিৎসার অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এতে চোখে ছানি পড়তে দেখা যায় এবং চোখের ভিতরকার পরদা পুরু হয়ে ওঠে ও পাতাগুলো অন্তর্মুখীন হয়ে পড়ে; উপরি-উক্ত প্রতিটি রোগের অস্তিত্বই এখানে লক্ষ করা যায়।

নাকরা

স্থানীয় হাসপাতালে যারা চিকিৎসার্থে আগমন করে, তাদের প্রায়শই নাক, গলা ও কানে রোগাক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। নাকরা নামে অভিহিত অতি পরিচিত ব্যাধি যা কপালস্থিত গহ্বর ও পিটুয়াটরি (Pituitary membrane) ঝিল্লির শিরা উপশিরায় রক্ত-সঞ্চারিত হওয়ার কারণে হয়ে তাকে, এবং এখানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। দেশের এ অংশের অন্য কয়েকটি ব্যাধির ন্যায়, এ রোগ থেকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাযোগে দেখা দেয়। এতে সাধারণত মাত্রাধিক জ্বর ও সাংঘাতিক মাথাব্যথা হয়ে থাকে। দেশীয় লোকদের প্রবর্তিত সাধারণ চিকিৎসা-পদ্ধতি হল—সুতীক্ষ্ম নলখাগড়া দিয়ে রোগাক্রান্ত নাসিকার পরদা কেটে রক্ত বের করে দেওয়া। এর ফলে, সাধারণত রোগের অনেকটা উপশম হয়ে থাকে। নাসারন্ধ্রের পরদা পুরু হয়ে যাওয়া এবং পেকে ঘা হয়ে যাওয়া—অত্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সম্ভবত উপরি-উক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বনের ফলেই এরূপ হয়ে থাকে।

জিহ্বা ও টন্সিলে ঘা-এর আকারে মুখের রোগ দেখা দেয়, এবং কানের রোগে এর পরদা পুরু হয়ে ওঠে ও পেকে যায়। এ সব ব্যাধি নাসারন্ধ্রের রোগের মতোই সমপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

চর্মরোগ

সর্বাপেক্ষা প্রচলিত চর্মব্যাধিগুলোর মধ্যে কুষ্ঠরোগ, দাদ, চুলকানি, জ্বরঠোসা ও খোসপাঁচড়া ইত্যাদি ব্যাপক আকারে দেখা যায়। সর্বস্তরের কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব শহরেই পরিলক্ষিত হয়। এতে চর্মে দাগ পড়া থেকে আরম্ভ করে শরীরের আক্রান্ত অংশের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গর্মিরোগ বা সিফিলিস

গর্মিরোগ বা সিফিলিসের প্রাদুর্ভাব কুষ্ঠরোগের চাইতে কম নয়। প্রায়ই এ ব্যাধি শোচনীয় পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পারদের অপব্যবহারের দ্বারা দ্রুতবর্ধনশীল ক্ষত সচরাচর দৃষ্ট

বদহজমি রোগ

বদহজমি রোগ বিভিন্ন আকারে সকল স্তরের লোকদের মধ্যে দেখা যায়। এর মধ্যে একটির নাম পিত্তশূল। এ ব্যাধি গাঁজাখোরদের মধ্যে খুব বেশি লক্ষ করা যায়।

পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রাতন্ত্রের গমনপথটি গাঁজাখোরদের ক্ষেত্রে অতীব স্পর্শকাতর। যত নরম খাদ্যই এদের পরিবেশন করানো হোক না কেন, খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই তা প্রবল বমনের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। ফলে পেটের পেশিগুলো বেশ শক্ত হয়ে যায় এবং ব্যথাটা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, রোগী নিদারুণ যন্ত্রণায় মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। ব্যথা উপশমকারী ঔষধপত্র (এ্যানোডাইন) সাময়িকভাবে কাজ করে। এতে রোগী অস্থিসারসম্পন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে; এবং এভাবে কিছুকাল রোগভোগের পর তার মৃত্যু ঘটে।

অন্ত্রকীট

অন্ত্রকীটজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব এখানে খুব বেশি। এতে দেশীয় লোকেরা খুব ভোগে। বড় কৃমি, সুতা কৃমি ও ফিতা কৃমি ইত্যাদিজনিত রোগ এখানে সচরাচর দেখা যায়। এ ছাড়া, চ্যাওটা (চ্যান্টা) কৃমিজনিত আরো একটা ব্যাধি মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয় এবং কতকগুলো গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি করে থাকে, যেমন, মৃগীবাঈ, ব্যথা ও শরীরে পানি নামা ইত্যাদি। বাংলায় একে বলা হয় ‘চ্যাওটা’ এবং সংস্কৃতে ‘বৃদ্ধনিবা’। দেশীয় চিকিৎসকের মতে, চ্যাওটা কৃমির প্রাদুর্ভাব ফিতা কৃমির চাইতে বেশি এবং এর একটি প্রজাতি নমুনা হিসেবে আমি অধুনা “মেডিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল সোসাইটিতে” পাঠিয়েছি, এবং ‘ডিষ্টোমা হিপাটিকাম’ থেকে পৃথকীকৃত করার জন্য আমি এর নাম দিয়েছি ‘ডিষ্টোমা ইন্টেস্টাইনেট’। ‘ডিষ্টোমা হিপাটিকাম’ নামের এই চ্যাওটা—যকুং ও তার শিরা উপশিরায় পরিলক্ষিত হয়। আর ‘ডিষ্টোমা ইন্টেস্টাইনেট’ নামক চ্যাওটা দেখতে চ্যান্টা, প্রায় গোলাকার এবং টিপলে হাতে শক্ত মনে হয় এবং এর চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত। কীটের মাথাটা ত্রিকোণাকৃতি ও কিছুটা বাঁকা; এর অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র দেখা যায়, যা ম্যাগনিফাইং আয়না ব্যতিরেকে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। পশ্চাদভাগের ছিদ্রটি সম্মুখস্থ ছিদ্র হতে মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। শেষোক্ত ছিদ্রটি কচকচে হাড়ি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ঠিকরানো চোখের মতো ভেসে থাকে। এটা ব্যাসার্ধে অর্ধলাইন। এর সম্মুখভাগে একটি ছোট সাদা গুটলি রয়েছে। কীটটির রং গাঢ় লাল; দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চি থেকে সোয়া ইঞ্চি, প্রস্থে আধ ইঞ্চি; এরা ক্ষুদ্রাতন্ত্রে বাস করে থাকে। ‘ডিষ্টোমা ইন্টেস্টাইনেট’ ও ‘ডিষ্টোমা হিপাটিকাম’ নামক চ্যাওটাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রধানত এদের ছিদ্রের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। পূর্বোক্তটির ছিদ্রদ্বয় পাশাপাশি এবং অন্যদিকে, পরবর্তী ‘চ্যাওটা’র পশ্চাদভাগের ছিদ্রটি বুকের মাঝামাঝি স্থানে সন্নিবিষ্ট। ডি. ইন্টেস্টাইনেটটি দেখতে বেশ বড়, এবং সরু অথচ শক্ত। এর অগ্রভাগ ‘ডি. হিপাটিকাম’ নামক চ্যাওটা অপেক্ষা স্থূল। দেশীয় হাতুড়ে ডাক্তারগণ তন্ত্র থেকে এই কীটসমূহ বহিষ্কারের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধপত্র প্রয়োগ করে থাকে, যেমন পারদ জাতীয় কৃষ্ণবর্ণী সালফরেট, নাক্সভমিকা, বাটিয়া ফ্রোন-ডোসা ও ইরাইসিব প্যানিকুলেট ইত্যাদি।

উন্মাদ

১৮২৭ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে, মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ৭৫৭ জন রোগীকে অত্র স্থানের পাগলা গারদে ভর্তি করা হয়েছিল। উক্ত সংখ্যার মধ্যে ৬৫৮ জন ছিল পুরুষ এবং ৯৯ জন মহিলা। এদের অধিকাংশেরই বয়স ছিল ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যে।

মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তাদের পেশা ও জীবন যাপনের অবস্থা সম্পর্কিত একটি বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল

গৃহস্থ বা কৃষি সংক্রান্ত		রিফুগার	...	...	১
শ্রমিকগণ	... ৬৭২	ব্যবসায়ী	...	...	২
ফকির	... ১৪	বরকন্দাজ	...	...	১
ড্রাক্সন	... ১৩	পাচক	...	...	১
সিপাই	... ৮	ঔষধ বিক্রেতা	...	...	১
পতিতা	... ৭	গায়ক	...	...	১
ভৃত্য	... ৫	চাল ব্যবসায়ী	...	...	১
নাপিত	... ৩	আরদালি	...	...	১
দরজি	... ৩	স্বর্ণকার	...	...	১
বৈরাগী	... ২	রাজমিস্ত্রি	...	...	১
তাঁতি	... ২	ঝাড়ুদার	...	...	১
ধোপা	... ২	ধাঙ্গড়	...	...	১
গোয়াল	... ২	আর্মেনীয় অধিবাসী	...	...	১

মোট : ৭৫৭ জন

দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্ণ চিত্র উল্লিখিত বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এখানে কেবল সেই সমস্ত উন্মাদগ্রস্ত লোককেই ভর্তি করা হয়েছিল যাদের মাত্রাধিক্য পাগলামির বিষয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। ১৮৩১ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের ভর্তি-হওয়া রোগীদের সংখ্যার বিরাট পার্থক্য থেকে এটা আরো স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ঢাকা	...	২৩৫
ত্রিপুরা	...	৩৫
বাকেরগঞ্জ	...	২৮
করিদপুর	...	২৪
ময়মনসিংহ	...	১৯
চট্টগ্রাম	...	১৮
নোয়াখালী	...	১৪
আসাম	...	৪

अनाठ

[illegible]

মৃগী রোগ, অসাড়তা ও স্নায়ুরোগ বা অবিকৃতি

অন্যান্য স্নায়ু সংক্রান্ত ব্যাধির মধ্যে মূগী রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। পক্ষাঘাত ও মস্তিষ্ক রোগ মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কারণজনিত কিংবা ক্রমবর্ধমান মস্তিষ্ক রোগ দু'জনামূলকভাবে খুবই কম।

কারিগর শ্রেণীর রোগব্যাধি

কারিগর শ্রেণীর লোকেরা যারা কাপড় বোনে, সুতা কাটে এবং কাপড় ফেরত আনে, তাদের মধ্যে

দৃষ্টিহীনতা, রাতকানা এবং এমনকি, মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাধি সচরাচর দৃষ্ট হয়। শাঁখারিদের মধ্যে কোমর-বেদনাজনিত রোগও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অত্যধিক ঘাম অথবা আংশিক ঘাম ইত্যাদিও ব্যাধি, যা ইউরোপে প্রায় অজ্ঞাত। কেবল এখানেই এর প্রাদুর্ভাব, মাঝে মাঝে দরজি, সূচীকর্মশিল্পী ও লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। এদের হাত-পা স্বভাবতই আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এই মাত্র তারা পানি থেকে হাত-পা চুবিয়ে এনেছে ; দর দর করে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম গড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তা শুকিয়ে যেতে না-যেতেই বা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে না-ফেলতেই, আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হতে থাকে। দীর্ঘ সময় হাতপায়ে ঘাম জমা থাকলে চামড়া কুঁচকে যায় এবং এদের মধ্যে অনেকেই জ্বালা-পোড়ার কথা বলে থাকে। বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন গঠনের লোকদের মধ্যে এ রোগ পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত সবচেয়ে কমবয়স্ক যে রোগীকে আমি দেখেছি সে ছিল দরজিকাজ শিক্ষারত বার বছরের একটি বালক। সাধারণত শীত ঋতুতেই এর প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং এ সময়ে এ জাতীয় রোগীদের প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে থাকে। মাত্রাধিক্য ঘাম মাঝে মাঝে রোগীর এমন অসুবিধার সৃষ্টি করে যার ফলে কাজকর্ম চালানো অসুবিধা হয়ে পড়ে। আমি লৌহ ও ধাতবজাত ঔষধসহ এই ব্যাধিতে বলবর্ধক ও ধারক জাতীয় প্রতিষেধক ব্যবহার করেছি, কিন্তু কোনো ফলোদয় হয় নি।

দুর্ঘটনা

দেশের পূর্বাংশে যে সমস্ত দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে, তার মধ্যে হাড়ভাঙা, গ্রন্থিচ্যুতি ইত্যাদি সাধারণ গাছ থেকে পতনের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া, বন্য শূকর, মহিষ, কয়েক প্রকার কাঁটায়ুক্ত মাছ যেমন, শিঙি, মাগুর ইত্যাদি দ্বারা আঘাত ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সাধারণত, শূকরের দস্তাঘাত ছোট কাটা দাগের ন্যায় দেখা যায়। এমনকি, রোগীর বাহুতে, পিঠে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশ বা তদূর্ধ্ব ক্ষতচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষত সাধারণত বেশ গভীর এবং মাংসপেশি পর্যন্ত এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়, যাতে এগুলোকে ছুরির কাটা বলে প্রতীয়মান হয়। দেশীয় হাসপাতালে আনীত বেশিরভাগ রোগীর বাঘ ও চিতাবাঘের আক্রমণে সৃষ্ট ক্ষতগুলো দেখতে খেঁতলানো এবং এটা সাধারণত বাঘের থাবা থেকে সৃষ্ট। এসব ক্ষতে প্রায়শই খুব বেশি রক্ত জমে যায়। এমনকি, কোনো কোনো নখের আঁচড় দৃষ্টিগোচর না হলেও আঘাতের জায়গায় রক্ত ঠিকই জমে থাকে। ক্ষতের চারপাশে পচন ধরে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এতে দুরারোগ্য নালীর সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রধান বিপদ দ্বিতীয় পর্যায়ের রক্তক্ষরণ থেকেই দেখা দেয়। গ্ৰীহা রোগগ্রস্ত শ্রমিকদের দ্বিতীয় পর্যায়ে রক্তক্ষরণ প্রায় পরিলক্ষিত হয়, যেখানে তাদের রক্ত দূষিত হয়ে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ রক্তের জমাটবাঁধা শক্তি রহিত হয়। ফলে মধ্যম ধরনের শিরার মুখ বন্ধ রাখতে অপারগ হয়।

দেশীয় হাসপাতালে অধুনা সংঘটিত একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, কাঁধের কাছাকাছি মাংস পেশির উপর বেশ বড় রকমের একটি ক্ষতে শিমের বিচি পরিমাণ জায়গা ব্যতীত বাকি সম্পূর্ণ অংশ একটি বিশুদ্ধ 'Granulating Surface'-এর মতো পরিদৃশ্যমান হয়। শিমের বিচি-পরিমাণ জায়গাটুকু একটি শিরার মুখের ওপর অবস্থিত থাকে এবং এর গা ঘেঁষে সামান্য কিছুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। শিরায় গিট দেবার কয়েক ঘণ্টা পরে শিরার গায়ে ঘায়ে সৃষ্টি করে। কেবল শিরায় গিট বাঁধা ছাড়াও, রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য স্পঞ্জ দ্বারা চেপেও ধরা হয়, কিন্তু সাবক্লাভিন (Subclavian) নামক শিরাকে চেপে না ধরা পর্যন্ত রক্ত

ক্ষরণ কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। একরূপভাবে Subclavian শিরা মৃদুভাবে কয়েকদিন চেপে রাখার ফলে শিরার মুখের চতুর্দিকে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং গ্রানুলেসন টিস্যু (Granulation Tissue) সৃষ্টি হয়।

বাঘ ও চিতাবাঘের আক্রমণজনিত ক্ষত অপেক্ষা মহিষ ও কুমিরের ক্ষত অনেক বেশি মারাত্মক। মহিষ ও কুমিরের আক্রমণজনিত ক্ষতের রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে। কুমিরের কামড়ে সাধারণত হাঁটুই অধিক আক্রান্ত হয় এবং এটা না কেটে ফেললে, শোচনীয় পরিণতি ঘটে থাকে। স্থানীয় লোকেরা সাধারণত অঙ্গচ্ছেদে রাজি হয় না; ফলে পচনশীল অঙ্গ স্বাভাবিকভাবে নিরাময় হতে খুব কমই দেখা যায়। আমি জীবন্ত অংশ থেকে মৃত অংশকে স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় পায়ের মাঝামাঝি স্থানের একটি ক্ষত দেখেছি, যেখানে মৃত অংশ টিবিয়া (Tibia) ও ফিবুলা (Fibula) এবং পায়ের পাতার হাড়গুলো বের হয়েছিল। ফলে রোগী শেষ পর্যন্ত তার পা কেটে ফেলতে বাধ্য হয়। বন্য শূকর, বাঘ ও চিতাবাঘ ইত্যাদির আক্রমণজনিত দুর্ঘটনা প্রধানত দেশের উত্তরাংশের প্রজা, কাঠুরে ও মাঝিমান্নাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ সকল হিংস্র পশুর দ্বারা সেখানকার বনজঙ্গল পরিপূর্ণ। এমনকি, শহরের মধ্যস্থলেও চিতাবাঘ হত্যা করা হয়েছে।

শিং ও মাগুরের করাতসদৃশ কাঁটা ফোটানো নৈত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এবং মাঝে মাঝে তা মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ব্যথা ও প্রদাহ হাত থেকে বাহতে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায়ই শিরায় পচন ধরে ও হাড় পেকে যায়। জেলেরাও অনেক সময় হাতের ও রো (ray) মাছের আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে। রো মাছের লেজের কাঁটার আঘাত খুবই মারাত্মক; এবং এর আঘাতে লোকের মৃত্যু পর্যন্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। উইলিয়ামসের ফিল্ড স্পোর্টস অব ইন্ডিয়া (Field Sports of India) নামক গ্রন্থেও একরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হাড়ভাঙা, গ্রন্থি-বিচ্যুতি ও আঘাতজনিত ক্ষতের পরেই অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা হচ্ছে আগুনে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় ক্ষতসমূহের চিকিৎসা করার নতুন পদ্ধতি হল ধুনা তুলার দ্বারা বেঁধে রাখা। কিন্তু গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে এসব দেশে উপরি-উক্ত ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি খুব একটা উপযোগী নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি আমি অনুসরণ করেছিলাম। এতে পচনশীল অবস্থায় ক্ষতের মধ্যে ছোট ছোট পোকা জন্মানোর ফলে তুলার আচ্ছাদন খুলে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, এবং প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা

১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পুলিশ কর্মচারী কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্টকৃত এ জেলার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাগুলোর একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল—

		পুরুষ	রমণী
আত্মহত্যা	...	৫	০
গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা	...	৪	৮
পানিতে ডুবে মৃত্যু	...	২১	২০
সর্পাঘাতে	...	৩০	২৬
বজ্রাঘাতে	...	৩	৩
বিষক্রিয়ায়	...	৩	৩

গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু	...	...	৩	০
প্রহারজনিত	...	...	৯	০
বাঘের আক্রমণে	...	...	৮	৩
শূকরের	...	...	২	১
মহিষের	...	...	২	০
কুমিরের	...	...	৮	৬
বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যু	...	...	৩	০
গর্ভপাতজনিত মৃত্যু	...	...	০	৭
হত্যাজনিত ও অনুল্লিখিত বিবিধ কারণে মৃত্যু	...	...	৪৫	৩০
মোট :			১৪৬	১০৭

দেশীয় হাসপাতালে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও আকস্মিক মারামারি থেকে আহতদের ভর্তির সংখ্যা

এ জেলার দেশীয় হাসপাতালে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও ঝগড়াঝাঁটির ফলে মাথায় বংশদণ্ড বা লাঠির আঘাতজনিত ক্ষত ও খেঁতলানো জখম নিয়ে বেশ কিছু পরিমাণ রোগী ভর্তি হয়ে থাকে। এ সকল আঘাত যেমন হাড় ভেঙে যাওয়া, মাথার মস্তকের পরদা সরে যাওয়া এবং হাড়ের নিচে পচন ধরা ইত্যাদি সত্ত্বেও এর ভয়াবহ পরিণতি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। বিগত দশ বছর যাবৎ এ জাতীয় কয়েক শ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল কিন্তু কারোরই ট্রিফাইন (Trephine) করার প্রয়োজন হয় নি। এ সময়ের মধ্যে যে দুটি ক্ষেত্রে ট্রিফাইন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি হল গাছ থেকে পতনজনিত কারণে মাথার হাড় ভেঙে গিয়ে মগজে ঢুকে যাওয়ার ফলে এবং অন্যটি ছিল মস্তিষ্কের পরদায় টিউমার হওয়ার জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ার কারণে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত রোগীটি আরোগ্য লাভ করেছিল। তরবারি অথবা বর্শার আঘাতজনিত ক্ষতসমূহ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। জমিদার নিয়োজিত পশ্চিমা বরকন্দাজ ও ভূত্যাগণ ছাড়া এ অস্ত্রের ব্যবহার খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত রোগীকে প্রায়শই অস্ত্রোপচার করা হয়, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর ও সর্ববয়সের রোগীদের পুরোনো ফোড়া, চোখে ছানি, ফিশচুলা, নেত্রনালী, এনট্রোপিয়াম ও টেরিজিয়াম ইত্যাদি জাতীয় প্রচুর রোগী ছিল। এ ছাড়া কানের ঝুলন্ত টিউমারসহ বিভিন্ন ধরনের কোষবদ্ধ টিউমার; পেটে পানি নামা এবং ওভারিয়ান টিউমার ইত্যাদি রোগের রোগীও ছিল। অণুকোষে পানি জমা এখানকার একটি সাধারণ ব্যাধি কিন্তু সাধারণত দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করানোর চাইতে কণ্টিক দ্বারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করাই বেশি পছন্দ করে; ফলে হাসপাতালে ইনজেকশন কিংবা অস্ত্রোপচার দ্বারা চিকিৎসা করার প্রচলন তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

অর্শরোগ

দেশীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক আর্সেনিক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগে অর্শ রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এহেন চিকিৎসায় খুব ভোগান্তি হয় এবং শারীরিক গোলযোগের সৃষ্টি করে। মূত্রনালীর সংকোচনজনিত কারণে প্রস্রাব বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত রোগটিও নিয়মিত ঘটনা। এর চিকিৎসার্থে হাসপাতালে প্রায়শই ক্যাথেটার বা নলের ব্যবহার হয়ে থাকে। বিগত আট বছরে এহেন নল প্রয়োগে মাত্র দুজন রোগীর মূত্রথলি ফুটো হয়ে যায়। মূত্রথলির পাথরি-ব্যাধি

মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। বিগত দুবছরে পাঁচ জন রোগীর মূত্রথলি থেকে পাথর বের করা হয় এবং এদের একজন ছাড়া সবাই আরোগ্য লাভ করে। কেবল একটি ক্ষেত্রে মূত্রথলিটি রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিল। মাঝে মধ্যে মূত্রথলিতে পাথরি রোগ দেখা যায় এবং বিগত পাঁচ বছরে এ জাতীয় চার জন রোগীর মূত্রনালীতে আটকে পড়া পাথর বের করে আনা হয়।

হার্নিয়া

কুঁচকিতে এবং তার অব্যবহিত নিম্নস্থিত হার্নিয়া রোগ বিরল। কিন্তু নাভিস্থলে ও এর উপরে এবং নিচে ছিড়ে যাওয়া অবস্থা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। অবরুদ্ধ কোকনলের (Herniae) ঘটনা খুব কমই ছিল।

জন্মগত দোষজনিত ব্যাধি

জন্মগত দোষজনিত ব্যাধি, যেমন, ফাইমোসিস ও ঠোট ফাটা ইত্যাদি সম্ভবত খুব বেশি দেখা যায়। শিরদাঁড়ার ফাটল (Spina bifida) এবং চোখের ছানি পড়া বিরল ঘটনা। প্রকৃত এন্যুরিজম (aneurism) ও ক্যান্সারের একটি ঘটনাও আমি এখানে পাই নি। শহরের নিম্নশ্রেণীর, হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই সন্তান প্রসবের সময় ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন হয়ে থাকে।

সন্তান প্রসব

এদেশে সন্তান প্রসব অতি সহজে ঘটানো হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য, ধাত্রীদের অবহেলা অথবা তাদের অমার্জিত ও মাত্রাধিক্য হস্তক্ষেপের দরুন প্রসবের সাধারণ গতি বাধাপ্রাপ্ত বা বিলম্বিত হয় ; ফলে স্থানবিশেষ ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা অথবা হাতের সাহায্যে প্রসব করানো হয়ে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে প্রসূতির ফুল পড়ে না, অস্বাভাবিক প্রসব হয় এবং পূর্বাহ্নেই পরদা ছিড়ে যায় ও প্রসবের বেগ হ্রাস পায়—সেসব ক্ষেত্রে প্রসব স্বভাবতই কষ্টকর হয়ে থাকে।

অস্বাভাবিক প্রসবে পূর্বাহ্নে হাত বের হয়ে আসার ঘটনাই বেশি। প্রসূতির সময়মতো ফুল না পড়ার ঘটনা প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। গর্ভাশয় থেকে রক্তক্ষরণের দুটি মাত্র ঘটনা আমি পেয়েছি এবং উভয় ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণ ছিল গর্ভাশয়ের মুখে ফুল আটকে পড়া। এখানকার দেশীয় মেয়েদের মধ্যে প্রসূতি অবস্থায় বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা প্রসবের পরে উত্তেজক ঔষধপত্র সেবনের ফলে ঘটে থাকে। বিভিন্ন উপকরণমিশ্রিত ঔষধপত্র শহরে বিক্রি হয়ে থাকে এবং প্রসূতিরা তাদের সাদাস্রাব সম্পূর্ণ তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ জাতীয় ঔষধ সেবন অত্যাবশ্যক বলে মনে করে। এ ধরনের ঔষধ সেবন, সাংঘাতিক গরমের মধ্যেও বন্ধ ঘরের ভিতরের আগুন প্রজ্বলিত রাখার রীতি থেকে মাতৃগর্ভে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং এর পরিণতি শোচনীয় হয়ে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে যে সমস্ত মেয়ের সন্তান পেটে-থাকা অবস্থায় মৃত্যু ঘটে, তাদেরকে দাহ করার পূর্বে পেট কেটে মৃত সন্তান বের করে আনা হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে এদেরকে স্বতন্ত্র স্থানে কবরস্থ করা হয়ে থাকে।

দেশীয় হাসপাতাল

শহরের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে দেশীয় হাসপাতাল, পাগলাগারদ, জেল হাসপাতাল ও রোগ প্রতিষেধক বীজাগার বিভাগ ইত্যাদি। প্রথমটি কলকাতার দেশীয়

হাসপাতালের শাখা হিসেবে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এটি সরকার থেকে মাসিক ১৫০ টাকা অর্থ সাহায্য ও কিছু পরিমাণ ঔষধপত্র সরবরাহ এবং শহরের ইউরোপীয় ও দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে চাঁদা বাবদ তোলা ২২,০০০ টাকার সুদ থেকে লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বিগত চার বছরে যারা চিকিৎসা-সংক্রান্ত উপদেশ ও ঔষধ ইত্যাদি সাহায্য পেয়েছে, তাদের বাৎসরিক গড়পড়তা সংখ্যা ২,৬১০। এদের বেশিরভাগ চিকিৎসার্থীই হাসপাতালে উপস্থিত হয় অথবা তাদের বাড়িঘরে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

হাসপাতালটিতে মাত্র ৪০ জন রোগীর স্থান সংকুলান হয়ে থাকে এবং এটি একেবারেই সংকীর্ণ ও খারাপভাবে পরিলক্ষিত একটি অট্টালিকা। যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, এটা তার সঙ্গে কোনোক্রমেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মি. ওয়ান্টার এবং অতি সম্প্রতি মি. জে. গ্রান্ট এর ব্যাপক উন্নতি বিধান করেন। এরা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও এতদসংক্রান্ত বহির্বাটী নির্মাণ করেন। অট্টালিকাটিতে ৭২ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট প্রস্থ একটি ওয়ার্ড আছে এবং এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রায় ৮ ফুট প্রশস্ত দুটি বারান্দা। প্রতিটি বারান্দার শেষে একটি করে কামরা রয়েছে। যেসব রোগীরা এ হাসপাতালে ভর্তি হতে আসে, তারা দরিদ্র, নির্বাক ও নিঃস্ব ব্যক্তি। এরা সাধারণত খুব দুর্বল এবং কোনো কিছু কাজ কিংবা শিক্ষা পর্যন্ত করতেও অক্ষম। অপরিচিত ও পথিক ব্যক্তি যারা এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে মাঝিমালা ইত্যাদির সংখ্যাই প্রচুর। এ ছাড়া, দুর্ঘটনা কিংবা দাঙ্গাহাঙ্গামায় আহত ব্যক্তিদের বেশ কিছুসংখ্যক আসে গ্রামাঞ্চল থেকে।

পাগলাগারদ

শহরের পশ্চিম প্রান্তে চকের সন্নিকটে পাগলাগারদ ও জেল হাসপাতাল অবস্থিত। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে পাগলা গারদটি নির্মিত হয়। এটি প্রশস্ত ও সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত দালান এবং একটি বৃহৎ উদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে আরোগ্যের পর ক্রমশ স্বাস্থ্যলাভকারী রোগীদেরকে কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ অট্টালিকার প্রধান অংশে বারান্দা ইত্যাদি ঘেরা ছোট ছোট কক্ষের দুটি সারিসহ ৫৪ x ৩৫ ফুটের একটি উন্মুক্ত চতুষ্ক বা চতুর্ভুজাকৃতি প্রাঙ্গণ আছে। এরূপ প্রতিটি দৈর্ঘ্যে ১০ ফুট এবং প্রস্থে ৬ ফুটবিশিষ্ট ১৪টি কক্ষের প্রতিটিতে দুটি করে দরজা আছে—যার মধ্য দিয়ে খোলা বাতাস চলাচল করতে পারে। উক্ত চতুষ্কের সঙ্গে সংযোগকারী ৫৭ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩৪ ফুট প্রশস্ত আরো একটি গৃহ প্রাঙ্গণ আছে ; সেখানে অনুরূপ দৈর্ঘ্য ও প্রায় ১৭ ফুট প্রশস্ত আর একটি ওয়ার্ড রয়েছে। এ গৃহ প্রাঙ্গণ ছাড়াও, ক্রমশ আরোগ্যলাভকারী রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র আরো একটি ওয়ার্ড আছে এবং উদ্যানের একটি আলাদা অংশে উপরের দিক থেকে আড়াআড়িভাবে দেয়ালের দ্বারা বিভক্ত—বারান্দাসহ ৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত কয়েকটি ঘর মহিলা রোগীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এই উন্মাদ-আশ্রমের বিভিন্ন কক্ষ ও ওয়ার্ডের উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট এবং এর দরজার দৈর্ঘ্য ৬ ফুট এবং প্রস্থ ৪ ফুট। বহির্বাটী, নর্দমা ও কূপ ইত্যাদি সবই পাকা বা ইষ্টক নির্মিত।

জেল হাসপাতাল

৭০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২৪ ফুট প্রশস্ত একটি অট্টালিকা নিয়ে জেল হাসপাতাল গঠিত। এটি পাঁচটি উন্মুক্ত খিলান পথসহ একটি দেয়াল দ্বারা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এর একটি করে উন্মুক্ত বারান্দা আছে এবং দালানের প্রতিটি প্রান্তে নির্দিষ্ট রোগের রোগীদের

অভ্যর্থনার জন্য ১৮ x ৮ ফুট পরিমাপের কক্ষ আছে। শহরতলি অঞ্চলে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত সামরিক হাসপাতালটি আলো-হাওয়াযুক্ত একটি বৃহৎ অটালিকা ; এটি একটিমাত্র হলঘর নিয়ে গঠিত এবং একটি বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এতে ৭০ জন রোগীর স্থান সংকুলান হতে পারে। এর থেকে সামান্য দূরে মাদুরে-ঢাকা একটি অস্থায়ী দালান আছে। ব্যাপক আকারে রোগব্যাধি দেখা দিলে, এটাকে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পূর্বোক্তটির মতো এ দালানটিও একই আয়তনের।

মানবের জীবজন্তুর রোগ

জন্তু জানোয়ারের প্রচলিত রোগব্যাধিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাধি জলাতঙ্ক। প্রায়শ গরম ঋতুতে, বিশেষত যখন বৃষ্টিপাত খুবই কম এবং অভ্যন্তর ভাগের নদী-নালাগুলো শুকিয়ে যায়, তখনই এসব ব্যাধি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। শহরের আশপাশের জঙ্গল খেঁকশিয়ালে পূর্ণ হয়ে যায় এবং শহর যখন বেওয়ারিশ কুকুরে ভর্তি থাকে তখন এসব কুকুরকে খেঁকশিয়ালে কামড়ালে, সরাসরি কুকুরের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। গ্রামাঞ্চলে খেঁকশিয়ালের কামড় থেকে এ ব্যাধিটা মানুষের দেহেও সংক্রামিত হয়। এরকম দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে, যেখানে খেঁকশিয়ালগুলো পূর্বাঙ্কেই জলাতঙ্কগ্রস্ত ছিল। এ জাতীয় রোগগ্রস্ত খেঁকশিয়ালগুলো অনেক সময় ছুটাছুটি করে থাকে এবং ঘরে পর্যন্ত প্রবেশ করে মানুষকে কামড়ায়। আমি এরকম বহু ঘটনার কথা জানি, যেখানে এ ব্যাধির জীবাণু ঐ সকল খেঁকশিয়ালের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়েছিল। দেশের এ অংশে সম্প্রতি সংঘটিত একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, একই স্থানে একই রাতে ১৭ জন ঘুমন্ত লোককে খেঁকশিয়ালে কামড়ায়। গরম আবহাওয়ায়, বিশেষত অনাবৃষ্টির দিনে, “মাতা” (মাতঙ্গ) নামক গরুর ব্যাধি প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে এটা খুবই ক্ষতিকারক বলে প্রতীয়মান হয়। ১৮৩৭ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসে অস্বাভাবিক গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন এ জেলায় এবং বিশেষ করে উত্তর বিভাগে ও ময়মনসিংহ জেলাতে এ রোগে গরু-বাছুরের বিরাট মড়ক দেখা দিয়েছিল। কোম্পানির হস্তিশালায় এরূপ ‘মাতা’ জাতীয় ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগ বিস্তার লাভের পূর্বে, জন্তুরা আহার পরিত্যাগ করে, মূত্রনালী থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং পরে শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলো ফুলে যায় ও পেছনের পা দুটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ সহসা দেখা দেয় এবং এতে ব্যাধিগ্রস্ত পশু কাঁপতে থাকে ও সাংঘাতিক ধরনের চাক্ষু্য পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর অকস্মাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে মরে যেতে দেখা যায়। এতে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকার হস্তীই আক্রান্ত হয়ে থাকে। উক্ত ব্যাধিতে হস্তিশালার ২৫টি হাতি দুমাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর মধ্যে দশটির মৃতদেহ কেটে দেখা যায় যে, সব কটি হস্তীর মস্তক ও পেট দূষিত ছিল। এতে মগজের সর্বনিম্ন পরদার রক্তবাহী শিরা উপশিরাগুলো অতি মাত্রায় রক্তাভ ছিল এবং মগজের অভ্যন্তরভাগে ভেন্টিকুলে অতিরিক্ত পানি জমা হয়েছিল ; পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরীণ পরদাও অত্যধিক রক্তাভ ছিল। বহু ক্ষেত্রে ভেন্টিকুলের মধ্যে রক্তক্ষরণ দেখা দিয়েছিল এবং এদের প্রত্যেকটি জন্তুর মগজ ও এর লম্বা মাইজ (Medulla oblongata) এত বেশি পরিমাণে রক্তাভ ছিল যে, ছুরি দিয়ে তা কাটার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শিরা উপশিরার মুখ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত বের হচ্ছিল। খাদ্যানালীর অভ্যন্তরীণ পরদার প্রদাহ অনেকটা বসন্ত রোগাকৃতি দেখাচ্ছিল; এর অন্তর্বর্তী পরদার (Mucus membrane) রক্তক্ষরণ দেখতে খুবই টাটকা ছিল। এগুলো আকারে কোনোটা মুগের

ডালের দানাব মতো, কোনোটা টাকার মতো, আবার কোনোটা শিলিং ইত্যাদির মতো সম্পূর্ণ পৃথক পৃথকভাবে সাজানো ছিল। নাড়ির ঝুলন্ত পর্দার গ্রন্থিসমূহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এদের চতুষ্পার্শ্ব শক্ত হয়ে ঐটে গিয়েছিল। বেশিরভাগ হস্তীর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে দেখা যায় যে, ঝুলন্ত পর্দার গ্রন্থিদের ন্যায় বগলের ও কুঁচকির গ্রন্থিগুলোও ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। এদের প্রত্যেকটির পেটেই কৃমি দেখা যায়, এবং এগুলো ছিল তিন রকমের; যথা, সাধারণ ফাইলেরিয়া ও দু রকমের চ্যাওটা। শেষোক্তটির অর্থাৎ চ্যাওটা দুটির একটি থেকে অন্যটি পৃথকীকরণের একমাত্র উপায় ছিল—এদের একটির বকের উপরে সম্মুখ ও পশ্চাতের ছিদ্র বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চাদকির (Disc) ন্যায় ঈষৎ দাবানো স্থান। চাদকিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা-উপশিরা এসে যুক্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটি মাত্র চিকিৎসাই ছিল—যাতে কিছুটা উপকার লাভ হতে পারত—তা হল কেটে রক্ত বের করে দেওয়া। একটি ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বনও করা হয়েছিল; এবং এতে কানের একটি শিরা কেটে দেড় পাউন্ডের মতো রক্ত বের করা হয়। কিন্তু এত অল্প রক্ত টেনে বের করায় তেমন বিশেষ কিছু ফলোদয় হয় নি, যাতে রোগের গতি ব্যাহত হতে পারে; অগত্যা এ জাতীয় পরীক্ষা পুনর্বার আর চালানো হয় নি।

১৩২৩ অব্দ ১৩৩৭ সালের মধ্যে অস্থানের প্রোজেক্টের হাসপাতালে ভাত করা রোগীদের রোগের বিবরণ :

	জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে
সন্ধ্যাস রোগ.....	০	০	০	০	০	০	০	০	০
হাঁপানি ও কফরোগ	৯	০	১	৮	১২	১৫	০	০	৮
উদরাময়.....	৫৫	৬	১	১৩	৩৪	১	২১	১	২৮
রক্তজ্বামাশয়.....	২৫	০	০	১৫	৫	০	১৫	১	১০
জ্বর.....	২২০	৬	১০	১৫৪	১৭০	৬	২৩৪	৩	২০৮
উন্মত্ততা.....	০	০	০	০	০	০	১	০	২
চক্ষু প্রদাহ.....	৮	০	০	০	১	০	২	০	৩
ফুসফুস সঙ্কীর্ণ ব্যাধি	১৭	০	০	৩	৭	১	১	১	৯
বাতরোগ.....	৩৩	১	২	১৯	২৫	০	২২	০	২৮
বসন্ত রোগ.....	০	০	০	০	৩	০	৭	১	২
দীহারোগসমূহ.....	০	১	০	৮	১	০	৩	০	৩
ক্ষত রোগ.....	৫৪	০	০	৮২	৩৮	১	২৮	০	২৪
দূষিত সহবাসজনিত রোগসমূহ.....	২	০	০	২	৫	০	৩	০	৩
আঘাতজনিত ঘটনাসমূহ.....	১২	০	০	১১	৫০	০	১৪	০	৩
বিবিধ রোগব্যাধি.....	১৪৩	১	০	৯২	১০৪	২	৭৯	০	৮৪
কলেরা ব্যাধিগ্রস্ত.....	২	০	০	২	১	১	৫	৩	৫

জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		মোট
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২১	১	১	১	০	১	৩	৫	৬	০	৬২	২
২৮	১	২৯	১	১৬	২৬	২৫	৮	৬৬	৫	৩৫৬	২৭
৯	০	১২	১১	০	৮	১৫	০	৭	০	১৪৫	৩
১৫৯	১	২৫৯	৩৫৯	২	৬০৯	৮৮৭	২৮	১৮৫	১০	৩৩৪০	৮৯
০	০	১	০	০	১	০	০	০	০	৫	০
১	০	৫	১	০	২	২	০	০	০	২১	০
৪	০	৫	৪	০	৫	২	৪	৭	০	৬৩	২
২৬	০	১০	৯	০	১৬	২৩	১	২৫	১	২৪৬	৬
০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	১৩	১
১	১	২	১	১	৫	০	০	২	০	২৪	৫
২৬	০	৩২	৪৪	০	৩৪	৪০	২৩	৫১	০	৪৩৬	১
দৃষিত সহবাসজনিত.											
৪	০	১	৮	০	২	৪	৯	৯	০	৫১	০
২	০	৪	৫	০	৬	১১	৫	৫	০	১২৮	১
৭৪	০	৭১	৬৯	০	৫১	৫৪	৯০	১১৫	২	১০৪৬	৮
১	০	১	১	০	১	৪	৪	১	১	২৮	১১

দ্বাদশ অধ্যায়

[শিল্পদ্রব্য ও জনসংখ্যা হ্রাস—শহরের সাধারণ কার্যকু অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য—এর উন্নতি বিধানের উপায় ও প্রস্তাব]

বিভিন্ন শিল্পের ক্রমাবনতি

ঢাকা নগরীর খ্যাতি সুদীর্ঘকালের। এ খ্যাতি ঢাকা এদেশের রাজধানী থাকার নতুন ঘটনা নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রসিদ্ধ ছিল—এর অতীতের বহু বিখ্যাত শিল্পদ্রব্য এবং বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘনবসতি ও অত্যধিক প্রাচুর্যের জন্য। এই জেলার ইতিহাসের অন্তিমকাল থেকে তুলার চাষাবাদসহ মসলিন বস্ত্র বয়ন, সুতা কাটা ও ধৌতকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা ছিল। অন্যদিকে, মুসলমান কর্তৃক এদেশ বিজয়ের সময় থেকে এখানকার মুসলিম অধিবাসীর মধ্যে সীবন শিল্পের কল্প শিল্পের একটি প্রধান শাখারূপে গড়ে ওঠে। মুঘল সরকারের আমলে এবং বিশেষ করে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বের সময়ে যখন ঢাকা শহর অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী অবস্থায় ছিল, তখন সেই হাওয়ায় ভাসমান উর্গাভ জালের ন্যায় অদ্ভুত সুন্দর মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা হত এবং সেই সকল বস্ত্র “কোন মানব অপেক্ষা, বরং পরীদের তৈরি”, বলে অভিহিত করা হত; এ মসলিন ছিল “সবচেয়ে মূল্যবান উপহার”, যা বাংলা তার দেশীয় রাজকুমারদেরকে দিতে পারত। দিল্লীশ্বরের তোষাখানার জন্য এবং সারা হিন্দুস্থানের শাসনকর্তাদের রাজসরকারের আর্মীর ওমরাহগণের নিমিত্ত এ সকল অননুকরণীয় মসলিন বস্ত্র (মালবাস বাস) তৈরিতে সবচেয়ে নিপুণ কারিগরদের উদ্ভাবনী কৌশল প্রতিফলিত হয়েছিল। অন্যদিকে পারস্য, ইথিওপিয়া, মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক, ইতালি, লাক্সেমবুর্গ, প্রুভেন্স ও স্পেন প্রভৃতি দেশের জন্য গুন মসলিন এবং নানা ধরনের বুটাদার কাপড় কিংবা মিশ্রিত রেশমি ও সুতিবস্ত্র ইত্যাদি তৈরির জন্য বার্ষিক পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা থাকায় প্রচুর সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল। ১৬৬৬ থেকে ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডে প্রথম ঢাকাই মসলিনের আমদানি হয় এবং এ সময় থেকে ইংল্যান্ডে এর কিছুকাল আগে থেকে ওলন্দাজ এবং পরবর্তীকালে ফরাসিগণ ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত এখানে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। ঐ বছরে ঢাকার সমুদয় বাণিজ্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়েছিল এক কোটি টাকা বা $১\frac{১}{৪}$ মিলিয়ন ষ্টার্লিং। ইংরেজ কর্তৃক এদেশ লাভের কিছুকাল পূর্ব থেকে যদিও ঢাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি পতনোন্মুখ ছিল, তথাপি নিঃসন্দেহে ১৭৮৫ সালে বিলেতের কলের তৈরি সুতোর আমদানির ফলেই মসলিন শিল্প সর্বপ্রথম সবচেয়ে নির্মমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। ঐ বছর ইংল্যান্ডে কমপক্ষে

৫,০০,০০০ খণ্ড মসলিন বস্ত্র তৈরি হয়েছিল। ১৭৮৮ থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত সময়টা ইংল্যান্ডের সুতা ব্যবসায়ে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত হয় এবং অপরদিকে বাষ্পশক্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে তার উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের দ্বারা প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এ ছাড়া, ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত ঢাকার মসলিন শিল্পের ওপর শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপের ফলে কার্যত ইংল্যান্ডে ঢাকাই মসলিন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে বছরের পর বছর হ্রাস পেতে পেতে অবশেষে এসব বস্ত্র বাণিজ্য-তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। ১৭৮৭ সালে ইংল্যান্ডে মসলিন রপ্তানি-মূল্যের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। ১৮০৭ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮½ লক্ষ টাকায় এবং ১৮১৩ সালে এর পরিমাণ আরো হ্রাস পেয়ে ৩½ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। অতঃপর ১৮১৭ সালে রপ্তানির পরিমাণ শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে এবং এখানকার বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিনিধির পদ বাতিল করা হয়। ১৮২৫ সালে মি. হাসকিন্সন কর্তৃক ভারতীয় সুতি বস্ত্রের ওপর ধার্যকৃত শুল্ক মোট মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সামান্য শুল্ক হ্রাসের দ্বারা বাংলার মসলিন বস্ত্রের রপ্তানিবৃদ্ধির ব্যাপারে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। এতে যে যৎসামান্য লাভ হয়েছিল—তাও আবার এদেশে ইংল্যান্ডের বিপুল পরিমাণ সুতা রপ্তানি করে দশ গুণ পুষিয়ে নেওয়া হয়। ১৮২১ সালে সর্বপ্রথম ঢাকায় প্রচুর বিলেতি সুতার আমদানি পরিলক্ষিত হয়। ১৮২৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩০,৬৩,৫৫৬ পাউন্ড; ১৮৩১ সালে ৬৬,২৪,৮২৩ পাউন্ড এবং ১৮২৮ সাল থেকে এখানে দেশীয় সুতার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে এবং এর পর থেকে বিলেতে তৈরি সুতাই ব্যবহৃত হতে থাকে। এদেশের এ অংশে শিল্পের বিরাট উৎসগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, ঢাকার গৌরবময় বাণিজ্যিক ইতিহাস শুধু বিষাদময় অতীতের স্মৃতি রোমন্থন মাত্র। ৩০ বছর কালের পরিধিতে ইংল্যান্ডের সঙ্গে এর ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে যেখানে বহু লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানি হত, এখন তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতি সাম্প্রতিককালে এর অন্যান্য বিরাট পণ্যসম্ভার, যেমন, মিসর ও তুরস্কের জন্য সূচীশিল্পজাত বস্ত্রাদির রপ্তানি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে এবং সম্ভবত আর অল্প কয়েক বছরের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। পূর্বে জেলার প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের সুতা উৎপাদনের পেশাকার্য বর্তমানে ইংল্যান্ডের তুলনামূলকভাবে সস্তা সুতা আমদানির দরুন প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। এভাবে সুতা কাটা ও বয়ন শিল্পকর্ম যা যুগ যুগ ধরে অসংখ্য পরিশ্রমী লোকদের জন্য কাজের সংস্থান করে দিত, তা মাত্র ৬০ বছর সময়ের ব্যবধানে এমন এক হাতে গিয়ে পড়েছে—যারা কেবল বিভিন্ন জাতির অন্যান্য চাহিদাই মিটাচ্ছে না, বরং তার এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির চাহিদাও পূরণ করছে। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনের ফলে স্বভাবতই শহরের লোকসংখ্যারও ক্রমাবনতি ঘটেছে। ১৮০০ সালে ঢাকার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ২,০০,০০০। কিন্তু ১৮৩৮ সালে লোক-গণনা অনুসারে বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৬৮,০৩৮ জনের অধিক নয়। যে হারে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তার চেয়ে বহু গুণে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়টি চৌকিদারি বা নির্ধারিত পুলিশ করার (লোকের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার একমাত্র নির্ণায়ক মানদণ্ড) রেকর্ড থেকে অবগত হওয়া যায়।

এতে দেখা যায় যে, ১৮১৪ থেকে ১৮৩৮ সালে ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৩১,৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকায় নেমে আসে। এ সকল পরিবর্তনের ফলে, পূর্বে যে সমস্ত পরিবার প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল, বর্তমানে তারা দারিদ্র্যের মধ্যে কালতিপাত করছে। অন্যদিকে

নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ লোক কাজের অভাবে চরম দুস্থ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। নিজেদের ও পরিবারের জীবিকা সংগ্রহের নিমিত্ত এরা তাদের পূর্ববর্তী পেশার পক্ষে যতই অসামঞ্জস্য হোক না কেন, তা তারা যে কোনো কাজ পেলেই খুশি হয়।

শহরের সাধারণ অবনতি

হ্রাসকৃত জনসংখ্যার ন্যায়, শহরের অবনতির লক্ষণগুলো এবং এর নাগরিকগণের বর্তমান দুর্দশাখণ্ড অবস্থা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বহুসংখ্যক বাড়িঘর শূন্য অথবা ধ্বংসাবস্থায় পড়ে আছে। নর্দমা, সরু গলিপথ ও সেতুগুলো অর্থের অভাবে সংস্কার সাধন না হওয়ায় অবহেলিত হয়ে রয়েছে। শহরতলিসমূহ বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ ; অপরদিকে, শহরের অভ্যন্তরভাগে পরিত্যক্ত মরা জীবজন্তু ও শাক-সবজি এবং নানাবিধ ময়লা-আবর্জনায় বহু অবরুদ্ধ খাল-নালা ও গর্ত পূর্ণ হয়ে আছে। এতে পার্শ্ববর্তী কূপগুলোর পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে আছে বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু অত্যধিক দরিদ্রশ্রেণীর অধিবাসীগণের অপরিষ্কার ও অকিঞ্চিৎকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ফলে এসব রোগব্যাধি ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়। স্থান বিশেষের উন্নতি অবশ্য সেই এলাকার ওপর নির্ভরশীল ; এবং এ সকল খারাপ অবস্থার মূল উৎস নিহিত আছে—উল্লিখিত দূষিত পানি ও অসংখ্য কাদাযুক্ত খালনালা এবং বহু অবরুদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর অস্তিত্বের মধ্যে। প্রতি বছর ম্যালেরিয়া রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে এবং এভাবে সৃষ্ট বিষাক্ত আবহাওয়ায় বহুসংখ্যক লোক রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সর্বত্র হতভাগ্য অসহায় লোকদের ভিড় চরম বিপর্যস্ত ও দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিকলাঙ্গদেরকে আমরা দেখে থাকি ; এরা রাস্তায় ভিক্ষে করে তাদের অনিশ্চিত আহার্যের সন্ধান করে থাকে। সুতরাং এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে পৌর-বিষয়ক উন্নতিমূলক কাজের যথেষ্ট সুযোগ এবং দাতব্য কার্যক্রমের বিরাট পথ উন্মুক্ত আছে। এটা খুব আনন্দের কথা যে, সিভিল সার্ভিসের সদস্য পরলোকগত মি. মিটফোর্ডের বিরাট বদান্যতার ফলে এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত মহৎপ্রাণ ব্যক্তি যিনি প্রথমে কালেক্টররূপে এবং পরে প্রাদেশিক আপিল কোর্টের বিচারক হিসেবে বহু বছর যাবৎ এখানে বসবাস করেছেন, তিনি ১৮৩৬ সালে ইউরোপে পরলোক গমন করেন। জানা যায় যে, ইনি ঢাকা শহরে দাতব্য, উপকারক ও জনহিতকর কার্যাবলিতে ব্যয় করার জরুরি উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারের হস্তে ছ থেকে আট লক্ষ টাকার মতো তদীয় বিরাট ঐশ্বর্যময় তহবিল রেখে গেছেন। “এইরূপ উইলের উদ্দেশ্য ও নির্দেশ এই যে, এই অর্থ একান্তভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের উপকারার্থে এককভাবে কাজে লাগানো হবে, যা তারা এবং দেশের সরকার, সেই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পৌছাতে সর্বাধিক সহায়ক বলে মনে করেন।” ১৮৩৭ সালের জুন মাসে শহরের নাগরিকগণ উক্ত বিষয়ের ওপর আলোচনার্থে একটি সভানুষ্ঠান করেন এবং এহেন বদান্যতামূলক উইল উদ্ধার ও এর দ্রুত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার পথে “কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্”—এর সাহায্য কামনা করে তাদের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, উইলকারীর অনুকল্পিত মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অতিসত্বর উক্ত অর্থ পাওয়া যাবে। এ অর্থ ব্যবহারের ব্যাপারে যদি আমাদেরকে কোনো প্রস্তাব উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে আমরা বলব যে, শহরের বর্তমান বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধানকল্পে উক্ত অর্থ-সম্পদ নিয়োগের চাইতে আর কোনো মহৎ কাজই থাকতে পারে না।

সরকারি 'কনজারভেন্স' বা সংরক্ষণ বিভাগের আয়ত্তে বিবিধ জনহিতকর কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য নগর-স্তর থেকে লব্ধ কিছু অর্থ সরকার কর্তৃক কিছুকাল পূর্বে একটি স্থানীয় কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি মি. ডাউয়েস ও মি. ওয়ান্টারের তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বহু উন্নতি ও জনহিতকর কার্যাবলি সুসম্পন্ন করে। মাসিক ১,৬০০ টাকার উক্ত অর্থমঞ্জুরি ১৮২৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে এ উদ্দেশ্যে একমাত্র বার্ষিক অর্থমঞ্জুরি ২,০০০ টাকা—প্রধান প্রধান সড়ক ও বাজার ষাঁট দেওয়ার প্রয়োজনে সামান্য কয়েকটি গরুর গাড়ি ও কিছুসংখ্যক ঝাড়ুদার রাখার জন্য করা হয়।

শহরের উন্নতিকল্পে প্রস্তাব

শহর সংরক্ষণ সংক্রান্ত তহবিল আরো বাড়ানো উচিত। এ অর্থের পরিমাণ এরূপ হওয়া প্রয়োজন—যাতে সেতু, ঘাট ও নর্দমাগুলোর সংস্কারসাধন ছাড়াও, সাধারণ স্বাস্থ্যের সহায়ক নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্য; যেমন, শহরের অভ্যন্তরভাগের খাল-নালা গভীর করে খনন করা, আবর্জনাপূর্ণ গর্তগুলো ভরাট করা, এবং সড়ক ও সংকীর্ণ গলিপথগুলো প্রশস্ত করা ইত্যাদি সম্ভব হয়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতি বছর এতে সহায়-সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। অতএব, একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হলে, তা জনসাধারণের বিরাট উপকারে আসবে।

উৎস-কূপ নির্মাণ

উৎস-কূপ ইত্যাদি নির্মাণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় কাজ হবে। শহরের কাঁকর মাটিতে পানির বহির্উনুস্ত উৎসগুলোর সন্ধান লাভ থেকে ভরসা করা যায় যে, কোনো বড় ধরনের খরচ ব্যতিরেকেই এগুলো নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

নতুন হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রয়োজন

১৮০৩ সালে স্থাপিত দেশীয় হাসপাতালে চাঁদার সাহায্যে গড়ে তোলা তহবিলে বিগত দশ বছরে অতিরিক্ত কোনো অর্থই জমা হয় নি। বিভিন্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোকজনদেরকে সাহায্য দানের জন্য বর্তমান তহবিল খুবই অপরিপূর্ণ। হাসপাতালের দালানটি খুবই ছোট, এবং নির্মল হওয়া চলাচলের অনুপযোগী। এতে শুধু ৪০ জন রোগীর স্থানসংকুলান হতে পারে। এ ছাড়া, যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, এটি তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, উন্নত পরিকল্পনার ভিত্তিতে অন্তত পক্ষে ১০০ রোগীর স্থান সংকুলানের উপযোগী একটি নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা খুবই প্রয়োজন। শহরের দুই প্রান্তে দুটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হলে, তা দরিদ্র জনসাধারণের জন্য খুবই সুবিধাজনক হবে। কেননা, বর্তমানে এদের অনেকেই তাদের আবাসস্থানের বেশি দূরত্বের কারণে হাসপাতালে উপস্থিত হতে অসমর্থ হয়।

রেভারেন্ড মি. শেফার্ড

মুখল সরকারের আমলের ন্যায়, গরিবদের জন্য বর্তমানে এখানে কোনো 'লজরখানা' বা 'ভোজনালয়' নেই। এ ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা আছে তা হল পরহিতৈষণামূলক একটি তহবিল। এটি প্রায় চার বছর পূর্বে রেভারেন্ড মি. শেফার্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত তহবিল থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক নিষ্স্র যেমন—অন্ধ, বন্ধ ও কুষ্ঠরোগী প্রভৃতিদের মধ্যে মাসে ৮০

থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং, এটি সম্প্রসারণ করে একে কলকাতার 'ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি'র ন্যায় একই মর্যাদাসম্পন্ন করা যেতে পারে। এতৎসঙ্গে শহরতলিতে কুষ্ঠরোগীদের বসবাসের জন্য একটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

ঢাকা শহরের অধিবাসীরা তাদের শিক্ষার নিমিত্ত 'শ্রীরামপুর মিশনারি সোসাইটি'-র নিকট ঋণী। বাংলা, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকারী উনত্রিশটি বিদ্যালয় দীর্ঘ বিশ বছরেরও উর্ধ্বকাল যাবৎ বেতারেভ মি. শেফার্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে অর্থের অভাবে এসব স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে সাথে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সংখ্যার মধ্যে 'কলকাতা বেনেভলেন্ট ইনস্টিটিউশন' কর্তৃক অর্থ সাহায্যকৃত খ্রিস্টিয়ানদের স্কুলটিও অন্তর্ভুক্ত। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের অশেষ উপকার সাধন করছিল। উইলদাতা মি. মিটফোর্ড এ স্থানে তাঁর বসবাসকালে এসব বিদ্যালয় সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর এই মনোভাব বিবেচনা করে, এটা অবশ্য মেনে নিতে হয় যে, উইলের তত্ত্বাবধায়কগণের নিকট থেকে অর্থসাহায্য লাভের জন্য এসব বিদ্যালয়ের জোর দাবি উত্থাপনের সুযোগ আছে।

উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত নতুন একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন, এবং বর্তমান ইংরেজি বিদ্যালয়টির সম্প্রসারণ অত্যন্ত হিতকর বলে প্রমাণিত হবে।

নির্ঘণ্ট

অ

অগ্নিকুণ্ড ৪৮

অগ্নিসংযোগ ১৫৫

অশ্বদানী ব্রাহ্মণ ১২৬, ১৪৫

অস্ত্র ৩

অযোধ্যা ৮৯

অর্শ রোগ ২০০

অসবর্ণ বিবাহ ১২২

আ

আইন-ই-আকবরী ২৮, ২৯, ৪৩

আওরঙ্গজেব ৩৫, ৩৭, ৪৫, ১৩৮, ২০৭

আকবর ৩২, ৪৪, ১০৩, ১০৭, ১৩৭

আব ৬৭

আগা সাদেক ৩৮

আশা ৩৩, ৩৪, ৪৭

আজিমখান ৩৪, ৩৫

আজিম-উস-শান ৩৬, ৪৫

আটিয়া ১, ২, ৬, ৪৪, ৫৩, ১৩০

আটিয়া পরগনা ১০, ৩২

আড়িয়াল বাঁ ৩

আদমশুমারি ১১৯, ১৩২

আদাম (ড.) ১৯৭

আদালি ৯৮

আদি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ১২১

আদিপূর ৩০, ১২১, ১২৩

আদিপূর রাজবংশ ২৮, ২৯

আফগান ৩২, ৩৩, ৪৪, ৫৬

আফগান রাজা ৫২

আফ্রিকা ৬২

আবদ হাদী খান ৩৯

আবদুল ওয়াহিদ ৩৬, ৪৫

আবে রায়নাল ৯২

আবুল ফজল ২০, ২৭, ২৯, ৫২, ৯১

আমতা (গ্রাম) ২

আমেরিকা ১৪, ৬৪

আমেরিকান তুলা ৮৭

আম্মানী খান ৩৯

আরব (দেশ) ৩৯, ৮৩, ৯৮

আরবি ভাষা ১৫২

আরব্য জাহাজ ৯৭

আরাকান ৩২, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৭০, ৯৬, ১৩৫

আরাকান রাজ ৩১, ৪৯, ১৩৭

আরাকান রাজ্য ৩২

আর্মেনীয় ৪২, ১৩৯

আর্মেনীয় গির্জা ৪২

আকন্দা ১৪৯

আল ইদ্রিসী ৫৫

আলবেনীয় ১২৫

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ৩১, ৫৫, ৫৭, ১৮১

আলিফ খান ৩০

আলী মোবারক ৩১

আলীবর্দী খান ৩৮, ১০৩

আলেকজান্দ্রিয়া ৩২, ৯৮

অ্যালেক্সিস আর-গীরী ১৩৯

আর্করাইট ১৭৪

আওরা ১১০, ১৩৪

আসাম ৬, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৪৭, ৭০, ৯৬, ৯৯,

১৩০, ১৩২, ১৯৬

আসাদুল্লাহ (মৌলবী) ১৫২

আহমদ বেগ (সুবাদার) ৩৩

ই

ইউরোপ ৭৫, ৮৩, ৯৯, ১০০, ২০৯
ইউরোপীয় ৪১, ৯৯, ১০৫, ১১০, ১৪৫, ১৪৬,
১৬৫, ১৭৬, ২০০
ইউরোপীয় অধিবাসী ৪১, ১১০, ১৮২
ইউরোপীয় চিকিৎসক ২০১
ইউরোপীয় পর্যটক ৪৩, ৮৯
ইউরোপীয় বাজার ৯৯
ইউরোপীয় শিকারি ১১
ইথরেজ ৩৮, ৪২, ১১৪, ১৩৯
ইথরেজ অধিবাসী ১৩৮
ইথরেজ সম্পত্তি ১৩৮
ইথরেজি বিদ্যালয় ১৫২
ইথরেজি ভাষা ১৫১
ইল্যোভ ৮৫, ৮৭, ১১৬, ১৩৭, ১৫৭
ইল্যোভের মদ ১৫৭
ইংলিশ ফাটরি ৪১, ৪৬
ইংলিশ মসলিন ৮৭
ইছামতী ১, ২, ৬, ৩৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৭, ৫৮
ইচ্ছন্ত বান ৩৩
ইতমাম বান ৩৩
ইতালি ৯৯
ইথিওপিয়া ৯৮
ইদিলপুর ৫৮
ইদ্রাকপুর ৪৯, ৫২
ইদ্রাকপুরের মেলা ৫২
ইভিয়া হাউজ মিউজিয়াম ৮৬
ইব্রাহীম বান ৩৩, ৩৬, ৪৬, ১৩৭
ইমাম হাসান ১৩৪
ইমাম হসেন ৪২, ১৩৪
ইলশামারী ৬
ইলিয়াস ৩১
ইলিয়াস (পয়গম্বর) ১৩৪
ইলিয়াস শাহ ৫৫
ইসলাম বান ৩২, ৩৩, ৪৪, ৫৬
ইসলাম বান মাহমুদী ৩৪
ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) ৩৫
ইসলামি উচ্চশিক্ষা ১৫২
ইস্ট ইভিয়া কোম্পানি ৩৮
ইম্পাহান ৩৫
ইহদি ৬১, ৭২, ১৬৭

ঈ

ঈদ ৪২, ১০৩
ঈশা বান ৩২

উ

উইলসন ৫৫, ৫৬
উইলসন ১০, ১৯৯
উইলসন ১৮
উইলসন ১৮
উইলসন ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২
উইলসন ১৮
উইলসন ১৮
উইলসন ১৮
উইলসন ১৮
উইলসন ১৮
উইলসন ১৮

এ

একতম ১৮, ১৯, ২০, ২১
একতম ১৮
একতম ১৮
একতম ১৮
একতম ১৮
একতম ১৮
একতম ১৮

ও

ওয়েলস ৪১, ৪২, ২০২, ২১০
ওয়েলস ১৮৯
ওয়েলস ৪৬, ১১৭
ওয়েলস ৩২
ওয়েলস ১৩৫

ক

কনক ৪৭
কনক ১৪৬
কনক ৩২, ১১, ১৭৬
কনক ১, ২, ৫
কনক ১২১
কনক ২৯
কনক ৩৯
কনক ১০
কনক ১৯, ৩৮, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৫৭, ৬০, ৬৫,
৬৭, ৬৮, ৭০, ৯১, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯,
১০৫, ১১০, ১১৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৬,
১৫৫, ১৬৬, ১৭৬, ১৭৭, ২০১
কনক কেনেচল্ট ইনসিটিউশন ১৫১, ২১১
কনক ব্যাকরণ ১৫১
কনক ১৯১
কনক ৫
কনক ৪৩
কনক ৩১
কনক ৫০

কাপালিক সম্প্রদায় ১২৭
 কাপাসিয়া ২৯, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৬৪
 কামরূপ ২৯, ১৩০
 কামরূপ অভিযান ৩১
 কামরূপ রাজ্য ২৯
 কায়স্থ সম্প্রদায় ১২৪, ১৩১
 কারনিওলা হ্রদ ১৭
 কারুস্থারস ২০
 কার্তিকপুর ৪, ৫০, ১৭২, ১৭৩
 কালবৈশাখী ৮
 কালিগঙ্গা ৪
 কালীর উপাসক ১৫৭
 কালেকশন্ অফ ট্রাভেলস্ ১৬৪
 কাশিমপুর ১, ১০, ৫৯, ১৩০
 কাশিম আলী (মীর) ১০
 কাশ্যপ ১২২
 কাসান (মি.) ১৮৯
 কাসিদা ১৭৬, ১৭৮
 কাসিম আলী ৩৮
 কাসিম খান ৩৩, ১০৩
 কাসিম খান জঙ্গ ৩৪
 কিরো ১১৬
 কীর্তিনাশা ৪, ৫, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৮
 কুচবিহার ৬৮
 কুট্রি ১৭৭
 কুমিল্লা ৫৭
 কুলীন ব্রাহ্মণ ১৪২
 কুষ্ঠ রোগ ১৯৪
 কৃষ্ণ ১৩২
 কৃষ্ণচন্দ্র দাস ৩৮
 কৃষ্ণনগর ১২৫
 কৃষ্ণ-পূজারী ১৬৮
 কৃষ্ণনাপুর ৪
 কেইরোপটেরা ৯
 কেদারপুর ৪, ৪৯
 কেলস্যাল (মি.) ৫৯, ১১২, ১১৩
 কৈবর্ত ১২৭
 কোচ ২৯, ৫৫
 কোচ উপজাতি ১৩০, ১৩১, ১৫৭
 কোপেনহেগেন ১৫
 'কোর্ট অব জাস্টিস'
 কোর্ট অব ডিরেক্টরস ২০৯
 ক্লাইভ ৩৯
 ক্রতিজিঘাটা ৫৮

খ

খাজা খিজির ১৩৪
 খাজা সুলতান শামসুদ্দিন ভাঙ্গর ৩১
 খানরিদ খান ৩৪
 খুলনা ৫৭, ৫৮
 খোসালবাগ ৩
 খ্রিষ্টধর্ম ১২০, ১২১
 খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ১৩৬, ১৩৯
 খ্রিষ্টান ৩২, ৯৭, ১৩৭, ১৫৭
 খ্রিস্টীয় বণিক ১৩৭
 খ্রিস্টিয়ান স্কুল ১৫১

গ

গঙ্গা ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ১৬, ১৮, ২৮, ৪৩, ৪৮, ৪৯,
 ৫০, ৫২, ৫৭, ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৫, ১২৮, ১৮৭
 গণকপাড়া ৩২, ৫৬
 গন্ধ গোবুল ১০
 গন্ধ বণিক ১২৭
 গন্ধক নদী ১৩২
 গাঙ্গেয় বদ্বীপ ৯
 গাজী পীর আদমের সমাধি ৪৯
 গারুড়ী ১২৮, ১৫৭
 গারো ৮৫
 গারো পাহাড় ৫, ২০, ৩৭
 গালিব আলী খান ৩৭
 গিয়াসউদ্দিন ৫২
 গুটিবসন্ত ১৯৩
 গৃহভ্যন্তরীণ আমোদ-প্রমোদ ১৫০
 গোয়ালপাড়া ৫২
 গোলন্দাজ সৈন্য ১৩৭
 গৌড় ২৯, ১৪৬
 গৌরনদী ৫
 গৌরিখালি ৫
 গৌরীপুর ৩২, ৯৬
 গ্রান্ট (মি.) ১১৯, ২০২
 গ্রিক ৪১, ৪৭, ১৩৯
 গ্রিক গির্জা ৪২
 গ্রিক বসতি ৪১
 গ্রন্থার (মি.) ১১৩, ১১৬
 গ্রাডউইন ৩৩, ৪৪

ঘ

ঘড়ি ৫৬
 ঘুরিয়াপাড়া ৫৬
 ঘোড়াঘাট ১০২

চ

চক ৪৪

চকবাজার ৪১, ১৬৭

চট্টগ্রাম ৮, ১০, ৩৫, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৫৭, ৫৮, ৯৬,
১১৩, ১১৫, ১৩২, ১৩৫, ১৩৭, ১৯৬

চট্টগ্রাম অভিযান ৩৫

চড়ক পূজা ২১, ১৪৯

চড়ন খাল ৬

চণ্ডাল ১২৮, ১৫৭

চণ্ডী খান ৩২

চণ্ডী রায় ৪৯

চন্দরসি (নদী) ৫৮

চন্দ্রদ্বীপ পরগনা ৩১

চাগঞ্জ ৩

চান্দিনা ১০৭

চামতরা ২

চামার ১২৮

চিকিৎসাশাস্ত্র ১৫২

চিতা ১৮৭

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৫০, ৭৫, ৮০, ১১০, ১৭৪

চীন দেশ ১২, ৬১, ৯৬, ৯৮, ১৩০

চীনা অধিবাসী ৪৭

চীনা জাফরান ৬৬

চীনা জোয়ার ৬২

চীনা রেশমি ৯৯

চীনের লুডকা ২২

চুনমিশ্রিত মাটি ৪

চেরাপুঞ্জি ৪২

চোখ ওঠা রোগ ১৯৪

ছ

ছাবুত্রা বা ছাপড়া ৪৬

ছোট কাটরা ৪৫

ছোট ভাগিয়া ১২৪

জ

জঙ্গলবাড়ি ৬৪, ৯০

জঙ্গলবাড়ি তালুকদার ৭৭

‘জঙ্গলবাড়ি স্বত্ব’ ৫৯

জগন্নাথ ১১৬, ১১৭

জগন্নাথ দর্শন ৩৮

জন ডি. সিলভেরা ১৩৬

জমা তামারী ৩৫

জমিদার ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮১

জয়ন্তিয়া ১১৬

জয়রামপুর ৪

জর্ডন নদী ৬১

জলকর ৭৬

জলাতঙ্ক ১৯৭, ২০৩

জশরৎ খান ১১২, ১১৩, ১১৪

জাফর খান ৩৭, ৩৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

জাফরগঞ্জ ৩, ৫, ৫২, ৫৮

জাফরান ৬৫, ৬৬, ৭২, ৭৪, ৯৬

জাফরাবাদ ১০৭

জামালপুর ৫, ৪২, ৪৮, ৫৬

জাঙ্গালপুর ১, ১০১, ১০২

জাহাঙ্গীর ৩৪, ৮৯, ১৩৩, ১৮১, ২০৭

জাহাঙ্গীরনগর ৪৪, ১০১

‘জিরতি’ রায়ত ৭৬

জুয়া খেলা ১৫৮

জেদা ৯৬, ১৭৬

জেল হাসপাতাল ২০১, ২০২

জ্যাকোবসন ১৫

জ্যোতির্বিদ্যা ১৫১

জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন ১৫১

ঝ

ঝাপানিয়া ১২৪, ১৪২

ঝিনাই (নদী) ২, ৫

ট

টক্কী ৩৫

টক্কী সেতু ৪৬, ৫৬

টমাস (ক্যাপটেন) ১৪৪

টলেমি ৫, ৫৩, ৫৫

টাইমিস ১৬

টারনেট দ্বীপ ২৩

টাভার্নিয়ার ৪৫, ৪৬, ৯২, ৯৯, ১৩৭

টেনান্ট ১৮১

টোক ৫

টোকী ৬৪

ড

ডগলাস (মি.) ৫৭, ৬৫, ৬৭, ১০৭, ১১১, ১১৯

ডাউয়েস (মি.) ২১০

ডাচ ১৩৯

ডানকানসন (মি.) ১১৭

ডি. আনভিল ৫৫

ডে (মি.) ৮০, ৯৯, ১১৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৩
ডেমরা ৩২, ৫৬, ৯০, ১২৭, ১৩৩

ঢ

ঢাকা ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৬, ১৯, ৩১, ৩২, ৩৩,
৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪,
৪৫, ৪৭, ৫২, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭,
৬৯, ৭০, ৭৭, ৭৯, ৮৩, ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯১,
৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২,
১০৩, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩,
১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২৫,
১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৫২, ১৬২, ১৬৪,
১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৮১, ১৯৬,
২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১১

ঢাকা জেল ১১৬

ঢাকা শহর ৫, ৫৬, ১১৯, ১২০, ১৭৭

ঢাকাই মসলিন ৮৪, ৮৭, ৯০, ২০৭

ঢাকা কাছারি ৭৯

ঢাকা-জালালপুর প্রদেশ ১০৮, ১১১

ঢাকা নগরী ২, ৪০

ঢাকা হাসপাতাল ১৮২

ঢাকার পানি ৬৪

ঢাকেশ্বরী ৩০, ৪৪

ঢাকেশ্বরী মন্দির ৪২, ১৩২

ড

ডাকি ৫৫, ৫৬, ৫৮

ডরফের জমিদার ১৮৩

ডাঁতি ১১৬

ডাঁতিবাজার ৪১

ডাউক ৫৫

ডাকসিম-ই তালুকদার ৭৭

ডাগমা ৫৫

‘ডাজিয়া কান্না’ ৪২

ডাপরাবন ৯৮

ডাঙ্গলী সম্প্রদায় ১২৭

ডালমা ৫৭

ডালিপাবাদ ২৯

ডিল ৬২

ডিসি ৬২

ডীতবন্ধি ৯০

ডুখলিশাহ (সম্রাট) ৩০

ডুখরিল ৫২

ডুরক ৯১, ৯৬, ৯৮, ১৭৬, ২০৮

ডুলসী গঙ্গা ৩, ৬

‘ডুমার-ই জমা’ ৭৭

ডেজগাঁও ৮, ৫৬, ৬৯, ১৩১, ১৩৭

ডৈলবীজ ৬২

ডোডরমল ৩৫, ৭৭, ১০১

ডোশবস্ত্র ৯৯

ড্রিপুра ১, ৫, ২২, ৩০, ৩১, ৫২, ৬৯, ৭৩, ৯৬,
১০১, ১০৭, ১২৩, ১২৬, ১৬৪, ১৭১,
১৭৭, ১৮৮, ১৯৬

ড্রিপুра পাহাড় ২, ১৯, ৩৭

ড্রিপুра রাজ্য ৩৭

ধ

ধিবিনাট ১৩৭

ধ্যাকারে (মি.) ১১৪

দ

দনুজ মর্দন দেব ২৯

দনুজ মাধব ২৯

দরদরিয়া ৫৩, ৫৫, ৫৯

দরাব খান ৩৪

দমদম স্টেশন ৫৭

দশরা ১০৭

দশসালা জমি বন্দোবস্ত ৭৯

দাউদকান্দি ৫৭

দাদপুর ৫

দিউ ১২১

দিনাজপুর ২৮, ১৩০

দিপ্লি ৩০, ৩৪, ৩৭, ৯৯, ১০৩

দুবাই গ্রাম ৩

দুর্গা ৩০

দুর্গা টুনটুনি ১৩

দুর্গাপূজা ১৩, ৬৮

দেওয়ানি আদালত ১৬২

দেওয়ানি নৌবহর ১১৩

দেশীয় দেওয়ান ১১৪

দেশীয় খ্রিষ্টান ৫৩

দেশীয় মন্ত্রী ১৮১

দেশীয় হাসপাতাল ২০০, ২১০

ধ

ধনুটংকার ১৯৭

ধলেশ্বরী ১, ২, ৩, ৫, ৬, ২৯, ৪০, ৫৬, ৫৭, ৫৮,
৬৫, ১৯২

ধামরাই ৬৪

ধোলাই খাল ৪০, ৪১, ১৩৭, ১৮৬

ন

নওয়াজিস খান ৫০
নওয়াজিস মুহাম্মদ খান ১০৩
নক্স ১৬৯
নদীয়া ১২৪, ১৫১
'নবম শতকে দুজন মুসলমান পরিব্রাজকের
ভারতবর্ষ ও চীনের বিবরণ' ৮৪
নবশাখ ১২৪
নয়াভাঙ্গনী ৫, ৫৮
নরসিঙ্গার ৩১
নরহত্যা ১৬১
নাখোদা ৯৭
নাটোর ৩, ১৯১
নান্দিনা ২
নান্না ডি কল্লা ১২১
নাপিত সম্প্রদায় ১২৬, ১৪৩, ১৪৪
নাফিসা বেগম ৩৭
নারায়ণগঞ্জ ৬, ৪৭, ৫৬, ৯৬, ১৩৯, ১৪৮
নিম্ন আসাম ২৯
নীল চাষ ৬৬
নীলাভ ৫২
নুসরৎ জঙ্গ ৩৯
নূরজাহান (সম্রাজ্ঞী) ৩৫, ৮৪
নূরজাহান বেগম ৩৫
নেপাল ১১, ৯৯
নেস্টরীয় উপাসনালয় ১৩৭
নোয়াখালী ৮, ১০১, ১৯৬

প

পতিতালয় ১৫৮, ১৮৩
পদাতিক রেজিমেন্ট ১৯১
পদ্মা ৪
'পরীর শহর' ৪৩
পর্তুগিজ ৩২, ৩৩, ৫৩, ১২১, ১৩৭, ১৩৯
পর্তুগিজ মিশনারি ৬৯
'পলওয়ার' (নৌকা) ৫৭
পললভূমি ২, ৩, ৪, ১০৮
পলাশ ৪
পাইনাম ৫০, ৫১, ৫২
পাগলাগারদ ১৯৬, ২০১, ২০২
পাগলা পুল ৪৬
পাটনা ৬২, ৯৬, ৯৮
পাটনী ১২৭
পাটিয়াল ১২৭, ১৪২

পাটেরগোটা ৬, ৬৫

পাঠান ৩৩
'পাঠানটুলি' ৫৬
পাণ্ডুয়া ৫২, ৫৫
'পানিকোচ' ১৩০
পারভেজ ৩৪
পারস্য ৩৭, ৯৮
পারস্য উপসাগর ৮৯
পার্বত্য ত্রিপুরা ৫৫, ৮৫
পার্লিং (মি.) ১১৪
পাল রাজবংশ ২৮
পাল রাজা ১২৮
পিট (মি.) ১১৬
'পীর আদম' ৩০
পুরকাস ১৩৩, ১৬৪
পূর্ণিয়া ৭৭, ৯৬, ১৭৮
পেত্ত ৯৬, ৯৮
পেনাঙ ১৭৭
পোস্তগোলা ৪৫
পোমোমরা (দ্বীপ) ৪
প্রভেল ৯৯
প্রোটেষ্টান্ট সমাধিভূমি ১২০
প্রাটামিসটা গানজেকটিকা ১২
প্রিনী ৮৩, ৮৪
গ্রীহা ১৯২

ফ

ফকরুদ্দিন সুলতান সিকান্দার ৩০-৩১
ফররুখশিয়র ৩৭, ৪৫
ফরায়েজী ১৩৫, ১৩৬, ১৮৬
ফরাসি ১১৪, ১৩৯
ফরাসি ক্যাটরি ৪৬
ফরিদপুর ১, ৩, ৪, ১২, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৭, ৬৮,
৭৫, ৭৮, ৯৬, ১১৭, ১১৯, ১২১, ১৩৫,
১৯৬
ফায়েহাবাদ ১০১
ফার্সি ১৫১
ফিচ (রাজক) ৩১, ৩২, ৫১, ৫২, ৯৮, ১৩৭
ফিদাই খান ৩৪, ৩৫
ফিরিঙ্গি বাজার ৬, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ১৩৭
ফিরিস্তি ৩০
ফিরোজ শাহ ৫৫
'ফিভ শোর্টস অব ইন্ডিয়া' ১০, ১৯৯
ফোর্ট উইলিয়াম ৩৮, ৩৯

ব

বংশী (নদী) ৫, ৬, ৫৬

বঙ্গ ২৯

বঙ্গদেশ ১, ৭

বঙ্গ বিজয় ২৮, ৩০

বঙ্গ-ভারত ৫

বড় কাটরা ৪৪

বড়সি ৫৮

‘বদরের’ পূজা ১২৯, ১৩৫

বনকর ৭৬

বরবকাবাদ ১০১

বরিশাল ৫, ৪২, ৫৮

বরেন্দ্র ২৯

বরেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) ১২১, ১২২, ১২৩

বরেন্দ্র সাউ ১২৬

বর্মী যুদ্ধ ৯৯

বলবন (সম্রাট) ৫২

বল্লাল বাড়ি ৪৮, ৪৯

বল্লাল সেন ২৮, ২৯, ৪২, ৪৮, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫

বসরা ৯৬, ১৭৬

বাকলা ৩১, ৩২, ১০১, ১৫১

বাঙালা রাজ্য ৩০

বাংলা ২১, ২৮, ৩১, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ৬৩, ৮৩, ৯২, ৯৮, ১০১, ১১৫, ১১৬, ১২১, ১২৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪৭, ১৬৪, ১৭০, ১৮২, ১৯৫

বাংলাদেশ ৭৩, ১২৮, ১৩৬

‘বাংলা বাজার’ ৪৩

বাংলা ভাষা ১৪৬, ১৫০

বাংলা শহর ৪৩, ৪৪, ১৩৬

বাংলা সরকার ২০৯

বাংলার মসলিন ৮৩

বাকেরগঞ্জ ১, ৩, ৪, ৫, ১২, ৩১, ৩৮, ৫০, ৫৭, ৬৭, ৬৮, ৯৬, ১০৮, ১১০, ১৩৫, ১৩৯, ১৫১, ১৬৪, ১৬৯, ১৯১, ১৯৬

বাজুহা ১০১

বাতরোগ ১৯৩

ব্যনার (নদী) ১, ৪, ৫, ৬, ৫৮, ৫৯, ১৯২

বানিয়া বংশ ৪৯

বানিয়া রাজবংশ ২৮

বানিয়া রাজন্যবর্গ ২৯

বানিয়া রাজা ২৯, ৫৪, ৫৬, ১২৮

বারওয়েল (মি.) ১১৪, ১১৬

বারমাইয়া ৫৬

বারমিয়া ৪

বারাসাত ৫৭

বারাসিয়া ৫৮

বারুধী ৫০

বালিম (বলবন) ৩০

বালিশিয়া ৪

বাস্তুপূজা ১৪৯

বাহাদুর খান ৩০, ৩৬, ১৩৮

বাৎসপ ১২১

বিক্রমপুর ৩, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৪, ৭৮, ১০৬, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৮৫, ১৯১, ১৯২

বিক্রমপুর রাজ সরকার ২৯

বিক্রমাদিত্য ২৮, ২৯, ৪৮

বিব (মি.) ৬৪

বিবাহ অনুষ্ঠান ১৪৩

বিবি পরী ৪৫

বিলেতি সুতা ২০৮

বিহার ৩৬, ৩৯, ১৭২

বুজর্গ উমেদপুর ১৬৯

বুরা ১১০

বুড়িগঙ্গা ১, ২, ৫, ৬, ২৯, ৩০, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৯, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ১৩০, ১৪৯, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭

বেইনস্ (মি.) ৬৪

বেদ ১৫১

বেদে ১৯, ১২৯, ১৫৭

বেনারস ৯৮, ১০৫, ১২৪

বেলিসপুর ৬৫

বৈষ্ণব ১৩২

বৈদিক (ব্রাহ্মণ) ১২১, ১২৩, ১৪২, ১৫১

বৈদ্য শ্রেণী ১২৩, ১৩১

বৈদ্য সম্প্রদায় ৫০

বৈরাগর ৯৮

বৈরাম খান ৩০

বোন্টস (মি.) ১৭৮

বৌদ্ধ ১২৮

ব্যভিচার ১৬১

ব্যাপটিষ্ট মিশন সভাগৃহ ৪২

ব্রহ্মপুত্র ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৪৬, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৯১, ১০১, ১৩২, ১৭০, ১৮৭, ১৯২

ব্রাহ্ম উপাসক ১২৮

ব্রাহ্মণ ৪৮, ১২১, ১৩১, ১৪১, ১৪৪

ব্রিটিশ অধিবাসী ১২০

ব্রিটিশ তাঁত ৮৭

ব্রিটিশ নৌ-সেনা ৬৭

ব্রিটিশ বিজয় ৩৮

ব্রিটিশ সরকার ৩৯

ব্রিটেন ৪৬, ১৭৬

ড

ডরদাজ ১২১

ডাওয়াল ১১, ২৯, ৫২, ৫৩, ৬৯, ৭০, ১২০,
১২৮, ১৩০, ১৩৭, ১৫৭, ১৮৮

ডাওয়াল এস্টেট ৫৯

ডাওয়াল পরগনা ১০

ডাগলপুর ১৭৮

ভারত ২৮, ৪৯, ৫১, ১৩৭

ভারতবর্ষ ৩২, ৪৮, ৬৬, ৭২, ৮৪, ৯৮, ১৬৯

ভারতীয় মসলিন ৪৬, ৮৩, ১৩৭, ১৭৬

ভারতীয় হেরিং ১৮

ভার্তমানস (লুইস) ৩১, ৯৮, ১৩৬, ১৩৭

ভার্ধেমা ৪৪

‘ভাসাতানিয়া রায়ত’ ৭৬

ভিক্ষাবৃত্তি ১৮১

ভুইমালী ১২৮, ১৩৩

ভুটান ১২, ৯৯

ভুবনেশ্বরী ৫

ভুলুয়া ৪৭

ভেনিস ৪০

ভেনিসীয় পরিব্রাজক ৩২

ভেসপারটিলিও পেকটাস ৯

ম

মকর সংক্রান্তি ১৪৯

মগ ৩৩, ৩৪, ৪৪, ৪৭, ১০২

মগ উপজাতীয় ১২

মঙ্গোলীয় প্রজাতি ১৩০

মধুখালি ৫৮

মধুপুর ২, ৪, ২৯, ৫৬, ১১৪, ১৩০, ১৩১

মনডেলসো ৪৩

মনিপুর ৫

ময়মনসিংহ ১, ২, ১২, ৪২, ৪৭, ৫৬, ৫৮, ৫৯,
৬১, ৭৩, ৮৫, ৯৬, ১২৫, ১২৮, ১৩১,
১৩৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৬৪, ১৭৭, ১৮৩,
১৯১, ১৯৬, ২০৩

মালাকা দ্বীপপুঞ্জ ৯৮

মলয়গঞ্জ ৪, ৫০

‘মলমল বাস’ ৮৯

মসলিন ৩৪, ৬৯, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১,
৯২, ৯৯, ১৭৮

মসলিন বস্ত্র ৫২, ৫৩, ১৭৬, ১৭৮

মসলিপতন ৯৮

মহররম ৪২, ১১১, ১৩৩, ১৩৪

মহামারী ১৯০, ১৯১

মহম্মদ আজিম ৩৫, ৪৫, ১৩৮

মহম্মদ বাব্বের ৩৮

মহরানী ভিক্টোরিয়া ৯১

মহরানী ৮৫

মাউন্ট সিনাই ১৩৯

মাগুর ৫

মাছুয়াখালি ৩, ৪, ৫

মানসিংহ ৩২, ৪৪

মারাঠা ১০৩

মার্কোপোলো ৩০

মালদ্বীপ ১৩৬

মালাকার ১২৫

মাসালিয়া ৯৮

মিটকোর্ট মি.। ২০৯, ২১১

মিঠাপুকুর ৪৯

মিডল্টন মি.। ১৭০

মিথ্যা সাক্ষ্যদান ১৫৫, ১৬০

মির্জাপুর ৪, ৮৫, ৯৮

মিলিশিয়া রেজিমেন্ট ১১৫

মিসর ৮৩, ৯১, ৯৬, ৯৮, ১৭৬, ২০৮

মিসরীয় গছ ২০

মিসরীয় বণিক ৮৪

মীর আবুল কাশিম ৪২

মীর কুতুব-উল-জাম ৫৫

মীরজাকর ৩৯

মীরজুমলা ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৪৯

মীর মুর্তজা ৩৯

মীর মুরাদ ৪২

মীর হাবিব ৩৭

মীর হুসেন ১১৬

মীরজাদান ভাস্কর ৩৯

মীর্জা লুৎফুল্লাহ ৩৭

মুকানা বাজার ২০

মুকসররম খান ৩৪

মুকুট রায় ৩৪

মুঘল ৫৬, ৭৭
 মুঘল বিজয় ৪৩
 মুঘল শাসনামল ১০১, ১০৪, ১০৮, ১১১, ১৮১
 মুঘল সম্রাট ১০১
 মুঘল সরকার ৪৬, ৪৭, ৭৯, ৮৯, ১৫২, ১৮২
 মুঘল সৈন্যবাহিনী ৩৩
 মুরাদ আলী ৩৭
 মুর্শিদকুলী খান ৩৬, ৩৭, ৪৫, ১০২, ১৬১
 মুর্শিদাবাদ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৭, ৫৯, ৯৮,
 ১০৩, ১০৫, ১০৭, ১১০, ১১২, ১১৩,
 ১৩৪, ১৫৫, ১৮১
 মুসলমান ১৪, ১৯, ২৮, ২৯, ৪০, ৪২, ৪৭, ৫০,
 ৫২, ৫৫, ১২৫, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫,
 ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৭,
 ১৭৯, ১৮২, ১৮৬
 মুসলমান কৃষক ৭২
 মুসলমান গোরস্থান ১৮৬
 মুসলমান রমণী ১৭৮
 মুসলিম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫০
 মুহাম্মদ রেজা খান ১০৩, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১১৬
 মূর ১২১
 মূরশীমোহন ১৩২
 মূল্য ৫৮
 মৃগী রোগ ১৯৭
 মেঘনা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৬, ১৮, ৩২, ৩৩,
 ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৮, ৬৪, ৬৯, ১০১,
 ১৩২, ১৩৫, ১৩৭, ১৭০, ১৮৭, ১৮৮,
 ১৯১
 'মেটায়ার' ৭৫
 মেডিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি ১৯৫, ১৯৭
 মেতোড ৪৩
 মেহেদীগঞ্জ ৪
 মেরোপস্ ভাইরিডিস ১৩
 মোকাম টঙ্গি-জামালপুর ১০৭
 মোঘল আমল ১০
 মোড়াপাড়া ৫০
 মোরাস ৯৬
 মোরাদকান্দি ১০১
 মোহাম্মদ আজিম ৪২
 মোহাম্মদ আলী পাশা ৯১
 মৌরিতানিয়া ১৭৭
 মৌরিটিয়াস ৯৬
 মৌলবী আবদুল্লাহ ১৩৫
 মৌসুমী ঋতু ৬

মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ ৬
 ম্যাগাডারমা ৯
 ম্যাশাই (মি.) ২৭
 য
 যমুনা ৫, ২৯, ৪৭, ৫২
 যশপাল ২৯, ৫৬
 যশরত খান ৩৮
 যশোর ৩৭, ৫৭, ৬৬, ১৯১
 যশোবন্ত রায় ৩৭, ১৬৯
 যুক্তিগত ১৫২
 যুগদিয়া ১১৭
 যোগী সম্প্রদায় ১২৮
 র
 রংপুর ২৮, ২৯, ৬৮, ৭০, ৯৬, ১৩০
 রক্ত আমাশয় ১৯৩
 রকস্বর্গ ৬৩
 রমজান ১১১, ১৩৪
 রসুলপুর পরগনা ৩, ১৭২
 রাজনগর ৪, ৩৮, ৫০, ৭০, ১২৪, ১৭২, ১৭৩, ১৯২
 রাজবল্লভ ৩৭, ৩৮, ৫০
 রাজবংশী ২৯, ৫৫, ১৩০, ১৩১
 রাজমহল ৩৩, ৩৫, ৪৩, ৪৪, ১৩৭
 রাজা পরশুরাম ১৩০
 রাজাপুর ৫৮
 রাজা বিয়াবানী ৫৫
 রাজা রাজবল্লভ ১২৪
 রাজা হরিশ্চন্দ্র ৫৬
 রাঢ় ২৮
 রাঢ়ী (ব্রাহ্মণ) ১২১
 রাঢ়ী কুলীন ১২২, ১২৩
 রাঢ়ী সাউ ১২৬
 রাঢ়িকালীন শোভাযাত্রা ১৪২
 রানী বাড়ি ৫৬
 রানী ভবানী ৫৬
 রামপাল ৪৮, ১৮৫
 রাশিয়া ১৮৮
 রাস (মি.) ১২৭
 রিনোলফি ৯
 রূপগঞ্জ ৫৮
 রেনেল (মি.) ৪, ৫, ৪৩, ১০২
 রেনেলের মানচিত্র ৪, ৫, ৬, ৫৬
 রোম সাম্রাজ্য ৮৩

রোমান ক্যাথলিক গির্জা ৪২, ৫৩, ১২০
রোমান ক্যাথলিক মিশনারি ১৩৭

ল

লক্ষ্য ২, ৬, ৩৫, ৬২, ৬৬, ১৯২

লক্ষণাবতী ৩০

‘লক্ষী-নারায়ণ’ ১৩২

লক্ষীপুর ৮, ৩৩

লক্ষ্মণখানা ২১০

লজ (মি.) ১১৭

লন্ডন ৬৬

লাক্ষা ১৪৭

লাঙ্গলবন্দ ৫০, ৫২

লাঙ্গলবন্দের মেলা ৫২

লাঙ্গুয়েদক ৯৯

লাস্কার্ট ১১৩

লালবাগ ৪০, ৪৫, ১৫২

লালবাগ প্রাসাদ ৪৫

লাশ (ড.) ৮৫

লিওনার্দ (রেড.) ১৫১

লিভসে (মি.) ১৯০

লুৎফননেসা ৩৯

লেখার কালি ৪

লোহিত সাগর ৮৯, ৯৮

লৌহজঙ ৫

ল্যাম্ব (মি.) ১৮৯

শ

শঙ্খ শিল্প ৯২

শর্কিতুন্নাহ (শরীয়তউন্নাহ) ১৩৫

শহীদাবাদ ১০৭

শাখারীবাজার ৪১

শামসুদ্দৌলা ৩৯

শায়েস্তা খান ৩৫, ৪৫, ৪৯, ১৩৭, ১৬৮

শাহজাহান ৩৩, ৩৪, ৩৭, ১৩৭, ২০৭

শাহ মাহমুদ ১০১

শাহামৎ জঙ্গ নওয়াজিস মোহাম্মদ খান ৩৮

শিব ১৩০

শিলারী ১৪৭

শিলাবুটি ১৭০

শিল্পপাল ৫৫, ৫৬

শীতলক্ষ্যা ২, ৬, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৮,

১৮৬, ১৯১

শেঙ্গুপিয়ায় (মি.) ১১৪, ১১৭

শেখ আলাব মসজিদ ৫৪

শেফার্ড ১৮২, ২১১

শের কুলম্ম খান ৩৭

শেরশাহ ৫২

শেরশাহী রাজবংশ ৩১

শোভা সিংহ ৩৬

শ্রীপুর ৪, ৩২, ৪৩, ১৩৭*

শ্রীপুর নদী ৪

শ্রীরামপুর মিশনারি সোসাইটি ১৫১, ২১১

শ্যামদেশ ৯৯

স

সংক্ৰান্ত বিদ্যালয় ১৫১

সংক্ৰান্ত ব্যাকরণ ১৫১

সংক্ৰান্ত লিঙ্গা ১৫১

সঙ্গীত বিষয়ক কান্ড্যক্স ১৫০

সন্তীদাহ প্রথা ১৬১

সদগোপ গোদালা ১২৫

সন্তান বিক্রি ১৭৩

সদ্বীপ ৩২, ৩৩, ১৬৪

সমাধি ১৮৬

সরফরাজ খান ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১৬৯

সরিষা ৬২

সাইফ খান ৩৪

সাগরদী ৬

‘সাত শতী’ (ব্রাহ্মণ) ১২৩

সাদেকপুর ৫

সান্তিটো ১২১

সাতার ২৯, ৩০, ৫৬

সামরিক হাসপাতাল ১৯১, ২০০

সার্নান ১৩৬

সি-আয়ল্যান্ড ৮৭

সিংহল ৯৮, ১৬৯

সিংহলী লীড ওয়ার্ট ২৩

সিকান্দর শাহ ৫৫

সিঙ্গ (মি.) ১১২

সিঙ্গার ফ্রেডারিক ৩২, ১৬৪

সিন্দা ৩

সিদ্দিকপুর ৩

সিঙ্ক ৫২

সিমিয়া সারকোপাইবিস ৯

সিকিলিস ১৯৪

সিরাজউদ্দৌলা ৩৮

সিরাজগঞ্জ ১৪৮

সিবিয়া ৯৮
 সিবিয় গির্জা ১৩৬
 সিলিকা ৪
 সিলেট ৫, ৬, ১২, ১৯, ২৬, ৪২, ৪৭, ৫৭, ৫৮,
 ৯৬, ৯৮, ১০১, ১০২, ১২৩, ১৬৪, ১৭১, ১৯০
 সিভাসটিয়াম গজালেস ৩৩
 সীজার ফ্রেডারিক ১৩২
 সুজা ৩৩, ৩৫, ৪২, ১০১, ১০২
 সুজাত খাম ৩৩
 সুজাউদ্দিন খাম ৩৭
 'সুকৃত-ভাষা' ১২২, ১২৩
 সুবর্ণ ১২১
 সুবর্ণ বণিক ১২৬
 সুবর্ণ রেখা ৩৩
 সুমাত্রা ৯৮
 সুরাট শব্দ ৯৯
 সুলতান আলাউদ্দিন ৫৪
 সুলতান ইলিয়াস শামসুদ্দিন ৫৫
 সুলতান উদ্দিন তুঘরিগ ৩০
 সুলতান মহাম্মদ সুজা ৪৪
 সুলতান সিকান্দর শাহ ৩১
 সুন্দরবন ৩২, ৩৭, ৫৭, ৫৮, ১০১, ১১৩
 সুন্দরবনে ডাকাত ১১৩
 সূক্ষ্ম মসলিন ৬৩
 সূর্যগ্রহণ ১৫১
 সেকান্দর শা ৫২
 সেন্ট অগাস্টাইন গির্জা ১৩৭
 সেন্ট টমাস গির্জা ৪১, ৪২
 সৈয়দ আলী খান ১১৬
 সোনারগঞ্জ ৪৪, ৫০, ৫১, ৫২, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭১,
 ১৮৮, ১৯১, ১৯২
 সোনারগাঁও ২, ৩০, ৩২, ৫১, ৫৭, ৬৮, ৯০, ৯১,
 ৯৮, ১০১, ১২৭, ১৩২, ১৫১, ১৮৫
 সোরেকস ইন্ডিকাস ১০
 সোয়ারীখাট ৪৪
 স্থাপত্যরীতি ৪১
 স্টাসি (কর্মেল) ৭০
 স্ট্রিকস ক্যানডিডাস ১২
 স্ট্রিকস সোকহুয়া ইন্ডিকা ১২
 টুয়ার্ট ৩৩
 টেমস ৯৯
 স্যার চার্লস উইলকিনস ৮৬
 স্যার জোসেফ ব্যাকেন্স ৮৭

হ
 হামিসুন্দর ২৯
 হালডয়েল (মি.) ৯৯
 হল্যান্ড (ক্যাপ্টেন) ১১৪, ১১৭
 হস্তচালিত কারখানা ৮৫
 হাজীগঞ্জ ৩৫, ৪৬, ১০৭
 হাতুড়ে ডাক্তার ১৯৫
 হার্বার্ট ৩৩, ৩৪, ৪৩
 হাসমৎ জম ৩৯
 হাত্তাবাদ তদন্ত কমিশন ১১০
 হিন্দু ১২, ১৩, ২৮, ৪২, ৪৩, ৫০, ৫২, ৬৮, ১০৫,
 ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭,
 ১৪৯, ১৫০, ১৫৮, ১৬৭, ১৮১, ১৮২,
 ১৮৩, ১৮৭, ২০১
 হিন্দু ডাক্তার ২৬
 হিন্দু বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫০
 হিন্দুস্থান ৮৯
 হিমন্ত সিংহ ১১২, ১১৪
 হসেনউদ্দিন ৩৮
 হসেনউদ্দিন খাম ৩৮
 হসেনকুলি খাম ৩৮, ৩৯
 হসেন বেগ ৪৯
 হসেনী দালাল ৪২, ১৮২
 হোলি উৎসব ১৫৮
 হোসমাবাদ ১৩৭
 হ্যাচ (মি.) ১১৭
 হ্যামিলটন (ড. বি.) ৫১, ১৪০, ১৬৪

পরিশিষ্ট

- (১) জেমস্ টেম্পল-কৃত 'কোম্পানি আইন চাক' এতে কিছু 'কম্বু' অসমর্থকরণে বক্তব্যের সম্মান পাওয়া যায়। অবশ্য একজন বিদেশীর পক্ষে সব কিছু সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। উল্লেখ্য এতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাই ফটেছে। যেমন, সেখানে যার জেটস ছিল, তারা সরকারকে জনকম দিয়ে কম-মদীতে মাল-ধরার অনুমতি লাভ করত। এদেরকে বলা হত জেলে বা জনরায়ত। টেম্পল সাহেব কিছু কাল কাঁচ এদেরকে চিহ্নিত করেছেন 'জিরাতি রায়ত' হিসেবে (পৃ. ৭৬)। শুকুতপক্ষে 'জিরাতি রায়ত' হচ্ছে তারা, যারা নিজ গ্রাম থেকে দূরে গিয়ে কোনো জমিদারের জমি চাষ করে এবং ফসল তোলা শেষে জমিদারকে ফসলের একটা অংশ দেয় বা চুক্তিবদ্ধ রাজনা দিয়ে নিজ গ্রামের ফসল নিয়ে গ্রামের ফিরে আসে। পরের বছর আবার ফিরে গিয়ে ফসল ফলায় এবং লজ্জাশ্রমে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। এসব 'জিরাতি রায়ত'দেরকে টেম্পল সাহেব, 'জনরায়ত'দের সঙ্গে এক করে কলোছেন।
- (২) ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানি সরকার জমিদারদেরকে জমির একজন্ম মালিক হিসেবে ঘোষণা করে। এতে রায়তদের অধিকার নিদাক্ষণভাবে লুপ্ত হয় এবং রাবতদের বিকৃত হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও বিকৃত রাবতদের এ বিকৃতিতে টেম্পল সাহেব কুসংস্কারসূত মনোবৃত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। জমিতে রাবতদের চিকানদের অধিকার সত্ত্বেও নিম্নে তাঁদের জীবনধারণ সম্বন্ধে টেম্পলের কাছে হাস্যকর ও অবৈতিক বলে মনে হয়েছিল।
- (৩) 'জমিদার' শব্দের উৎপত্তির স্বাক্ষর টেম্পল সাহেব করেন যে, 'জিহাদার' থেকে জমিদার শব্দের উৎপত্তি। আসলে 'জিহা' হচ্ছে একপ্রকার ডালুকের নাম। ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার বহু বকরের ডালুকের মধ্যে 'জিহা' ছিল এক ধরনের ডালুক। কোনো ডালুকদার তার উপরই কোনো জমিদার কর্তৃক উৎপীড়িত হলে, বা যে কোনো কারণে সে জমিদারের আকাজ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে, সে তার ডালুককে পার্শ্ববর্তী কোনো শক্তিশালী জমিদারের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার 'জিহা' বা অস্ত্রের ব্যবহার করত। ঐ শক্তিশালী জমিদার হত সেই নিপীড়িত ডালুকদারের জিহাদার বা অস্ত্ররক্ষতা।

(৪) জেলার জমিদারদের কথা বলতে গিয়ে টেলর সাহেব আরেকটি মারাত্মক তুল করে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তালুকদারের তুলনায় জমিদারদের সংখ্যা এ জেলায় কম। দশসালী জমি বন্দোবস্তের সময় এ-শ্রেণীর অনেক জমিদার অএ জেলায় একফুট জমিরও মালিক ছিলেন না। তবুও তাঁরা জমির স্বত্ব দাবি করেছিলেন' (পৃ. ৭৯)। একেএম টেলর সাহেব বুঝতে তুল করেছেন কিংবা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, কীভাবে বা কোন পরিস্থিতিতে ঢাকার অনেক জমিদার দশসালী বন্দোবস্তের সময় একফুট জমিরও মালিক ছিলেন না। উল্লেখ্য যে, জমল ভূমি আবাদ করার জন্য মুখল যুগে অনেক জমিদার ছোট ছোট তালুক সৃষ্টি করে। অনেক জমিদারি ছিল সম্পূর্ণভাবে তালুক নিয়ে গঠিত। দশসালী বন্দোবস্তের সময় কর্মওয়ালিস সমস্ত তালুক জমিদারদের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরাসরি তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার জন্য আদেশ জারি করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের বড় বড় জমিদারিগুলোকে খর্ব করা—যাতে তারা ভবিষ্যতে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম না হয়। এ ব্যবস্থার ফলে নাটোরের জমিদারি, দিনাজপুরের জমিদারি ও বর্ধমানের জমিদারি বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঢাকার জমিদারেরা। যাদের জমিদারি ছিল তালুক-অধ্যুষিত, তারা এ আইনের ফলে রাতারাতি নিঃশ্ব হয়ে পড়ে। এ সমস্যাকে টেলর সাহেব বুঝতে পারেন নি, কিংবা বুঝতে চান নি; ফলে সহসাই তিনি মন্তব্য করে ফেললেন, 'অনেক জমিদার অএ জেলায় একফুট জমিরও মালিক ছিলেন না।'

'

•



মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারি মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানাধীন সাহেবরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ আব্দুর রহমান রাঢ়ি এবং মাতা মরহুমা জোবেদা খাতুন। ১৯৫২ সালে ‘দি ইউনাইটেড ইসলামিয়া-মাদারীপুর হাইস্কুল’ থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৪ সালে নাজিমুদ্দিন কলেজ থেকে আই, এ, পাস করেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্সসহ ১৯৫৮ সালে এম,এ, ডিগ্রি লাভ করেন।

আনন্দমোহন কলেজ, নাসিরাবাদ কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, জগন্নাথ কলেজ এবং কারমাইকেল কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। তিনি মাদারীপুর সরকারি নাজিমুদ্দিন কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, নরসিংদী সরকারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলস্থ করটিয়া সা’দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের একত্রীকরণ পর্যন্ত এর সচিব হিসেবে এবং কিছুকাল তিনি এই সংস্থার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) পরিচালকের পদ থেকে ১৯৯৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ঢাকা সেনানিবাসস্থ শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজেও অধ্যক্ষ হিসেবে কিছুকাল কর্মরত ছিলেন।

১৯৫৪-৫৫ সালে মাসিক সাহিত্যপত্র মোহাম্মদীতে ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনা এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে কয়েকটি ছোটগল্প, যেমন—‘শুধু কাহিনী’, ‘কুমার নদীর ইতিকথা’, ‘দাদুর আঙিনা ও আকাশ’, ‘অধিকার’ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে ঢাকার তৎকালীন সিভিল সার্জন জেমস্ টেলর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মেডিক্যাল বোর্ডের সচিব লর্ড হাসিনসনের নির্দেশে এদেশের রোগব্যাধি সংক্রান্ত টপোগ্রাফি লিখতে গিয়ে ঢাকা তথা বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, মানুষ ও উদ্ভিদরাজির চমৎকার বিবরণ পেশ করেন এবং তা ‘টপোগ্রাফি অব ঢাকা’ নামে কলকাতা মিলিটারি অরফ্যান প্রেস থেকে (১৮৩৯) প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কর্তৃক এই দুঃপ্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থটি ‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’ নামে অনূদিত হয়ে বাঙলা একাডেমী থেকে (১৯৭৮) প্রকাশিত হয় এবং পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাঁর অন্য অনূদিত গ্রন্থের নাম ‘বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ ‘এই আঙিনা ও আকাশের উপাখ্যান’।

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মনেপ্রাণে একজন কবি-স্বভাবের মানুষ। পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ দুর্নিবার। এই লোকপ্রিয় মানুষটির মধ্যে একটি মহৎ ও সুন্দর মনের সন্ধান মেলে। তাঁর সহজাত সারল্যা, চিত্তের ঔদার্য, অনুভূতি ও উপলব্ধির তীব্রতা তাঁকে করেছে মহিমান্বিত।

দীর্ঘ ও সফল অধ্যাপনা জীবনে তাঁর সাহচর্যে ও স্নিগ্ধ মনের স্পর্শে উজ্জীবিত হয়েছে অগণিত ছাত্রছাত্রী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী, অনুরাগী বন্ধুজন।